দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা

বীরেন্দ্র মিত্র

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ তা ৭০০০৭৩

বইটির প্রথম মুদ্রণের সময় থেকে পরবর্তী সংস্করণের পুনপ্রকাশে এতো দেরি হওয়ার কথা ছিল না। বৎসরাধিককাল হয়ে গেছে প্রথম সংস্করণটি ছাপা নেই। দোষ আমার। বিভিন্ন কারণে সময়মত বইটি প্রকাশক শ্রীসমীর নাথের হাতে তুলে দিতে পারিনি।

বর্তমান সংস্করণে বইটিকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছি। কিছু তাতে বাদ গেছে, আবার নতুন দুচারটি পরিচ্ছেদ যুক্তও হয়েছে। সংখ্যা বেড়েছে আরো কিছু তথ্য ও পুঁথি-প্রমাণের। এছাড়া দানিকেন-আহৃত বেশ কয়েকটি চিত্র এই গ্রন্থে পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছি শ্রীঅজিত দত্তের সহযোগিতায়। তাঁর কাছে আমার ঋণের পরিমাণ এই সূত্রে আরও এক গুণ বৃদ্ধি পেল। আমি কৃতজ্ঞ।

মহাভারতকে এতোকাল যেভাবে জেনে ও বুঝে আসছি আমরা, এ বই-এ সেই অভ্যস্ত ধারণাগুলিকে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বলা হয়নি চিরাচরিত পথে মহাভারত-কথা। মহাভারতের যথাযথ তন্নিষ্ঠ পাঠগ্রহণের চেষ্টাই তার কারণ। ফলে পাঠক-সহযোগিতায় বঞ্চিত হতে হয়নি। বরং বিভিন্ন সূত্রে শুনতে পাই, অনেক সহৃদয় পাঠক আপন তাগিদে বইটির বিষয় সম্পর্কে পরিচিতমহলে আলোচনা ও প্রচার করেছেন এবং করছেন। কৃতজ্ঞ আমি তাঁদের কাছেও।

বুঝেছি, সাধারণ পাঠক-সমাজে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর কোন কালেই অভাব হয় না। কাব্য জগতে যেমন আছেন নীরব কবি, নতুন বক্তব্যের রাজ্যে তেমনিই আছেন অন্বেষক পাঠক। এক হিসেবে তাঁরাও নতুন চিন্তা ভাবনার স্রষ্টা। এই সুযোগে দুহাত তুলে তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিষয়

প্রসঙ্গত

মহাভারতীয় দেবতারাও কি গ্রহান্তরের মানুষ ?

মহাকাশ বিজ্ঞানের আলোকদ্যুতির নিচে মহাগ্রন্থটি মেলে ধরে পাতা ওলটালে জবাব পাই, হ্যাঁ, তাঁরাও বহিরাগত। এসেছিলেন সগর্জন রশ্মিরথে চেপে মেঘমালা ছিঁড়ে ফুঁড়ে অনন্ত মহাকাশের সুদূর কোনো গ্রহলোক থেকে। হিমালয়ের সুমেরু অঞ্চলে ছিল তাঁদের সংরক্ষিত শিবির। বসতো সপারিষদ মন্ত্রণাসভা। সভাপতিত্ব করতেন সেখানে যুদ্ধবাজ সেই দেবতাদের পরম বুদ্ধিদাতা দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা। দেবতাদের ক্রিয়াকাণ্ড ছিল গোটা আর্যাবর্ত জুড়ে।

ইতিহাসের সে এক বিস্মৃত যুগ। সে যুগ চাপা পড়ে আছে স্ফীতকলেবর মহাভারতের লক্ষ শ্লোকস্তরে।

আদিতে যা ছিল আট-দশ হাজার শ্লোকের নির্ভেজাল পাণ্ডববিজয়গাথা, কালক্রমে উদ্দেশ্যমূলক উপদেশ কাহিনীর অবাধ প্রক্ষেপের ফলে তাই হয়েছে মহাকাব্য। দেবতার আসল স্বরূপ হারিয়ে গেছে কতিপয় অজ্ঞাত কবির ভক্তিরসাশ্রিত দুর্বল পদাবলীর স্তরে স্তরে। ক্ষমা করবেন, এ আমার নিজের কথা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য। মূল মহাভারতকে যে সব প্রাচীন কবি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধা করেননি তাঁদের সেই স্তূপীকৃত শ্লোকাবলীকে 'গর্দভের রচনা' বলে চিহ্নিত করতে (কৃষ্ণচরিত্র দ্রঃ)। কেননা তাঁদের সেই কারুকৃতির ফল হয়েছে মারাত্মক। মহাভারতের ঐতিহাসিক সত্যতা কবরস্থ হয়ে গেছে বাজে কথার রূপকথায়।

মহাভারত থেকে তাই প্রাচীন ইতিহাস বাছতে দিন গেছে, বছর গেছে, পার হয়ে গেছে যুগান্তর। শেষে আমতা আমতা করেও ঐতিহাসিকরা আজ স্বীকার করতে শুরু করেছেন, হ্যাঁ, কুরুক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ সত্যিই হয়েছিল বটে। হয়েছিল মনে হয়, ১৪০০ থেকে ১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দে। স্যার আশুতোষের আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কারমাইকেল প্রফেসর ডঃ এইচ. সি. রায় চৌধুরী ভারত ইতিহাস-কথা সর্বপ্রথম শুরু করেছেন অর্জুনপৌত্র পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক কাল থেকে।[১]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা কত বড় আর কেমন হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, যুদ্ধ যে একটা অবশ্যই হয়েছিল এ বিষয়ে আজ আর সংশয়ের অবকাশ নেই।

১. **Political History of Ancient India, from the Accession of Parikhit of the Coronation of Bimbisara'** দ্রঃ।

যত সংশয় মহাভারতের দেবতা আর তাঁদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে। তাই ঐতিহাসিকরা ঐ ব্যাখ্যাহীন দেবতাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ। কলমের ক্যাপ এ'টে বসে আছেন তাঁরা। অথচ বলছেন, কুরুক্ষেত্রে বাস্তবিকই একটা যুদ্ধ হয়েছিল!

ব্যাপারটা সত্যিই চমকপ্রদ। মহাভারতীয় এবং পৌরাণিক তথ্যাবলী আর সাম্প্রতিক কিছু খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রামাণ্যের ভিত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে যদি দেওয়া যায় ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি, তবে মহাভারতের আদি থেকে অন্তে যে দেবতাদের ভূমিকা আনুপূর্বিক তাঁদের সরিয়ে রাখা যায় কোন্ যুক্তিতে? মহাভারত দেবসর্বস্ব, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটাও তাই! রাজাবলীর জন্মকুলজি থেকে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেবতাদের অস্তিত্ব ওতপ্রোত বিজড়িত। দেবতাদের বাদ দিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল ব্যাপারগুলিই বরবাদ হয়ে যায়। যাদের নিয়ে যুদ্ধ, সেই পঞ্চপাণ্ডব এবং কর্ণ তো ধর্ম ইন্দ্র পবন, অশ্বিনীকুমার ও সূর্যের ঔরসেই জাত। দেবতারা না-গণ্য হলে অস্তিত্ব থাকে কি করে কর্ণসহ পঞ্চপাণ্ডবের? যুদ্ধ বর্ণিত অস্ত্র ও কবচ, শঙ্খ ও রথ, তাও সেই দেবতাদেরই দান। অর্জুনের বিশেষ সামরিক শিক্ষা সুমেরু নামক স্বর্গের দেবশিবিরে। বলতে কি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিকল্পনাটাই রচিত হয়েছিল দেবতাদের হিমালয় শিবিরে।

পাণ্ডব জন্মেরও ঢের আগে যুদ্ধের ছক তৈরী হয়ে গেছে আর্যাবর্তবাসী ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। কাজও শুরু হয়েছে দেবানুচর মহর্ষিদের মারফত। খুব ধীরে, সুচতুর গাণিতিক হিসেব নিকেষ কষে। অমন আটঘাট বাঁধা রাজনীতি মর্ত্যজনের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। অতি আধুনিক কূটনীতিজ্ঞের পক্ষেও তেমন রাজনৈতিক চাল চালা সাধ্যকর্ম ছিল না। সেই অসাধ্যসাধন করেছিলেন দেবতারূপধারী ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা। দুর্বাসাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা রাজা কুন্তিভোজের প্রাসাদে। উদ্দেশ্য, কুন্তীকে সুশিক্ষিত ও দেব-প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত করে গড়া এবং তাঁর গর্ভে দেবসন্তান উৎপন্ন করে সেই দেবপুত্রদের মাধ্যমে আর্যাবর্তে একটি দেবানুমোদিত সাম্রাজ্য স্থাপন করা। স্বয়ং বেদব্যাসও দেবতাদের দূতিয়ালী করেছেন কঠোর সামরিক গোপনীয়তা বজায় রেখে। রাজ্যহারা যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছেন তিনি এক অপ্রত্যাশিত 'রহস্যবিদ্যা'। সংবাদ, হিমালয়ে দেবশিবির প্রস্তুত আছেন রাজ্যহারা পাণ্ডবদের সামরিক সাহায্য দানের জন্য। হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ মিলবে যদি যুধিষ্ঠির দেবতাদের সঙ্গে একটি সামরিক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। দুর্বল যুধিষ্ঠির হাঁ করেই ছিলেন। প্রস্তাব মাত্রই টোপ গিললেন। পাঠিয়ে দিলেন অর্জুনকে হিমালয়ে। শুরু হল একটি অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের

প্রস্তুতি। এসব তথ্যাবলী আমার কল্পনাপ্রসূত নয়, মহাভারতের শ্লোক শ্লোকান্তরে লিখিত দলিল।

এসব দলিল হাতের কাছে পেয়েও দেবতাদের কেউ ভারতযুদ্ধের ইতিহাসে ঠাঁই দিলেন না। কেননা ঐতিহাসিকের হাতে বিধিবদ্ধ প্রমাণ নেই। হায়, প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটা দেবতারও কঙ্কাল যদি মাটি খুঁড়ে তোলা যেত! পাওয়া যেত আস্ত একটা রকেট!

কিন্তু তেমন কিছুই যে পাওয়া যায়নি। অতএব ঐতিহাসিকরা অসহায়। তাঁরা শেষের দিক থেকেই শুরু করলেন। চারশো কোটি বছরের বুড়ো পৃথিবীতে মানবেতিহাস তাই বড় দরিদ্র। সৌভাগ্য, প্রাগিতিহাসের বিশাল অন্ধকার তবুও ইতিহাস-সন্ধানী মানুষের উদ্যম প্রয়াস থমকে থামিয়ে দিতে পারেনি। অন্ধকারের চাদরটা অনলস প্রচেষ্টায় অবিরত টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি চলছে। মাটিচাপা ইতিহাস খুঁড়ে খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে, হচ্ছে, আরও হবে। নবলব্ধ অন্যতর জ্ঞানও মানবেতিহাসকে নতুন করে আলোকিত করছে, ভবিষ্যতেও করবে।

ভরসা হয়, একদিন দেবতাদের বিলুপ্ত ইতিহাসই হয়ত মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতকে উদ্ভাসিত করবে। দেবতাদের সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত সেই অন্ধকার থেকে মুক্তি নেই। কেননা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সমস্ত জাতির পুরাণে উপকথায়, ধর্মীয় গ্রন্থে ও কল্পনায় দেবতারাই সিংহভাগের দখল নিয়ে বসে আছেন। মানুষের ইতিকথার সঙ্গে তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তি-কাহিনী ওতপ্রোত। পশমের জামার মত দুই কাহিনীর ঠাসবুনুনী। কোনটাকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। একই পশমে বোনা। খুলতে গেলে সবটাই খুলে আসে একসূত্রে। তাই দেবতাহীন প্রাচীন মানুষের ইতিহাসকে স্বীকৃতি দিতে হলে সে ইতিহাস নতুন ভাবে রচনা করে নেওয়ারই সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তা যথাযথ হয় না কখনই। তাই তো বলছিলাম, দেবপ্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে স্বীকৃতি জানানোর অর্থই হল যুদ্ধটাকে নতুন করে রচনা করা।

দানিকেনতত্ত্ব বিশ্বময় আলোড়ন তোলার আগেও দেবতা-সমস্যা বহুজনকে ভাবিয়েছে। দেবতার স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত হয়েছেন ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরাও। খুঁজে খুঁজে দেখা গেছে, কল্পকথা নয় প্রাচীন মানুষের দেখা দেবতারা, গল্পকথাও নয় তাঁদের বিগ্রহবান শরীর।

তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে ডঃ ভি. এম. আপ্তে বললেন, পুরাপুঁথি ঘেঁটে জানা গেছে, দেবতাদেরও জন্ম হয়। তাঁদের চেহারাও মানুষেরই মত। উড্ডিন আকাশযানে চেপে ঘুরে বেড়ান তাঁরা শূন্য মার্গে। মানুষের খাদ্য দেব-পূজায়

অর্পিত হলে তা দেবতার খাদ্যেও পরিণত হয়।[২] 'মহাভারতের সমাজ' (বিশ্বভারতী) গ্রন্থে দেবস্বরূপ উদ্ধার করে সুখময় ভট্টাচার্য লিখেছেন, দেবতাও একপ্রকার উন্নত জীব। নিরুক্তকার যাস্কের উক্তি উদ্ধার করে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেব' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যা দেদীপ্যমান, উজ্জ্বল ও তেজোময় তাই দেবতা। দেবতা এক জাতের উজ্জ্বল পুরুষ। ঋগ্বেদীয় যুগের এক এক প্রাকৃতিক শক্তির রূপক হিসেবে কল্পিত দেবতা পুরাণ উপনিষদ মহাভারতীয় আমলে দেহধারী উন্নত জীবের আকৃতি গ্রহণ করেছেন (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম)। ঐতরেয় উপনিষদ বলেছে, তাঁরাও মানুষের মতই ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন, মানবিক উপায়েই অন্ন গ্রহণ করে থাকেন।

অধরা দেবতাকে বারেবার ধরবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানালোকের অভাবে অন্ধকার হাঁতড়ে তাঁদের জাপটে ধরা সম্ভব হয়নি। অর্জুন প্রমুখ প্রাচীন কাব্য কাহিনী ও ইতিবৃত্তের নায়করা অবশ্য ছেড়ে কথা কননি। সময়কালে জাপটে তো ধরেইছেন, মল্লযুদ্ধের সময় আর্যাবর্তের সামান্য এক রাজপুরুষ অর্জুন, মহাদেবের কঠিন পেশীসকলের স্পর্শও অনুভব করেছেন। মর্ত্যবাসীর হাতে দেবরাজ লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছেন বারম্বার। ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরপুত্রের সঙ্গে এমন বিচিত্র মোলাকাতের সংবাদ দেয় দুনিয়ার সব প্রাচীন পুঁথিপত্রই। তবু দেবতাকে তাঁর অবিনশ্বর মর্যাদার আসন থেকে মর্ত্যের মাটিতে নামানো যায়নি। এসবের অন্যতম কারণ, উড়ন্ত দেবতাদের কোনো ব্যাখ্যা ছিল না সেদিনের পালকহীন মানুষের কাছে। দেবতা ও পরমেশ্বরে তাই তাঁরা তফাত করতে পারেননি।

কিন্তু মানুষ যেদিন উড়তে শিখল এরোপ্লেনে চেপে, সেদিন আমরা জনান্তিকে ভাবতে শুরু করলাম, তাই তো, তবে কি দেবতাদের পুষ্পক রথগুলি শুধুই মানুষের খেয়ালী কল্পনা নয়? তারা কি সত্যিই নেমেছিল? কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধিও তো কম বড় বালাই নয়। দেবতার এরোপ্লেনকে তত্রাচ সে স্বীকৃতি দিতে গররাজি। শুধু তো এরোপ্লেনটা মানলেই সব প্রশ্নের জবাব মেলে না, দেবতাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে আরও নানান দৈবী ব্যাপার। তাছাড়া

২. "The gods are described as born, though not simultaneously. In appearance, they are human, they travel through the air in cars .... The food of men... . ...becomes the food of the gods when offered in sacrifice."—'*Religion and Philosophy*',—*Dr. V. M. Apte. M, A., PH. D.* (*CANTAB*) *KARNATAK.*

দেবতারা এলেন কোথা থেকে আর গেলেনই বা কোথায় ? যদি গেলেন তো আবার ফিরে এলেন না কেন ?

মহাকাশবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তরও সন্ধান করছেন। এসব প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগিয়ে তুলেছে এই গোলকেরই ব্যাখ্যাহীন অনেক বস্তু যার সৃষ্টি প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং যাদের প্রকৃত স্রষ্টাকে এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পাওয়া গেছে কেবল কতগুলি ভিত্তিহীন অনুমান, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উন্নতি যে অনুমিতিগুলির ওপর আজ আর সমান শ্রদ্ধা রাখতে পারছে না। এমনই বহু অব্যাখ্যাত বস্তুর সন্ধান জানিয়েছেন দানিকেন। তাঁরও আগে তাদেরই কিছু কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রখ্যাত রুশ পদার্থবিদ ম্যাটেস্ট আগরেস্ট। আগরেস্টের অতি ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ, 'Astronauts of yore' পুরাযুগে অন্যগ্রহের প্রাণীর এই গোলকে সম্ভাব্য অবতরণের পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য যে প্রশ্ন ও আলোচনার সূত্রপাত করেছে, তা শুধু চমকপ্রদই নয়, বিজ্ঞানী মহলেও তার যথেষ্ট প্রভাব। তরুণ সুইশ গবেষক এরিক ফন দানিকেন আগরেস্ট-প্রস্তাবিত পথে দ্রুত সাফল্যের সঙ্গে 'দেবতারা গ্রহান্তরের মানুষ' এই কল্পটি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং অবশ্যই অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য তথ্যও সন্নিবিষ্ট করেছেন তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। আর শুধু আগরেস্টই বা কেন, তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকরাও পৃথিবীতে গ্রহান্তরবাসী বুদ্ধিমান জীবের পদার্পণ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরে বিতর্কের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান বিশ্বাস করেন, আমাদের ঐতিহাসিক যুগে গ্রহান্তর থেকে অন্তত একবারের জন্যও বুদ্ধিমান জীবের আগমন ঘটেছে এই পৃথিবীর বুকে একথা কেবলমাত্র পারিসাংখ্যিক গণনা থেকেই বলা যায়।

আগরেস্টের ধারণার ভিত্তি কী ? সেগুলি হল, মিশরের পিরামিড, বালবেকের প্রকাণ্ড প্রস্তর কড়ি (যার এক একটার ওজনই হাজার খানেক টন এবং যে বস্তু স্থানান্তরিত করতে প্রয়োজন অন্তত আশি হাজার হাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা), কাঁচসদৃশ পদার্থ টেকটাইট বা 'লিবিয়ান গ্লাসের' আবিষ্কার, প্রাচীন প্রস্তর চিত্রাবলী ও তাদেরই সঙ্গে অঙ্কিত আধুনিক নভশ্চরের মতো পোশাকে-আবৃত অদ্ভুত প্রকাণ্ড পাথুরে ছবি, আঁরি লোতে যার নামকরণ করেছিলেন, 'মহান মঙ্গল দেবতা'। (নং চিত্র দ্রঃ)।

এই সমস্ত ব্যাখ্যাতীত পুরাবস্তু প্রশ্ন তোলে, কারা এমন সৃষ্টিকর্তা যারা একদিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর পাহাড় নিয়ে অবলীলায় খেলা করে গেছে ? প্রশ্ন জাগে, বাইবেলীয় প্রাচীন পিতা এনকের স্বর্গযাত্রার বিবরণ পাঠে, বাইবেলোক্ত

সদোম গোমোরা ধ্বংসের মধ্যে আনবিক শক্তির মত অত্যুন্নত বৈজ্ঞানিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা লক্ষ্য করে। গ্রীস, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন কথা ও কাহিনীগুলির প্রতি আমাদের নজর টেনে আগরেস্ট প্রশ্ন করেছেন, সেইসব দেবমানবের অজস্র উপকথা কি শুধুই ভিত্তিহীন কল্পনা ? রকেটযাত্রী গ্রহান্তরের মানুষের বিস্ময়কর অবতরণই কি হতে পারে না দেবকল্পনার উৎস ?

আগরেস্ট বলেন, তাঁদের আগমন যদি ঘটে থাকে পাঁচ কি ছয় হাজার বছর আগে, তবে আগামী কয়েক হাজার বছর পরে অন্য গ্রহ থেকে তাঁদের প্রত্যাবর্তনও

১নং চিত্র / মহান মঙ্গল দেবতা। ঠিক যেন নভশ্চরের পোশাকে আধুনিক মহাকাশচারী।

আমরা আশা করতে পারি। যাঁরা গেছেন ও সঙ্গে তুলে নিয়ে গেছেন কিছু মানবপুত্রকে, এও সম্ভব, তাঁরা হয়ত এখনও মহাকাশ পথে তীব্র বেগে শুধু ছুটেই চলেছেন, পৌঁছাতে পারেননি আপন গন্তব্যে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বানুসারে বেগবান রকেটে সময়ের গতি মন্দীভূত হয়। বিশ আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্রহলোক থেকে কোনো নভশ্চর যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবে তখন পৃথিবীর বয়স বেড়ে গেছে হয়ত চল্লিশ লক্ষ বছর অথচ

নভশ্চরের বয়স বেড়েছে মাত্র ষাট। জার্মান অঙ্কশাস্ত্রবিদ ইউজিন স্যাংগারের গণনা, আলোর শতকরা নব্বইভাগ বেগে একটি ফোটন রকেট ছোটানো হলে তার যাত্রী নভশ্চর নিজের জীবৎকালেই পাড়ি জমিয়ে ফিরতে পারবে মহাবিশ্বের সমস্ত অঞ্চল। সময়-গতির ঐ মন্দী-ভবনকে মনে রাখলে একই দেবতার (নভশ্চরের) বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে উপস্থিত হওয়ার রহস্যটাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ভিন্ন ভিন্ন নভশ্চর দেবতাদের পক্ষে চাতুরী করে যুগে যুগে একই দেবতার খেতাব ধারণ ও নিজেকে সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত করাও সম্ভব হয়ে থাকতে পারে। আর আমাদের প্রভু ইন্দ্রের বেলায় এ তত্ত্ব উত্থাপনার কোনো প্রয়োজনই নেই, কারণ 'ইন্দ্র' কারও বিশিষ্ট নাম ছিল না, ছিল নভশ্চর শিবিরের রক্ষক নির্বাচিত রাজার খেতাব। মর্ত্যবাসীও ইন্দ্রত্ব লাভ করেছেন। অসহায় দেবতারা রাজা নহুষকে ডেকে নিয়ে যান দেবশিবিরের রক্ষাকল্পে। নহুষও কিছুদিন 'ইন্দ্রত্ব' ভোগ করেন।

মহাভারতীয় তথ্য বলে, দেবতারা দেহধারী পুরুষই ছিলেন। বঙ্কিম-উবাচ 'গর্দভের রচনা'গুলির আবর্জনা সরিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করলে দেখা যায়, দেবতারা কস্মিনকালেও কোনো অপ্রাকৃত ক্রিয়াকাণ্ড করেননি। দৈবী ব্যাপার বলে যে আষাঢ়ে গল্পের সৃষ্টি হয়েছে, হয় তা ছিল বোঝার ভুল, নয় তো চতুর ব্রাহ্মণদের ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা। হয়ত তাঁরা চেয়েছিলেন দৈবী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিজেদের জন্য একটি পরশ্রমভোগী কায়েমী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। দেবভীতি থেকেই তো গুরুভীতি ও পুরোহিততন্ত্রের জন্ম।

মহাকাশবিজ্ঞানের বর্ণচ্ছটায় বহু প্রাচীন অব্যাখ্যাত রহস্যময় বস্তু যেমন তার রহস্যাবরণ উন্মোচন করতে শুরু করেছে, তেমনি প্রাচীন পুঁথি-পত্রের রূপকথাগুলি থেকে অনাবৃত হয়ে পড়ছে আলঙ্কারিক রূপকগুলিও। প্রাচীন পুঁথিকে এই রীতিতে পাঠ করার চক্ষু দান করেছেন এরিক ফন দানিকেন। নিজে তিনি পাঠোদ্ধার করেছেন বহু পুঁথি এই নয়া রীতিতে। তারই ফলে বাইবেলীয় প্রাচীন পিতা ইজেকিয়েলের দেখা "সদাপ্রভুর প্রতাপ"টি একটি খাঁটি প্রয়োগসম্ভব রকেটরূপে প্রতিভাত হয়েছে নবভাষ্যকারের অপূর্ব ব্যাখ্যায়।

পুরাপুঁথিতে দানিকেন সর্বত্রই খুঁজে বার করেছেন উড়ন্ত দেবতার যান্ত্রিক আকাশযান ও প্রাচীন প্রস্তর চিত্রাবলী থেকে উদ্ধার করেছেন অ্যান্টেনাযুক্ত শিরস্ত্রাণ পরিহিত নভশ্চর দেবতাদের চেহারা। অন্ধকার প্রাগিতিহাসের অর্থ উদ্ধার করার জন্য উল্কার বেগে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি দেশদেশান্তরে। আমি কৃতজ্ঞ, মহাভারত পাঠের নতুন দৃষ্টি আমি তাঁর কাছেই লাভ করেছি।

তাই এ গ্রন্থের শিরোনামে তাঁরই নাম, যদিও গ্রহান্তর থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীর এই ভুবনে অবতরণের সম্ভাব্যতা নিয়ে চিন্তার সূত্রপাত করেছেন বৈজ্ঞানিকরাই এবং দানিকেন তাঁদেরই মহাজন (অথরিটি) মেনেছেন। দানিকেন একটি বৈজ্ঞানিক অনুমিতিকে যেন তাঁর পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে চটপট ফসল তুলতে শুরু করেছেন। অসম্ভব দ্রুততায় সংগ্রহ করেছেন তিনি বহু নতুন নতুন তথ্য, এবং অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে উপহার দিয়েছেন আমাদের সেই সমস্ত তথ্যাবলীর সমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য অভিনব ব্যাখ্যা। তাই যাঁরা প্রশ্ন করেন, দানিকেন কি নতুন কিছু বলেছেন, তাঁরা সম্ভবত যতদূর বলা হয়েছিল তার সঙ্গে দানিকেন-সংযোজিত নতুন বক্তব্যগুলিকে মিলিয়ে পড়েননি, অথবা প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছেন বিষয়টির ওপর দানিকেন কেবলমাত্র রঙমিস্ত্রির কাজ করেছেন, তাঁর স্বতন্ত্র কৃতিত্ব কিছু নেই। কিন্তু আলোচ্য তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পক্ষে অজস্র নয়া প্রমাণ হাজির করেছেন তিনিই, যার তালিকা উদ্ধার করতে হলেও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকার সৃষ্টি হবে। বরং জিজ্ঞাসুরা তাঁর গ্রন্থই পড়ে নেবেন। আসল কথা, বিষয়টিকে একটি প্রমাণযোগ্য তত্ত্বরূপে তিনিই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন যা তাঁর আগে অন্যে করেননি। তাঁর রচনাই লাভ করেছে বিশ্বপ্রচার।

দানিকেনের এই বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাঁর বিরূপ সমালোচকেরও সৃষ্টি করেছে এদেশে ও বিদেশে। বাঙলায় দানিকেন-বিরোধী দু-একটি রচনা দানিকেনের নামের প্রতি কিছু পাঠককে বিমুখ করে তুলেছিল একটা সময়। দানিকেন-বিরোধী রচনার প্রভাবে এক শ্রেণীর পাঠকমনে দানিকেন-বিদ্বেষ এমন তীব্রতা লাভ করেছিল যে, দানিকেনের বক্তব্য পাঠ না করেই তাঁর প্রতি তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। মুখে মুখে দানিকেন-বিরোধী প্রচার ছড়িয়ে পড়েছে। যার ধাক্কা আমার বর্তমান রচনাবলীর ওপর আঘাত হানতেও কসুর করেনি। প্রসঙ্গত তাই এ বিষয়ে দু-চার কথা বলে রাখার জরুরী প্রয়োজন এখানে আমি অস্বীকার করতে পারি না।

এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে অক্টোবর ১৯৭৭-এর মধ্যে "দানিকেনতত্ত্বের আলোকে মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা" নামে আমার বর্তমান রচনাবলী যখন সাপ্তাহিক 'দর্পণ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, জিজ্ঞাসু পাঠক মহলে তখন বিতর্ক ও আলোচনার সৃষ্টি হয় খুবই স্বাভাবিক কারণে। কেননা বাঙলায় দানিকেন-তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের বিচার সেই প্রথম। সুতরাং মৌখিক আলাপ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বহু পাঠক-পাঠিকা যেমন আমাকে জানিয়েছিলেন শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও আশীর্বাদ ; কতিপয় অঙ্গুলীমেয় পাঠক তেমনি দানিকেনের প্রতি প্রযুক্ত ইতস্তত উচ্চারিত শ্লেষগুলির দ্বারা আমার রচনাকেও অকারণে বিদ্ধ

করেছিলেন। আমার রচনার শিরোনামে দানিকেনের নাম যুক্ত হওয়ায় আমি এক শ্রেণীর পাঠকবন্ধুর কাছে অপ্রীতিভাজন হই। রচনাটির ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাবও রাখেন কয়েকজন। জনৈক সম্পাদক বন্ধু তাঁর নিজস্ব পত্রিকায় প্রশ্ন তোলেন 'দর্পণে'র মত একটি পত্রিকায় (মার্কসবাদে বিশ্বাসী ?) এ জাতীয় রচনা প্রকাশের স্বার্থকতা নিয়ে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি, এ'রা দানিকেন তো পড়েন-ই-নি, আমার রচনাবলী পাঠ করেও মন্তব্য করার প্রয়োজন বোধ করেননি। সম্পূর্ণ বিরোধিতাটাই দাঁড়িয়ে গেছে কট্টর দানিকেন-বিদ্বেষের ওপর। দানিকেন সম্পর্কে বাঙলায় দু-একটি প্রবন্ধই তার মূল কারণ।

বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় যত নগণ্যই হোন, এই রচনাবলী পাঠকমহলে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে আশঙ্কা করে ১৯৭৭ সালে দর্পণের ২৯শে জুলাই সংখ্যায় দু-চার কথা বলতে হয়। এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে সেই বিতর্কের সামান্য আভাস পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা কর্তব্য মনে করি :

উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল, দানিকেন কি কিছু নতুন কথা বলেছেন, তিনি কি আগরেস্টেব তত্ত্বটি চুরি করে নিজের বলে চালাচ্ছেন না ?

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য আগেই রেখেছি, এখানে উদ্ধার করব আমেরিকার ইলিনয়স্থ Ancient Astronaut Society প্রেরিত একটি পত্রের কয়েকটি কথা। (২৩।৮।৭৭ তারিখে লেখা)।

ওঁরা জানাচ্ছেন, আমেরিকাতেও একই প্রশ্নে কিছু বিতর্কের ঝড় উঠেছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। সে ঝড় থেমেছে। দানিকেন গ্রন্থের প্রচার সংখ্যা এখন চার কোটি। দানিকেন কারো রচনা টুকে প্রচার করেননি, একই বিষয়কে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু করেছেন মাত্র। তিনি নবতর উৎস থেকেও তথ্যাদি আহরণ করছেন। দানিকেন, ট্রেঞ্চ, বারজিয়ার, পয়েলস, ড্রেক, চারুকস প্রমুখ লেখকরা অবশ্যই ডঃ আগরেস্টের রচনা পাঠ করেছেন কেননা তাঁদের প্রত্যেকের গ্রন্থেই তাঁকে তাঁরা প্রাপ্য স্বীকৃতিই জানিয়েছেন।[৩] প্রাচীন নভশ্চারণার কথা ভারতীয়

৩. 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?' (অনু—অজিত দত্ত) গ্রন্থে আগরেস্টের উল্লেখে দানিকেন লিখেছেন, "দামাস্কাসের উত্তরে আছে বেয়লবেকের চত্বর—পাথরের বড় বড় টালি দিয়ে আগাগোড়া তৈরী...আজো পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলতে পারেন না, কে কবে আর কেনই বা বেয়লবেকের ওই চত্বর তৈরী করেছিলেন। একমাত্র রুশী অধ্যাপক আগ্রেস্ত বলেছেন, মনে হয়, ওটা একটা বিশাল বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের অবশেষ।"

এবং অন্যান্য পুঁথিপত্রেও আছে, আছে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাসেও। তাই প্রকৃতপক্ষে কেউই দাবি করতে পারেন না যে তিনিই এ তত্ত্বের জন্মদাতা। দানিকেনেরও সে দাবি নেই। এ বিষয়ে পয়েলস, বার্জার, ট্রেঞ্চের রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এবং "As an academic matter, Agrest's article which appeared in the English version of 'On the Track of Discovery' was written in 1960. He apparently published an article earlier in 1959".

এই পত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, রুশ পাদার্থবিদ্ এবং গণিতজ্ঞ ম্যাটেস্ট আগরেস্টই প্রথম আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রেখে দুনিয়ার অনুসন্ধিৎসু মহলে চকিত বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে "দি বারমিংহ্যাম পোস্টে" একটি চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশিত হয় : Soviet theory, Men from space destroyed Sodom. সংবাদের বয়ান : গতকাল জনৈক সোভিয়েত বিজ্ঞানী এই মত প্রচার করেন যে, অন্যগ্রহ থেকে এই পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছিলেন কিছু নভশ্চর এবং সদোম ও গোমোরা ধ্বংসের ব্যাপারে তাঁদেরই হস্তক্ষেপ ঘটে থাকতে পারে। 'টাস' সংবাদ সংস্থা থেকে জানা যায়, উক্ত বৈজ্ঞানিক হলেন, এম, আগরেস্ট, গণিতজ্ঞ পদার্থবিদ্। তাঁর বিশ্বাস, অতীতের সেই মহাকাশযানটি আলোর গতিতে মহাকাশ থেকে এই গোলকে নেমে আসে। তিনি বলেন, আগন্তুক নভশ্চরগণ সম্ভবত বালবেক চত্বরের কাছে অবতরণ করেন। চত্বরের বিশাল পাটাতনটির প্রস্তরফলকের ওজন হবে দু হাজার টন। অবতরণ ক্ষেত্রে অথবা তাঁদের আগমনের স্মৃতি হিসেবে চত্বরটি হয়ত তাঁরাই নির্মাণ করেছিলেন।

আগরেস্টের ধারণা বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌কে এই তত্ত্বটি নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হতে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করেছিল আর দানিকেনই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সফল। বিশ্বজন তাঁর কাজের কথাই জানেন। তাই আমার এই গ্রন্থের শিরোনামে তাঁর নাম ছাড়া আর কার নাম যুক্ত হতে পারতো ?

দ্বিতীয় আর একটি তত্ত্বগত প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছিল। আপত্তি, ডারউইনের বিবর্তনবাদকে নস্যাৎ করে দানিকেন 'বুদ্ধিমান মানব' সৃষ্টির একটি আপন-কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। গ্রহান্তরের বুদ্ধিমান জীবের দ্বারা কৃত্রিম পরিব্যাপ্তির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধিমান মানুষ বা হোমো সেপিয়েনের সৃষ্টি, দানিকেন-প্রচারিত এই মতবাদের দ্বারা ডারউইন তত্ত্বকে আক্রমণের অর্থ মার্কসীয় বস্তুবাদের বিরুদ্ধেও প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ রচনা করা।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র বর্তমান গ্রন্থ নয়। কেবল

এ জাতীয় আশঙ্কা সম্বন্ধে এখানে একটিই মাত্র প্রশ্নের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

ডারউইনের 'The Origin of species' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যার এগারো বছর আগে মার্কস এঙ্গেলসের The Communist Manifesto (১৮৪৮ খৃঃ) বের হয়ে গেছে। ডারউইনের অপর গ্রন্থ The Descent of Man-এর প্রকাশকাল ১৮৭১ সাল। তত্ত্বগত আলোচনায় পাঠককে না নামিয়েও বলা যায়, এই কাল-ব্যবধানের প্রতি দৃষ্টি রেখে একথা ভাবা কি সম্ভব যে মার্কসীয় বস্তুবাদ ডারউইনতত্ত্বের এমনই মুখাপেক্ষী যে সে তত্ত্ব আক্রান্ত হলে মার্কসীয় তত্ত্বও আক্রান্ত বলে ধরে নিতে হবে? ডারউইন জৈব বিবর্তনের কথা বলেছেন, মার্কসীয় বিশ্লেষণ মানবেতিহাসের আর্থসামাজিক বিবর্তনের মাঝে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-শোষণের চেহারাকেই মূর্ত করে তুলেছে। কার্য কারণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গেই মার্কসীয় চিন্তার আত্মীয়তা। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় যে শোষণ ও দ্বন্দ্ব বহমান, মার্কসীয় প্রচেষ্টা তারই মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য জমি প্রস্তুত করতে চেয়েছে। শ্রেণী-সংঘাতই সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে। মার্কসীয় বস্তুবাদ বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বে প্রজাত নয়া শক্তির উদ্ভবের কথা ব্যাখ্যা করে। লেনিন বলেছেন, "In its proper meaning, dialectics is the study of the contradiction within the very essence of things." হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বন্দ্ব সংমিশ্রণের ফলে যেমন নতুন গুণযুক্ত ভিন্ন-জাতীয় বস্তু জলের উদ্ভব: দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে তেমনি নতুন শক্তির বৈপ্লবিক আবির্ভাব ঘটে মানব সমাজে। এই তত্ত্বের ওপরই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং ডারউইনতত্ত্ব কোথায় কার দ্বারা আক্রান্ত হল তা নিয়ে কোনও মার্কসবাদীর ঘুম ছুটে যাওয়ার বাস্তব কারণ আছে কি?

ডারউইনের সমকালে জীববিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল সীমিত। গবেষণার উপকরণও অপ্রতুল। বর্তমানে প্রাণোৎপত্তির কারণ সম্পর্কে নানা মতবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। ডারউইন বিবর্তনের কথা বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রাণের উদ্ভব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বিবর্তন সম্পর্কে নয়া বক্তব্যের উদ্ভব হচ্ছে। সেটাই স্বাস্থ্যকর। জ্ঞান কারো সিন্ধুকে তালাচাবির মধ্যে বন্ধ থাকতে পারে না। জ্ঞানচর্চার জন্য মুক্তি চাই। কালের কষ্টিপাথরে অনেক সিদ্ধান্ত ভুল বলেও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং শেষ বক্তব্যের দাবিদার কেউ নেই প্রাণিতিহাস সম্পর্কে। ডারউইনতত্ত্বের বিরুদ্ধবক্তা ও সংশোধক প্রয়োজনে নিশ্চয় দেখা দেবেন। মার্কসীয় মতবাদেরও অনেকানেক বিরুদ্ধবাদী এবং সংশোধনবাদীর উদ্ভব

হয়েছে। এই সমস্ত ধকল সহ্য করেই তো টিকে থাকতে হয় একটি মতবাদকে। যার সে ক্ষমতা নেই, তার বিসর্জন ঠেকানোও অসম্ভব। সুখের বিষয়, কায়েমী স্বার্থের নিঃসঙ্কোচ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মার্কসীয় তত্ত্ব টিকে আছে, থাকবেও, কেননা তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ়। সে তত্ত্বকে পাহারা দেবার জন্য আমাদের আহম্মক আত্মম্ভরিতা শোভা পায় না।

তাছাড়া একথাও কোনক্রমেই স্বীকার্য নয় যে, বিবর্তনবাদ যে মিসিং লিঙ্ক বা ইতিহাসের হারানো সূত্রগুলির ব্যাখ্যা এড়িয়ে গেছে, বিজ্ঞানীরা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারলে ডারউইনতত্ত্বের ঐ অংশত ব্যর্থতার জন্য মার্কসীয় যুক্তিবাদকেও ভুল বলে মেনে নিতে হবে আমাদের। না, মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ডারউইনতত্ত্বের ওপর মোটেও সেভাবে নির্ভরশীল নয়। যাঁরা ডারউইনতত্ত্ব আক্রান্ত ভেবে উত্তেজিত, তাঁদের বলব, অকারণে তাঁরা মার্কসীয় বস্তুবাদকে, ডারউইনতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল বলে বিভ্রান্তিকর একটি প্রচারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, মার্কসীয় বস্তুবাদ আমরা এমন অযোগ্য পুরুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হইনি, যিনি তাঁর তত্ত্বকে বহুলাংশে অনুমান-নির্ভর অপর একটি তত্ত্বের মুখাপেক্ষী করে গড়ে ছিলেন। মার্কসীয়তত্ত্ব সম্পূর্ণত বৈজ্ঞানিক ও অনন্যনির্ভর। 'জায়মান সৃষ্টি' সম্পর্কে দানিকেনের গড়ে-তোলা নয়া বক্তব্য সুতরাং আমাদের বিভীষিকার কোনো কারণই ঘটাতে পারে না। যাঁরা তা মনে করেন, মার্কসীয় তত্ত্বের প্রতি তাঁদের আস্থা সন্দেহাতীত নয়। তাঁরা নিজেরাই বিভ্রান্তির শিকার অথবা অপরকে বিভ্রান্ত করছেন কেবলমাত্র দানিকেন-বিরোধী একটা প্রচারকে জিইয়ে রাখার জন্য, অথবা অন্যতর কোনো অজ্ঞাত কারণে।

দানিকেনের 'কৃত্রিম পরিব্যাপ্তি' অথবা Artificial mutation সম্পর্কিত বক্তব্য সম্পর্কে আমার ধারণা অন্যরকম। বৈজ্ঞানিক বিচার বিজ্ঞানীরাই করুন, আমি বুঝি, পুরাপুঁথির প্রমাণ। ইজেকিয়েলের মহাকাশযান দর্শনের সম্ভাব্যতার ওপর দানিকেনতত্ত্ব যদি মূলতঃ প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয়ে থাকে, তবে তো বলাই যায়, অন্যগ্রহের মানুষ একটি তৈরী মানব সমাজের মধ্যে এসে অবতরণ করেছিলেন। সেই মানুষের রেখে-যাওয়া বিবরণ পরীক্ষা করেই প্রখ্যাত রকেট যন্ত্রবিদ ব্লুমরিশের পক্ষে ডায়াগ্রাম এঁকে সেই প্রাচীন মহাকাশযানটি সম্পর্কে বলা সম্ভব হয়েছে, 'ইজেকিয়েল (দেখা) মহাকাশযানের আয়তনসমূহ একান্ত বিশ্বাসযোগ্য। এবং তার কষা মাজার ফল কেবল প্রযুক্তিসম্ভব নয় প্রয়োগসম্ভবও বটে।' (তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল—অনু, অজিত দত্ত)।

যদি ধরা যায়, তাঁদের আগমন ঘটে মহাপ্লাবনেরও পূর্ববর্তীকালে, তবুও বলা

যায় না, পৃথিবী সে সময় আরণ্যক অর্ধনরের বসতভূমি ছিল। তৎসাময়িক কালের কথা যাঁদের মুখ থেকে উত্তর পুরুষ শুনে এসেছেন, তাঁরা নিশ্চয় বুদ্ধিমান প্রাণীই ছিলেন।

বহিরাগত নভশ্চরগণ পৃথ্বীমানব-মানবীর সঙ্গে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়ে নতুন একটি বংশধারা সৃষ্টি করে থাকতে পারেন। প্রাকৃতিক উপায়ে দেব-ঔরসে পৃথ্বীনারীর গর্ভে দেবপুত্র সৃষ্টির কথা বিশ্বের বহু পুরাপুঁথিতে উল্লিখিত আছে। আছে বাইবেলে, মহাভারতে। তাছাড়া, উন্নত বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁদের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি ও কৃত্রিম পরিব্যাক্তি ঘটানও কিছু এমন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। পৌরাণিক কথায় দেবতাদের দ্বারা মানব সৃষ্টির কাহিনী আছে। তার ব্যাখ্যা এভাবেই হতে পারে। তাও কোনো দৈব ঘটনা নয়, নিতান্তই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। আজকের বিজ্ঞানও কি পরীক্ষার দ্বারা প্রাণ সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত নেই? সম্প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, ইচ্ছামত পুত্রপুত্রী লাভের উপায় উদ্ভাবনে তাঁরা সাফল্যের পথে উত্তীর্ণ হতে চলেছেন। বিজ্ঞানীদের দ্বারা নলজাতক সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে।

কিছু বিজ্ঞানীর মতে মহাজাগতিক পরিবারে পৃথিবীর সভ্যতা এখনো মাত্র প্রাথমিক স্তরেই আছে। গ্রহান্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের আরও উন্নত ধরনের সভ্যতার অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাসী। আমরা আজও যতদূর এগোতে পারিনি, অন্য কোনো গ্রহ থেকে একদিন হয়ত তারও চেয়ে ঢের উন্নতমানের জীব এখানে এসে থাকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে উপাদানের পরিবর্তন ঘটিয়ে বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টি করাও আজকের প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃতি ও বিচারে এটাই বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত রূপে বর্তমান যে, প্রথম প্রাণ ও বুদ্ধিমান মানুষের জন্মদাতা অন্য কেউ নন, প্রাকৃতিক শক্তির বিবর্তনের ধারায়ই তার সৃষ্টি। সুতরাং প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে কোনো অনুমিতির দ্বারা অস্বীকার করার অবকাশ এখনও তৈরী হয়নি।

দেবতারা উন্নত শ্রেণীর বুদ্ধিমান ঐতিহাসিক পুরুষ, একথা মেনে নিয়ে অনেকে প্রশ্ন রাখেন, এই দেবতাদের ভিনগ্রহী বলে চিহ্নিত করার কি দরকার, তাঁরা তো এই গ্রহেরও উন্নতমানের মানুষ হতে পারেন।

দেবতার ব্যাখ্যা তেমন ভাবে করা গেলে কাজটা খুবই সহজ হতে পারত। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকরা দেবতার নর্মকর্মের বহু সংবাদ সংগ্রহ করেও এমন একটি সহজ ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারেননি। এই গ্রহের পুরাণেতিহাসে, এমন কি ঐতিহাসিক দলিলেও দেহধারী দেবতার উপস্থিতি সুস্পষ্ট (বর্তমান

লেখকের 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ), এই বিচিত্র ঘটনাবলী লক্ষ্য করেও কিন্তু তাঁদের পৃথ্বীজাত বলে রায় দেওয়ার উপায় নেই। পৃথিবীকে যদি মানুষের দেশ হিসেবে ভেবে নেওয়া যায়, তবে পুরাপুঁথিতে মানুষের দ্বারা দেবতারা সর্বত্রই ভিন্‌দেশী বহিরাগতরূপে উল্লিখিত হয়েছেন বলে দেখা যাবে। তাঁরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না, মহাকাশ পথে আসা-যাওয়া করতেন ধূমপুচ্ছধারী অগ্নিস্রাবী সশব্দ উড়ন্ত রথে চেপে। দেবতাদের সঙ্গে সর্বত্রই যে উড়ন্ত যানগুলির কথা বর্ণিত আছে, দেবতাদের ঠিকানা উদ্ধারে সেগুলিই প্রধান সূত্র। মানুষ মহাকাশ যুগে প্রবেশের আগে এই দেবযানগুলির সমুচিত ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। ফলে দেবতাকে চাক্ষুষ করে, তাঁর সঙ্গে বসবাস করে, তাঁর হাত থেকে ভূখণ্ড শাসনের ভার গ্রহণ করেও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। ভেবেছে, দেবতা হলেন, জ্ঞানাতীত, রূপাতীত পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। কেননা, মানুষের অগম্য মহাকাশ স্বর্গ থেকে তাঁরা নেমে এসেছিলেন দলে দলে ও দফায় দফায়। তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরাও অসহায় বোধ করেছেন দেবযানগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে। ভারতে অবশ্য একটি অমূল্য পুঁথি হাতের কাছেই ছিল। ছিল মহর্ষি ভরদ্বাজের বৈমানিক শাস্ত্রম্ পুঁথিটি। এই পুঁথিতে ভারতীয় দেবতাদের ব্যবহৃত উড়ন্ত যানগুলিকে 'বিমান' আখ্যা দিয়ে সেইসব বিমানের প্রাযুক্তিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু মহাকাশে গমনাগমন যে সম্ভবপর, এই ধারণা তৈরী না হওয়া-পর্যন্ত পুঁথিও অলৌকিক কীর্তিকথা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ভারততাত্ত্বিকরা আজও সে গ্রন্থটিকে গবেষণার বিষয়ীভূত করেন-নি; যদিও তার প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। দানিকেনই গ্রন্থটির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মহাকাশ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজ দেবযানগুলির রহস্য উন্মোচন করার সুযোগ ঘটেছে। সেই সূত্র ধরে অথবা দেবতাদের সঠিক ঠিকানা সন্ধানের যে চেষ্টা চলছে, তারই শুরু ম্যাটেস্ট আগরেস্টে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণ সংগ্রহ দানিকেনসহ গবেষকদের আজ ভাবিয়ে তুলেছে। মূলত এ কাজের উদ্দেশ্য মানুষের লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান। দানিকেন বা দানিকেন-অনুগামীদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। আস্তিকতা নাস্তিকতা নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁদের যেমন কাজ নয়, তেমনিই কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযান চালানও নয় তাঁদের অভিসন্ধি। ইতিহাসে দেবতাদের সঠিক স্থানে ধরতে পারলে প্রাগিতিহাসের অন্ধকার অনেক পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমরা আবহমানের বহু কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আগামী দিনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের অগ্রগতির পথ রচনা করতে পারি। দানিকেন-চর্চার মূল্য আমি এভাবেই গণনা করি আর সেজন্যই

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে আমাদের পুরাণ মহাভারতগুলিকে নতুন করে পড়ার চেষ্টা করেছি। দেবযানগুলিই দেবতাদের ভিন্‌গ্রহী বুদ্ধিমান পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। দেবযানগুলির অস্তিত্বের জন্যই দেবতাকে অন্যভাবে ভাবার উপায় নেই। দেবতার স্বরূপ এভাবে বাছাই করা সম্ভব হলে মহাভারতের লক্ষ শ্লোক বিশ্লেষণ করে পৌরাণিক ভারতের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার করাও সম্ভব। সে চেষ্টা আমি করেছি, "কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির" গ্রন্থে ; পরবর্তী "যদু বংশ ধ্বংস কথা"য় সে চেষ্টাকে আরও প্রসারিত করার ইচ্ছে।

মহাভারতের মূল বিষয়কে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মেনে নিতে স্বর্গ আর দেবতাই প্রধান বাধা। রাজা ও ঋষিরা যে কাহিনীতে বারবার স্বর্গে যাতায়াত করেন, সে কাহিনীর স্বর্গটির অবস্থান কোথায় ? তা যদি পার্থিব স্বর্গ অথবা গ্রহান্তর স্বর্গ না হয়, তবে সেই কল্পনার স্বর্গে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁদের কাল্পনিক চরিত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সৌভাগ্যত, অনুসন্ধানে মহাভারতীয় তথ্যাবলী থেকে একটি পার্থিব স্বর্গের কথাই বেরিয়ে এসেছে। এ স্বর্গের প্রায় দ্বারদেশ পর্যন্ত আমরা এখন মোটর যানেই ঘুরে আসতে পারি।

যে দেবতাদের অনৈসর্গিক কল্পিত ঈশ্বর বলে মান্য করে এসেছি এতকাল, মহাভারতীয় তথ্যের পরীক্ষায় জবাব মেলে তাঁরাও আমাদের মতই দেহধারী জীব। হতে পারে, এসেছিলেন তাঁরা অন্য কোনো গ্রহলোক থেকে। আর তাই তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাহ যৌনসংগমও বস্তুত পৌরাণিক ঘটনা হতে বাধা নেই। ইতিহাসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রতিষ্ঠা পেলে দেবতা ও দেবপুত্রদেরও ঐতিহাসিকতা সন্ধান করতে হবে।

আমার তো তাই মনে হয়। তারই জন্য এই পরিশ্রম।

রহস্যময় রশ্মিরথ

দেবতাদের রহস্যময় রশ্মিরথ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার ও কৌতূহলের সূত্রপাত আজকের নয়, তাও বহু প্রাচীন। সেই সব অনুমিতির আলোকে রুশ বিজ্ঞানী ডঃ ম্যাটেস্ট আগরেস্ট লিখলেন, বস্তুতপক্ষে বিগত কয়েক লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে যে বহিরাগত বুদ্ধিমান প্রাণীদের বারম্বার আগমন ঘটেছে, এমন সম্ভাবনার স্বীকৃতিকে কেবলমাত্র কল্পকথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং তেমন কিছু ঘটে থাকলে পৃথিবীতে তাঁদের অবস্থানকালের স্মৃতিও নিশ্চয় রয়ে গেছে। যদি ঐতিহাসিক যুগে তাঁদের আগমন ঘটে থাকে, তবে আশা করা যায়, সে সংবাদ নিশ্চয় আমাদের পুরাণে কিংবদন্তীতে অনুস্যূত হয়ে আছে। তার চিহ্ন থেকে গেছে পুরাবস্তু, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ অথবা ভূস্তরীয় উপাদানের মধ্যে।[১]

কিন্তু পুরাপুঁথির বিবরণীতে বহিরাগত নভশ্চরদের চরণ-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব ?

বাইবেল থেকে পয়গম্বর এনকের স্বর্গযাত্রার কাহিনীটি উল্লেখ করে আগরেস্ট দেখালেন, প্রাচীন পুঁথিতে স্পষ্টতই লেখা আছে যে, মহাকাশ থেকে অবতীর্ণ পুরুষেরা এই গ্রহের মানুষকে স্বর্গে নিয়ে গেছেন। বাইবেলের আদি পুস্তক থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের চব্বিশ শ্লোকটির প্রতি প্রসঙ্গত দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। সেখানে লিখিত আছে :

> "হানোক (এনক) ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।"(—বাইবেল/আদি পুস্তক/৫, ২৪)।

দানিকেন এই সূত্রটিকে বিচার করলেন আরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে : ইজেকিয়েলদৃষ্ট সদাপ্রভুর প্রতাপের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। দানিকেনের বিশ্লেষণ দেবরথগুলির চেহারা আমাদের কাছে অনেক বেশি বোধগম্য

(১) There is nothing fantastic, therefore, in postulating that the earth was in fact visited by intelligent beings several times in the last few million years. In such case they would have left some traces of their stay. If such event took place in historical times, we may reasonably expect the event to be reflected in folk legends and tales, as well as in material monuments and geological features.—'*Astronauts of yore*', *Dr. Matest Agrest.*

ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল। কেবলমাত্র বাইবেলের শ্লোক উদ্ধার করে বিষয়টি বিশ্বাস্য করে তোলা সম্ভব ছিল না। একজন দানিকেন না হলে কে পারতেন নভশ্চর দেবতাদের স্বর্গীয় রকেটের চিত্র আমাদের চোখের সামনে এ'কে দিতে ?

মহাভারত ঘেঁটে পেলাম আরও একটি আশ্চর্য দেববিমান, মাতলি-চালিত ইন্দ্রের অগ্নিরথ। ইজেকিয়েল-দৃষ্ট ও এনক-দৃষ্ট ঈশ্বরীয় পুষ্পকরথগুলির সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচার করে দেখলাম, ইন্দ্ররথটিও পুরাযুগের যান্ত্রিক বিমান বলেই প্রতীয়মান হয়।

দানিকেন বাইবেলের পবিত্র কাহিনী ঘেঁটে উদ্ধার করেছেন পয়গম্বর ইজেকিয়েলের দেখা সদাপ্রভুর মহাকাশযানটি যা একটি প্রয়োগ ও প্রযুক্তিসম্ভব রকেট ছিল। আর রুশ বিজ্ঞানীরা একটি ভারতীয় মহাকাশযান সম্পর্কে বহুকাল কৌতূহলী। মহাকাশযানটির নাম, ধূরাকপালম্। সংগৃহীত তথ্যাবলী জানায়, একটি পাঁচ ফুট চওড়া নলাকৃতি আকাশযান ছিল সেই পৌরাণিক ধূরাকপালম্। দেখতে স্বচ্ছ প্লাস্টিক টিউব বা নলের মত। বর্ণ ছিল উজ্জ্বল স্বর্ণাভ। চালক বসতেন বাক্সের আকার একটি আসনে। সেই আসনটির নিচেই থাকত জ্বালানি এবং তারই থেকে উৎপন্ন হত চালিকাশক্তি। চালকের সামনে স্টিয়ারিং-এর আকার একটি সোনালি চাকতি থাকত। দুটি গোলাকার স্ফীত অংশের ওপর হাত রেখে চালক তাঁর মহাকাশযানের গতি নিয়ন্ত্রিত করতেন। ঐ গোলকদুটির সঙ্গে ব্যাটারির সংযোগ রক্ষা করত কয়েকটি রূপোর তার। একটি অস্ফুট শব্দ তুলে হাউই বাজির মত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হত ধূরাকপালম্ ; ছাইরঙা এক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত সেটা, রেখে যেত কয়েকটি বিভিন্ন রঙের লম্বা লম্বা দাগ।

ভারতীয় মহাকাশযান ধূরাকপালমের অনুরূপ একটি যান-চালনারত মহাকাশচারীর অতি প্রাচীন নিখুঁত প্রস্তরচিত্র আছে মেক্সিকোর পালেঙ্কে অবস্থিত মায়াদের অন্তর্লেখ মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠের পাথুরে দেওয়ালে। নভশ্চর দেবতা সে চিত্রে অত্যাধুনিক পোশাকে সুসজ্জিত। (১ নম্বর চিত্র দ্রঃ)। শুধু পুঁথি প্রমাণই নয়, এমনি চিত্র প্রমাণও আছে বিশ্বময় ছড়ানো। দানিকেনের আহৃতিতে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

আগরেস্ট আবিষ্কার করেছেন বায়ালবেকের বিস্ময়কর প্রস্তরচত্বর। চত্বরটি তাঁর জিজ্ঞাসু মনে নতুন আলোকপাত করেছে। বায়ালবেকের চত্বর পৌরাণিক মহাকাশযানের অবতরণ ক্ষেত্র ছিল, এই চমকপ্রদ ধারণাই তো বায়ালবেককে নতুন করে আবিষ্কার করা। ঠিক তেমনিই দানিকেনের কাছে নাজকার প্রশস্ত পার্বত্য চত্বরটিও একটি মহাকাশযান অবতরণ ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে।

সমুদ্রের কোল থেকে উঠে গেছে আণ্ডীজ পর্বতমালা। তারই একাংশে আছে প্রশস্ত এক অদ্ভুত চেহারার সমতলক্ষেত্র। এক মাইল চওড়া. সাঁইত্রিশ মাইল লম্বা সেই পার্বত্য সমতলক্ষেত্রের বুক চিরে কে বা কারা কোনো এক পৌরাণিক যুগে ছকে রেখে গেছে বিরাট বিরাট জ্যামিতিক রেখা। দানিকেন

২নং চিত্র। স্বর্গীয় রকেট চালনারত মহাকাশচারী দেবতা।

লিখেছেন, "আকাশ থেকে দেখে নাজকার এই সাঁইত্রিশ মাইল লম্বা সমতলভূমিকে আমার পরিষ্কার মনে হয়েছিল একটি বিমানাঙ্গন।"

অনেক পুরাণ গ্রন্থ ঘেঁটে সভ্য অসভ্য আদিম জাতির প্রাচীন পুঁথি থেকে খুঁটে খুঁটে উদ্ধার করেছেন দানিকেন সেইসব বিপুল তথ্যসম্ভার। ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তথ্য ও চিত্রাবলী সংগ্রহের জন্য এবং আমাদের সামনে রেখেছেন বহু প্রাচীন শিলাচিত্র ও শৈলমূর্তির আলোকচিত্র। তারপর বিচারে বসেছেন ঐ প্রশ্নটি নিয়েঃ প্রাগৈতিহাসিক দুনিয়ার সর্বত্রই রহস্যময় রশ্মিরথে চেপে যাঁরা আমাদের গোলকে অবতরণ করেছিলেন এবং তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানহীন মানুষ যে আকাশচারীদের দেখে বিস্ময়ে আভূমি নত হয়ে সেই আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁরাই কি মানুষের চাক্ষুষকরা দেবতা? দেবতারা কি গ্রহান্তরেরই মানুষ? আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান ও শিক্ষা কি তাঁদেরই কাছ থেকে সংগৃহীত?

দানিকেন বলেন, পৃথিবীব্যাপী সর্বত্রই যখন মহাকাশচারী দেবতাদের কথা ছড়িয়ে আছে, আছে মহাভারতে, বাইবেলে, গিলগামেশ মহাকাব্যে, এস্কিমো ও রেড ইণ্ডীয়দের পুরাকথায়, আছে স্ক্যান্‌ডিনেভীয়, তিব্বতীয় পুঁথিতে, এবং আরও অনেকানেক সূত্র থেকে যখন উড়ন্ত দেবতাদের কথা, তাঁদের রহস্যময় স্বর্গীয় যানের কথা জানা যায়, জানা যায় ভীতিপ্রদ অলৌকিক বিপর্যয়ের বিবরণ, তখন এইসব তথ্যাবলীকে আর ভিত্তিহীন অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না।[১]

দানিকেনের যুক্তি-তর্ক-বিচার ও সংগ্রহে বস্তুত মুগ্ধ হতে হয়। ব্যাখ্যাহীন আশ্চর্য বস্তুর নিদর্শন হিসেবে আজও পর্যন্ত পৃথিবীর নানা স্থানে যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দানিকেন তাঁর ঐ একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সব কিছুরই যুক্তিসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য ও তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন। দানিকেনের লক্ষ লক্ষ পাঠকের অনেকেই তাঁর যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করছেন, আর যাঁরা তা পারছেন না, পাল্টা যুক্তি উত্থাপন করে তাঁরাও কিন্তু দানিকেনের যুক্তিগুলির সারবত্তা খণ্ডন করতে পারেননি। বরং তাঁর যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে পণ্ডিতরা মনে মনে আকর্ষিত হয়েছেন বলেই দানিকেন আজ পৃথিবীর যে প্রান্তে যাচ্ছেন সেখানেই সংবর্ধিত

(১) "It is impossible and incredible that the chronicles of the Mahabharata, the Bible, the Epic of Gilgamesh, the texts of the Eskimos, the Red Indians, the Scandinavians, the Tibetans and many, many other sources should all tell the same stories of flying 'gods', strange heavenly vehicles and the frightful catastrophies connected with these apparitions, by chance and without any foundation" (*'Chariots of the Gods ?' – Erich Von Daniken*)

হচ্ছেন। এমন কি সরকারী দায়িত্বশীল পদস্থ ব্যক্তিরাও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি! এ সবেরই অর্থ, আমাদের চিন্তায় দানিকেনতত্ত্ব বেশ ভালোভাবেই জায়গা করে নিতে শুরু করেছে।

মহাকাশযান থেকে আকাশ ও পৃথিবী কেমন দেখায় এবং পুরাকালে আমাদের পিতামহগণ কেমন দেখেছিলেন তার চিরকালীন সাক্ষ্য হয়ে রয়ে গেছে দানিকেন-উল্লিখিত পীরি রইসের সংগৃহীত অতি প্রাচীন একটি মানচিত্র। দানিকেনগ্রন্থের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত তাঁরাই সেই মানচিত্র ও তার চিত্রানুলিপিটি লক্ষ্য করেছেন। ঐ প্রাচীন মানচিত্র কী করে অঙ্কন করা সম্ভব যদি না কেউ মহাকাশ থেকে এই পৃথিবীকে সেদিন দেখে থাকেন? বর্তমানের কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা চিত্র ও পীরি রইস সংগৃহীত মানচিত্রের মধ্যে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রইস যেকালে (অষ্টাদশ শতকের গোড়ায়) মানচিত্রগুলি আবিষ্কার করেন, আমাদের মনে মহাকাশবিজ্ঞানের চিন্তা তখন শুরুই হয় নি।

পৃথিবীর ভূস্তরেও দেবতাদের আগমনের স্মৃতি-প্রমাণ রয়ে গেছে, ডঃ ম্যাটেস্ট আগরেস্ট বলেন, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস হল, টেকটাইট বা কাঁচসদৃশ বস্তু। এমন বস্তুর জন্মকথা আজও আমাদের অজ্ঞাত। তাই অদ্ভুত কাঁচশিলারা আগরেস্টকে বিচলিত করে। কোত্থেকে এলো অমন অপার্থিব বস্তু? তাদের মধ্যে ধরা পড়ে কেন রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ? তবে কি সে-যুগেও হয়েছিল আনবিক যুদ্ধ!

নেভাদা মরুভূমিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বালি পরিণত হয়েছিল কাঁচসদৃশ বস্তুতে। একই রকম জিনিস পাওয়া গেছে পেরুতে, ইরাকে, গোবি মরুভূমিতে। ভারি আশ্চর্য কথা নয় কি?

দেবতাদের মহাকাশচারী রূপে আগমনের চাক্ষুষ প্রমাণ আজও পাওয়া যায় ব্রেজিলের কায়াপো ইণ্ডীয়দের পৌরাণিক অনুষ্ঠানের সাজসজ্জায়। দানিকেন জানালেন, ইণ্ডীয়রা তাদের প্রাচীন পুরাণের নির্দেশানুসারে যে ঘাসখড়ের পোশাক পরে সে পোশাক দেখতে অবিকল আধুনিক নভশ্চরের মহাকাশযাত্রার পোশাকের মত। কায়াপোরা বলে, তাদের দেবতারা এমনি পোশাক পরে পৃথিবীতে এসেছিলেন। আদিম কায়াপোরা নিশ্চয় আধুনিক নভশ্চরদের দেখে তাদের পুরাণ লেখেনি। তাদের ঐ ধর্মীয় পোশাক দেখেই বরং আজ আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত হয়। এই আদিম জাতিরা অমন নভশ্চরের পোশাক কোথায় দেখেছিলেন? দেখেছিলেন তাঁদের প্রাচীন পিতারা। দেখেছিলেন তাঁদের দেবতার গায়ে। এ পোশাক দেখে আজ আর বুঝতে অসুবিধা হয় না, এমন পোশাক একমাত্র নভশ্চারণার প্রয়োজনেই তৈরী হয়েছিল এবং যে ইণ্ডীয় দেবতারা

ঐ পোষাক পরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন তাঁরা এসেছিলেন মহাকাশ ভেঙেই। (৩নং চিত্র দ্রঃ)।
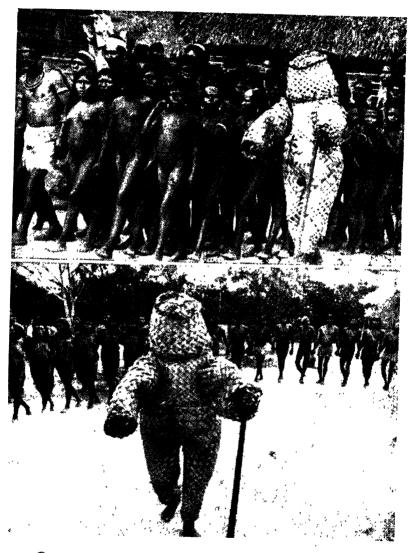
৩নং চিত্র। কায়পো দেবতারা আকাশ থেকে নেমেছিলেন এই রকম পোশাক পরে! এই পোশাকের সঙ্গে আধুনিক মহাকাশচারীর পোশাকের অদ্ভুত মিল। কায়পোর পুরা পিতারা দেবতারূপে তাহলে কাদের দেখেছিলেন সেই পুরাকালে ?

প্রতিদিনই দানিকেনের আহৃতিতে নতুন তথ্য ও প্রমাণ জমা হচ্ছে। প্রাচীন দেবতাদের যে সব মূর্তি আজ পৌরাণিক স্মৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে আছে তারই কিছু কিছুর আলোকচিত্র দানিকেন তাঁর পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরছেন চাক্ষুষ প্রমাণ হিসেবে।

উত্তর আমাজন থেকে সংগৃহীত এক দেবমূর্তির চোখে মস্ত চশমা আঁটা। দেবতার মুখ যেন নভশ্চরের পোশাকে আবৃত। (৪নং চিত্র দ্রঃ)। বাঁকুড়ার বোঙা পুতুলও অনেকটা এমনিই দেখতে।

৪নং চিত্র। আমাজনের ইণ্ডীয় দেবমূর্তি।
দেবতা না নভশ্চর?

ঠিক একই রকম প্রাচীন পৌরাণিক মূর্তি হল, জাপানের ডোগু মূর্তি। মূর্তিটির সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। মূর্তিটি সংরক্ষিত আছে জাপানের সুণ্টোরি আর্ট মিউজিয়ামে। এ মূর্তির চোখেও বিশালাকার চশমা এবং পোশাক আধুনিক নভশ্চরের পোশাকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (৫নং চিত্র দ্রঃ)।

কল্লম্বিয়া থেকে সংগৃহীত হয়েছে আর এক দেবমূর্তির ছবি। এই দেবতা তিন হাজার বছরের পুরনো হলে কি হবে, আধুনিক আকাশচারীর সঙ্গে এ'র সাদৃশ্য প্রায় অনস্বীকার্য। ঠিক এমনিই আরও দুটি কৌতূহলোদ্দীপক পৌরাণিক রহস্যময় মূর্তির প্রতিকৃতি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। ছবিগুলি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন দানিকেন গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীঅজিত দত্ত।

দূর সৌরমণ্ডল থেকে ভিনগ্রহী বুদ্ধিমান মানুষের এই গ্রহে আসা কি

৫নং চিত্র। জাপানী ডোগু মূর্তি। ৬০০ খৃঃ পূঃ।
প্রাচীন মহাকাশচারী?

সম্ভব? প্রশ্নটি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। দানিকেন এ কাজের সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করেছেন খুবই বিশ্বাসযোগ্য উপায়গুলির আলোচনা করে। আগরেস্টও তাঁর অনুমিতি গড়েছিলেন এমন সম্ভাবনার ওপরেই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা কতকাংশে বর্ণনা করেছি এখন Astronauts of Yore নিবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

"A rocket with a velocity approaching that of light is no longer

subject to classical Newtonian mechanics. It obeys the laws of Einstein's relativistic mechanics, and according to relativity theory, time in such a rocket passes much slower than for an earth-bound observer...Thus flight to remote worlds can be viewed as a feasible task of the not too distant future."

গ্রহান্তরে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, এ বিষয়েও বিজ্ঞানীরা আজ

৬নং চিত্র। কলম্বিয়ার প্রাচীন দেবমূর্তি। বয়স ৩০০০ বছর। তিন হাজার বছর আগে এ পোশাক কোন কাজে লাগত ?

অনেকেই প্রায় একমত। তাঁরা বিশ্বাস করেন, শুধু আমাদের ছায়াপথেই আছে বহু সংখ্যক গ্রহ যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব।

কেবলমাত্র আজকের বিজ্ঞানীরাই নন, খৃঃ পূঃ পাঁচশ বছর আগে দার্শনিক

অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার বলেছিলেন—"পৃথিবী একা নয়, পৃথিবী ও মানুষ বিশ্বে আরো বহু আছে।"

মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান সভ্যতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও তাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। সম্মেলনে 'গ্রীনব্যাংক ফরমুলা' নামে স্মরণীয় একটি সমীকরণ উপস্থাপিত করেন বিজ্ঞানী ড্রেক। উদ্দেশ্য ছিল মহাবিশ্বের যেসব সভ্যতা অন্যান্য গ্রহবাসীদের সঙ্গে সংযোগ রচনা করতে উৎসুক, সেই অনুসন্ধিৎসুদের একটি সংখ্যা নির্ণয় করা। এই সমস্ত তৎপরতাই আমাদের মত সাধারণ মানুষকে জানাচ্ছে যে, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন গ্রহান্তরগমনাগমন ও গ্রহান্তরের প্রাণীমহলের

৭নং চিত্র। এই দুটি ছবির ব্যাখ্যা কি? পাঠক অনুমান করুন!
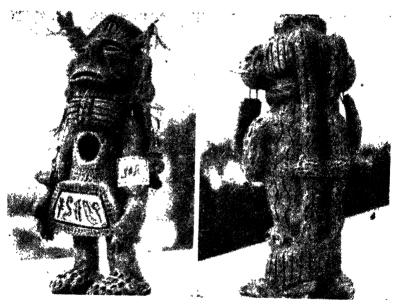
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়, তা সম্ভব এবং সেটাই সব চেয়ে বড় সত্য। কুয়োর ব্যাঙের মত আমাদের স্বল্পবিদ্য এমন দম্ভ রাখা অনুচিত যে এই মহাবিশ্বচরাচরে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান জীব, আর কোথাও আমাদের মত অথবা উন্নততর জীবন নেই। নিশ্চয় আছে, অবশ্যই ছিল। তাই আমাদের বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছেন সংকেত বার্তা অজ্ঞাত সেই মহাবিশ্বের রহস্যময় বুদ্ধিমানদের উদ্দেশ্যে। আশা করেন, এই সংকেত বার্তা অন্য গ্রহের

প্রাণীরা যদি ধরতে পারেন তবে ফেরত পাঠাবেন তাঁদেরও সংকেত। খুলে যাবে মহামিলনের স্বর্গদ্বার। পৃথিবীলোকের বার্তা নিয়ে এখন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে পৃথিবী-প্রেরিত পায়োনীয়র।

মহাকাশে নীত হয়ে অর্জুন দেখেছিলেন অনেকানেক বিমান।

কী ছিল সে বস্তুগুলি? ভাসমান উপগ্রহ? সেদিনের সেই দেবতারাই কি এই পৃথিবীর আকাশে ভাসিয়ে রেখেছিলেন উপগ্রহগুলিকে? কী-ই-বা এমন শক্ত কাজ তা?

না, শক্ত নয়। আমরাও আজ মহাশূন্যে ভাসিয়ে দিয়েছি দু' হাজারেরও বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ। চাঁদের মত এই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে উপগ্রহগুলি। সুতরাং আজ আর কোনো মহাকবির সেই অমর বাণীকে বিনা তর্কে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, যে বাণী বলে, আমাদের বুদ্ধির অগোচরে আছে বহু জিনিস যার ব্যাখ্যা হয় না। সত্য বটে, না-জানা রহস্যের পরিমাণও এই মহাবিশ্বপ্রমাণ। কিন্তু তা যে চিরকালই থাকবে বুদ্ধির অগোচর, তার যে কখনই কোনো ব্যাখ্যা বুদ্ধিমান মানুষ দিতে পারবে না, এমন শাশ্বত বাণীকে অপ্রমাণ করার জন্যই তো বিজ্ঞানীরা চিরকাল দলবদ্ধভাবে অতন্দ্র পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁরা বলবেন, অজ্ঞাত অলৌকিক বলে এমন কিছুই থাকতে পারে না যা ব্যাখ্যাতীত। সব রহস্যেরই জবাব আছে।

বিজ্ঞানীরা তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহস্যময় বস্তুর সন্ধানে ও ব্যাখ্যায় নিবিষ্টচিত্ত। মানুষের পুরাণকথায় বিবৃত বহু অব্যাখ্যাত রহস্যেরও কিনারা করতে তাঁরা উন্মুখ। যত বেশি সেসব রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হবে ততই পরিষ্কার বুঝতে পারব আমরা সেইসব দেবতাদের যাঁদের অদ্ভুত কীর্তি-কলাপ ভাঙিয়ে এই গ্রহের একদল মানুষ আজও আমাদের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস মূলধন করে ব্যবসা করে যাচ্ছেন।

দেবতাদের কঙ্কাল বা ফসিল পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু দেববিমান সম্পর্কে পৌরাণিক কথা আছে অসংখ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিমানের মডেলও দানিকেন আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন যাদুঘরে। এমন একটি সুবর্ণ মডেল আজও রক্ষিত আছে বোগোটার (কলাম্বিয়া) স্টেট ব্যাঙ্কে। মডেল বিমানটির আকৃতি ইউ এস বি-৫২ বিমানের মত। তাকে বিমান যন্ত্রবিদরা 'বায়ু সুড়ঙ্গে' উড়িয়ে দেখবার চেষ্টাও করেছেন। নু ইয়র্কের অ্যারোনটিক্যাল বিদ্যালয়ের ডঃ পইসলী বলেন, এই মডেলটিকে মাছ বা পাখির মডেলরূপে গণ্য করা অসম্ভব কেননা

'পাখির অমন জ্যামিতিক ধাঁচের পাখা বা খাড়া উঁচু পাখনার কথা কল্পনাও করা যায় না।'[২]

এস্কিমোরা উত্তর গোলার্ধে হাজির হয়েছিলেন নাকি ধাতব পক্ষীতে চেপে। তাঁদের পুরাণ বলে, 'প্রথম মানুষকে উত্তরে এনেছিলেন পেতলের পাখাওলা দেবতারা।' রেড-ইণ্ডীয় কাহিনী এক বজ্র বিহঙ্গের কথা বলে। সেই বজ্র বিহঙ্গমই তাদের এনে 'দয়েছিল আগুন আর মিষ্টি ফল।[৩]

আমাদের রামায়ণ মহাভারতে বিমানপোতের ছড়াছড়ি। শুধু দেবতারাই নন, বিমানের মালিক ছিলেন ভারতপুত্ররাও। দুই মহাকাব্যেই আছে আকাশ যুদ্ধের কথা।

পৌরাণিক বিমানের সব চেয়ে বড় পুঁথি-প্রমাণ ভরদ্বাজ মুনির বৈমানিক শাস্ত্রম গ্রন্থটি।

বিমানের সংজ্ঞা সেখানে এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

পৃথিব্যপ্স্বন্তরীক্ষেষু খগবদ্বেগতস্ স্বয়ম্।

যস্সমর্থো ভবেদ্বন্তুং স বিমান ইতি স্মৃতঃ ।।

অর্থাৎ নিজের শক্তিতে যে যন্ত্র পাখির মত জলেস্থলে ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারে তাকেই বিমান বলা হয়।

বলা হয়েছে ঃ বিমান বিশারদ পণ্ডিতরা তাকেই বিমান বলেন, আকাশপথে যে যান স্থান থেকে স্থানান্তরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে উড়ে যেতে পারে ঃ

দেশাদ্দেশান্তরং তদ্বদ্দ্বীপাদ্দ্বীপান্তরং তথা।

লোকাল্লোকান্তরং চাপি যোঽম্বরে গন্তুমর্হতি।

স বিমান ইতি প্রাক্তো খেটশাস্ত্রবিদাং বরৈঃ ।।

ভরদ্বাজ পুঁথি বৈমানিক শাস্ত্রের একাধিক গোপন পদ্ধতির কথাও বলে। তা জানায়, আকাশে বিমানকে কেমনভাবে একই জায়গায় নিশ্চল করে রাখা যায়, কেমনভাবে শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে নিজের বিমানকে দেওয়া যায় অদৃশ্য করে।

ভরদ্বাজ পুঁথি বলে, সেকালের বৈমানিকেরা জানতেন ঃ

পরবিমানস্থ জনভাষণাদিসর্বশব্দাকর্ষণরহস্যম্ ।। অর্থাৎ, শত্রুপক্ষীয় বিমানের শব্দ আকর্ষণ করার ও সেই বিমানের কথোপকথন শ্রবণ করার গোপন পদ্ধতি…।

---

(২) এরিক ফন দানিকেনের 'বীজ ও মহাবিশ্ব' / অনু, অজিত দত্ত দ্রঃ।

(৩) ঐ, 'প্রমাণ' দ্রঃ।

পরবিমানস্থবস্তু রূপাকর্ষণরহস্যম্ ।

মানে, শত্রুপক্ষীয় বিমানের অভ্যন্তরস্থ চিত্রগ্রহণ বিষয়ক রহস্য··· ।

পরযানাগমনাদিকৃপ্রদর্শনক্রিয়ারহসম্ ।

শত্রুপক্ষীয় বিমানের গতিপথ নির্ণয়ের গোপন পদ্ধতি···।

এইভাবেই তাঁদের জানা ছিল পরবিমান নাশক্রিয়া রহস্যম্ । জানা ছিল. পরবিমানস্থ যাত্রীদের স্তব্ধিকরণের গোপন উপায় ।[৪]

লেসার রশ্মির সহায়তায় এ সব প্রক্রিয়াই সম্ভব। লেসারের উন্নততর প্রয়োগ ঘটলে আজকের বৈমানিকও হয়ত এই ভাবেই সবকটি পদ্ধতি কাজে পরিণত করতে পারবেন। নাশকক্রিয়ায়, চিত্রগ্রহণে কথাবার্তা বলায় লেসার আজ মস্ত হাতিয়ার. সে আরও কত ক্ষমতার অধিকারী করবে পৃথিবীর জীবন্ত দেবতাদের (বিজ্ঞানীদের) কে বলতে পারে। পুরাযুগের চতুর সেই দেবতাদের সঙ্গে আমরা হয়ত দূর ভবিষ্যতে অন্যগ্রহে গিয়ে হ্যাণ্ডসেক করে আসতে পারব অথবা বিজ্ঞানে অনগ্রসর কোনো গোলকে নেমে আমরাই হব নয়া শতকের নতুন দেবতা।

ঠিক মানতে পারছেন না ? কিন্তু বিজ্ঞানীরা সেই সুপার স্পেশ বা হাইপার স্পেশ আবিষ্কারের জোর চেষ্টা করছেন। বিষয়টি এখনও বৈজ্ঞানিক কল্পনা-মাত্র। কিন্তু কাল্পনিক অনুমানই বহুবার বাস্তব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সার্থক-ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুপার স্পেশ আবিষ্কৃত হলে সেই বিশেষ মহাজাগতিক পথে একটি মহাকাশযান গ্রহান্তরে পেঁাছে যেতে পারবে অত্যল্প সময়ে। বৈজ্ঞানিক অনুমান. সুপার স্পেশে স্থানকাল বলতে কিছুই নেই। এ প্রসঙ্গে In Search of Ancient Mystries গ্রন্থের লেখক বলেন, By our thirtieth or fortieth century. unimagined gateways to hyper space may have been flung open by geniuses yet unborn'.—Alan and Sally Landsburg। অর্থাৎ অন্য গ্রহে পৌঁছনোর জন্য যে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন বলে ধারণা. সেই প্রচুর সময় দরকার না-ও হতে পারে।

হাইপার স্পেসের আবিষ্কার অত্যল্প সময়ে একটি মহাকাশযানকে সুদূর মহাজাগতিক পথে ছুঁড়ে দিতে পারবে। ডঃ হুইলার মনে করেন, মহাশূন্যে আছে অন্য বিশ্বে প্রবেশের পথ (শর্ট কাট)। তাঁর এই সুপার স্পেস তত্ত্বটি আইনস্টাইনতত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আইনস্টাইনের ভাবনা ছিল. মহাশূন্যে আছে আঁকাবাঁকা পথ। হুইলারের ধারণা. বক্রপৃষ্ঠবিশিষ্ট মহাশূন্যের অন্তরভাগ

(৪) ঐ, 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' দ্রঃ।

ফাঁপা। সেখানেই আছে স্থানকালের পরিমাপহীন এক আশ্চর্য মহাজাগতিক পথ (শ্লিপ ?) যে পথে একটি মহাকাশযান প্রবেশমাত্র কল্পনার বেগে পিছলে চলে যাবে অন্য বিশ্বলোকে। বিষয়টি এখনও বৈজ্ঞানিক একটি কল্পনা মাত্র। তবে কল্পনাই তো বাস্তবের গর্ভধারিণী। তাই মহাজাগতিক যোগসূত্র নিয়ে যাঁরা ভাবিত, সম্ভাব্য কোনো জল্পকল্পকেই তাঁরা বিচারের বহির্ভূত করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিচ্ছেন না, সযত্নে ফাইলবন্দী করছেন।

তাই দেখা যায়, 'ফ্লাইং সসা'র বা উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে কিছুকাল ধরে যে হৈচৈ চলছে, গবেষকের বৈঠকে সেই চাকি দর্শনের অসংখ্য ঘটনার বিবরণ সাবধানী বিবাচনে কড়া ছাঁটাই বাছাইয়ের সম্মুখীন হলেও কতকগুলি বিবরণকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে চাকি শুধু দেখা গেছে এমনই নয়, যেখানে সম্ভব, তার ছবিও তুলে নেওয়া হয়েছে। সালে এমনই একটি উড়ন্ত চাকির ছবি তুলে নেন কলোরাডো (আমেরিকা) বাঁধের ওপর উড্ডীন একটি বিমানের বৈমানিকরা। বস্তুটি দেখতে গোলাকার, অনেকটা কোনো ভাসমান উপগ্রহের মত।

গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতি আকাশযানের খবর পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরাপুঁথিতে ও প্রস্তর চিত্রে। আদি পিতারা অনেক জায়গায় তাঁদের উত্তর পুরুষকে জানিয়ে গেছেন, তাঁদের জাতির পূর্বপুরুষরা নেমে এসেছিলেন আকাশ থেকে ধাতুনির্মিত ডিম্বাকৃতি যানে চেপে। অতীতের বর্ণনার সঙ্গে ঘটমান ঘটনারও কী আশ্চর্য সাদৃশ্য ধরা পড়ে যায়। প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাবলীতেও আছে ডিম্বাকৃতি উড্ডীন বস্তু। সেই উড়ন্ত যানের মধ্যে বসে মনুষ্যাকৃতি মহাকাশযাত্রী দেবতা চলেছেন। কোথাও হয়ত দেবতার পরনে অত্যাধুনিক আঁটোসাঁটো পোশাক।

উড়ন্ত চাকি সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী ও সংবাদ এতই চমকপ্রদ যে ইচ্ছে হয়, পাঠককে এক এক করে তাদের কথা শোনাই। কিন্তু এখানে সে অবসর নেই। শুধু বলবার কথা, এ সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনীর সব সত্য না হলেও কিছু কিছু বাতিল করা যাচ্ছে না। বিশেষ, বৈমানিকরা, মহাকাশচারীরা, এবং আরও কেউ কেউ উড়ন্ত অজানা যানের যে বিবরণ দিয়েছেন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ মানুষের দেখা সেই সব বস্তুর বিবরণ খুশিমত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সালে অ্যাপোলো বারো মহাকাশযানের অভিযাত্রীরা দুটি উড়ন্ত বস্তুকে তাঁদের মহাকাশযানটির পাশাপাশি উড়ে যেতে দেখেছিলেন। এ দৃশ্য নাকি পৃথিবীর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকেও দেখা গেছে। ব্যাপারটি নিয়ে সংবাদ-পত্রে কিছু কৌতূহলের সৃষ্টি হলেও কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে অদ্ভুত নীরবতা রক্ষা করে

চললেন। তাই সাধারণে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ পেলেন না। মন্ত্রগুপ্তির ট্র্যাডিশন এখনও নানাভাবে চলে ও চলেছে।

অজানা উড়ন্ত বস্তুর সন্ধান মিলেছে ১৯৬২-৬৩ সালেও।

১৯৮১ সালের ১১ই জানুয়ারীর একটি সংবাদ পড়লাম আনন্দবাজার পত্রিকায়। সংবাদে প্রকাশ, ৪ঠা জানুয়ারী মধ্য স্পেনের ক্যামেরাস অঞ্চলে স্প্যানিশ বোমারু বিমান একটি উড়ন্ত চাকিকে ধাওয়া করে। স্পেনের ইউ এফ ও. সন্ধানী সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উড়ন্ত চাকিটি ছিল উজ্জ্বল রূপালী রঙের। ঘণ্টায় ১৬০০ কি. মি. বেগে সেটি জেট বোমারু বিমানকে অনেক পেছনে ফেলে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চাকিটিকে দেখা যায় পুরো এক মিনিট এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে। (সংবাদ এ. এফ পি)।

মহাজাগতিক অজানা রহস্যের সঙ্গে অনেকে 'বারমুডা' ত্রিভুজে ঘটিত আশ্চর্য কাণ্ডকারখানাকেও নির্দেশ করেন। এই সামুদ্রিক অঞ্চলে অদ্ভুত উপায়ে বড় বড় বোমারু প্লেন তাদের অভিযাত্রীসহ নিখোঁজ হয়ে গেছে। ভাসমান জাহাজ থেকে উবে গেছেন ক্যাপ্টেনসহ যাত্রীরা। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নিখোঁজ প্লেনের বৈমানিক সামান্য দুর্বোধ্য কয়েকটি কথা রেখে গেছেন শুধু তাঁদের বিশ্বাসী আত্মীয় পরিজনের জন্য। তাঁদের নিখোঁজ হওয়ার আগে রেখে যাওয়া শেষ বক্তব্য থেকে জানা গেছে, তাঁরা বলে যেতে চেয়েছেন, কোনোও অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে চলেছেন তাঁরা যা তাঁদের কল্পনাতীত। পথ হারানো বৈমানিকের শেষ কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে, না, আমাদের খোঁজে তোমরা অনুসরণকারী পাঠিও না। অর্থাৎ আমি বা আমরা অনিবার্য আকর্ষণে অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছি, দ্বিতীয় কোনো বৈমানিক ভাইকে একই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিও না তোমরা! বিদায়কালে অসহায় বৈমানিক সংক্ষিপ্ত দু-চার কথায় এভাবেই তাঁর সতর্কবাণী রেখে গেছেন। এখন অব্যাখ্যাত প্রশ্ন ঝুলছে, তাঁরা কোথায়? কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছেন জলজ্যান্ত বিমানসহ বৈমানিকরা, কোথায়ই বা অদৃশ্য হলেন এক জাহাজ মানুষ!

প্রশ্ন সমানে চলেছে, তবে কি অন্য গ্রহের প্রাণী আজও আসা যাওয়া করছেন, খবরাখবর নিচ্ছেন এই পৃথিবীর? বহু স্তরে এই গবেষণা রীতিমত আজকের দুনিয়ার অন্যতম জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা জাগতে পারে বারমুডা ত্রিভুজ থেকে যাঁরা ক্ষেপে ক্ষেপে উবে গেলেন, ব্যাখ্যা না-মেলা সেই ঘটনা পুরাকালে ঘটলে ঘটনাটির সঙ্গে মানুষের স্বর্গযাত্রার কাহিনী কি যুক্ত হয়ে যেত না? মহাকাশযানে চেপে দেবতাদের সঙ্গে অনেকের স্বর্গযাত্রার কাহিনীকে পুরাকালের মহাকাশপথিক ভিনগ্রহের আগন্তুকদের কীর্তি বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন

আগরেস্ট। এমনভাবেই উবে গেছেন যুধিষ্ঠির প্রমুখ অন্যান্যরাও। তাই অনেকেই ভাবতে চাইছেন, আজও কি মানুষের যান্ত্রিক বিমানে চেপে স্বর্গযাত্রার শেষ হয়নি ?

মায়া সভ্যতা সম্পর্কে দানিকেন উল্লেখ করেছেন অদ্ভুত সব তথ্য। মায়ারা আজ আর নেই, কেননা সেই সুসভ্য জাতিটি হঠাৎ পৃথিবীর বুক থেকে অজ্ঞাত কারণে উবে গেছেন। মায়া পুরাণ বলে, দশ হাজার বছর আগে একটা নাকি খুব উচ্চ পর্যায়ের সভ্যতা ছিল। তাঁদের পুরাপুঁথি পোপোল ভূঃ তে উল্লেখ আছে, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে মায়াদের চারশো দেবতা ফিরে গেছলেন তাদের নিজ বাসভূমি কৃত্তিকা নক্ষত্রে। অমন সুসভ্য মায়াদের সবংশে লোপাট করে দিল তবে কারা ? মায়া শহরের নমুনা তো এখনো আছে, তবে তা পরিত্যক্ত।

এইসব হারিয়ে যাওয়ার পেছনেও কি আছে সেই দেবতাদের হাত ? যাঁরা এসেছিলেন আকাশ ফুঁড়ে আর প্রত্যাবর্তন করেছেন নক্ষত্রলোকে ?

আছে অনেক রহস্য আর বেশ কিছু শক্ত সাক্ষ্য। কত আর উদ্ধার করব ? এসব তো ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্রই। ছড়িয়ে আছে পিরামিডের বাইরের প্রকাণ্ড আকৃতি আর ভিতরের রহস্যময় কাজ কারবারের মধ্যে। কিসের প্রয়োজনে কারা গড়েছিলেন সেই অতিকায় স্তূপগুলি ? শুধু কি তা কোনো নৃপতির কবরখানা ? একজন নৃপতি তাঁর সমগ্র জীবৎ-দশায় নিজের দেশের সমস্ত কারিগর লাগিয়েও কি নির্মাণ করতে পারতেন ঐ নিখুঁত জ্যামিতিক মাপ-জোকের পিরামিডগুলি ? সে যুগে ছিল কি তেমন শক্তিমান যন্ত্রপাতি ? ইতিহাস তার কোনো প্রমাণ দিতে পারে না। অথচ বস্তুগুলি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে তাদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের জলজ্যান্ত সাক্ষ্য হিসাবে। মজা এই, ব্যাখ্যা না দিতে পারলেও ঐতিহাসিকদের দিব্যি চলে যায়। কিন্তু হাতের কাছে অজস্র পুরাতথ্যাবলী থাকা সত্ত্বেও কোনো কিছুর ঐতিহাসিকতা মেনে নিতে ওঁদের প্রয়োজন হয় এমন সব বিগলিত হাড়গোড় মাটির তলদেশ থেকে, তার শিলীভূত রূপ তুলে আনতে না পারলেই নয়। মাটির ওপরে, পর্বতগাত্রে, অভ্যন্তরে প্রাচীন মন্দিরের রহস্যময় প্রস্তরগাত্র থেকে বা পিরামিডের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে, দানিকেন তুলে এনেছেন কত না বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ও প্রামাণিক চিত্রাবলী। ব্যাখ্যাও দিয়েছেন চমকপ্রদ। কিন্তু পণ্ডিতরা তবু বলছেন, না, মানা যায় না। তাঁদের প্রশ্ন, কই কবরের মাটি খুঁড়ে তুলে-আনা

দেবতার কঙ্কাল কই ?[৫] প্রস্তর চিত্রে বিশ্বাস নেই : পুরাপুঁথি থেকে অজস্রবার বিভিন্ন ভাবে দেবতাদের পরিচিতি দেওয়া হলেও তাঁদের কাছে সে সমস্তই অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক কথা। পণ্ডিতের বিশ্বাস নিহিত আছে শুধু বোধহয় কবরের মাটির তলায়।

তা মাটির তলায়ও নেমেছিলেন দানিকেন। পাতাল থেকে উদ্ধার করেছেন ঢের পুরাতত্ত্ব এমন কি মস্ত প্রলম্ব প্রাসাদ আর সোনার স্তূপ। দানিকেন নিজে তুলে এনেছেন সেই হোয়ান মরিসের আবিষ্কৃত পাতাল রাজ্যের ছবি। "দক্ষিণ আমেরিকার মাটির গভীরে লুকিয়ে রয়েছে হাজার হাজার মাইলব্যাপী বিশাল সুড়ঙ্গ শ্রেণী। কে জানে কে তার স্রষ্টা আর কবেই বা তার সৃষ্টি।"[২]

আর উদাহরণ বাড়াব না। ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া পাতা উদ্ধার করতে আমাদের ঐতিহাসিক কালে কোনো ঐতিহাসিকই দানিকেনের মতো এত পরিশ্রম এমন অকাতর অর্থব্যয় ও একক প্রচেষ্টা চালাবার কল্পনা দূরে থাক, স্বপ্ন দেখারও ভরসা পাননি। একটা দুটো শব্দ খুঁটেই পণ্ডিতরা অনেক ঐতিহাসিক রহস্যের সমাধান করে দিয়েছেন। আমাদের সেসব কথা পাখি পড়ার মতো শিখতেও হচ্ছে। অথচ পর্বতপ্রমাণ তথ্যাদি হাজির করেও অন্ধকার যুগের অবগুণ্ঠন খুলতে পারছেন না এক অতন্দ্র গবেষক।

দেবতার খাদ্য

দেব শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করে নিরুক্তকার বলেছেন, যা উজ্জ্বল তেজোদীপ্ত তাই দেবতা। দেবতা একজাতীয় উজ্জ্বল পুরুষ।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঐতরেয় উপনিষদের প্রতি। তিনি দেখিয়েছেন, বেদে ইন্দ্রাদি দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ইন্দ্রাদি দেবতা বিভিন্ন নাম হলেও বৈদিক ঋষি যখন যে দেবতার স্তুতি করেছেন, তখন সেই দেবতাকেই পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টারূপে দেখেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন নাম হলেও দেবতারা যে মূলত একই শক্তির প্রকাশ, বেদে এই ধারণাই স্পষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে উপনিষদে দেবতাদের পৃথক সত্তা কল্পিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই দৃষ্টিপাত করেছেন ঐতরেয় উপনিষদের প্রতি। ঐতরেয় উপনিষদ বলছে, দেবতারা অন্যান্য জীবগণের মত মহান ঈশ্বরেরই অন্যতম এক সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বেদের ঈশ্বর যে এক ও অভিন্ন ঐতরেয়ও তাই বলছে। (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম)।

ঐতরেয়র সন্ধান পেয়ে গ্রন্থটি খুললাম।

ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। অন্য কিছুই ছিল না। তখন সেই পরমাত্মা চিন্তা করলেন তিনি লোক সকল সৃষ্টি করবেন ঃ "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।" ব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগৎ সৃষ্টির পর সেই জীবজগৎ রক্ষার জন্যই তিনি সৃষ্টি করলেন 'লোকপাল'গণকে। শ্লোকটি এইরকম ঃ 'স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা"। (ঐতরেয়, ১।১।৩)। লোকপালগণই ইন্দ্রাদি দেবতা। মহাভারতে যে দেবগণ অর্জুনকে অভিনন্দন জানাতে আকাশ থেকে উজ্জ্বল বিমানে চেপে অবতরণ করলেন, (বনপর্ব দ্রঃ) সেই ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজেদের 'আমরা লোকপাল সকল' বলে পরিচয় দিয়েছেন।

বেদে, যাঁর সম্পর্কে শ্লোক, তাঁকেই দেবতা বলা হয়েছে। এই রীতিতে সামান্য ব্যাঙ্, জীবজন্তু, জড়বস্তুও 'দেবতা'।

প্রশ্ন হল, যা বেদে ছিল না, তা উপনিষদের নবকল্পনায় শ্লোকবদ্ধ হল কেন? তবে কি দেহধারী দেবগণকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই কল্পিত দেবতার স্থানে বসানো হল বহিরাগত নভশ্চরদের? আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক জবাব নেই। তবে বেদ উপনিষদ ও মহাভারতের কাল-বিচারে এমন সন্দেহ হতেই পারে যে, দেহধারী দেবতারাই কল্পিত প্রাকৃতিক দেবতাদের স্থান দখল করে নিলেন উপনিষদীয় যুগে, যা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক।

তিলকের মতে বেদ খৃঃ পূঃ সাড়ে চার হাজার বছরের পুরানো। ভাষা-

তাত্ত্বিক বিচারের পর ডঃ বি. কে ঘোষ বলেন, বৈদিক যুগের সময় যথার্থভাবে নির্ণয় করা শক্ত। তবে 'On linguistic grounds the language of Rig Veda, the oldest Veda, may be said to be of about 1000 BC. *(Vedic Lit.—History and Culture of the Indian People, Gen Editor, Dr. R. C. Mazumdar)*। বেদ বেদান্ত মহাভারত লিখিত আকার গ্রহণ করেছে অনেক পরবর্তীকালে। কিন্তু তার সৃষ্টি বহু আগে। তাই ডঃ ঘোষ অন প্রবন্ধে (Aryan Problem) বলেছেন, বেদের শ্লোকে যে বৈদিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তা অবশ্য বহু পুরাতন। খৃঃ পূঃ দেড় হাজার বছর আগে তো বটেই যাইহোক তিলকের মত গ্রহণ করলে (ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে' এই মতেরই সমর্থক) বেদ, উপনিষদের অনেক পূর্ববর্তী। তিলক মতে প্রাচীন উপনিষদগুলি খৃষ্টপূর্ব ষোল শত বছরের পুরানো। তিলক মতে এবং ডঃ পুশলকরের গণনায় মহাভারতের যুদ্ধকাল চোদ্দশ খৃঃ পূর্বাব্দ। অন্যান্য গ্রাহ্য মতও এই যুদ্ধকে এক হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দের কম বলে না। এইসব কালক্রম বিচারে মাথা ঘুরে যায়। আমরা শুধু বুঝতে পারি বেদ অনেক দূরবর্তী। কিন্তু উপনিষদ ও মহাভারতের সময়কালের ব্যবধান কাছাকাছি।

অর্থাৎ যা বলছিলাম, দেখা যাচ্ছে, পুরুষ বা পরমাত্মা যে দেবগণ ব 'লোকপাল' সৃষ্টি করলেন এমন কথা বেদে নেই। আছে, মহাভারত সমসাময়িক উপনিষদে। এই সময় দেবগণ হিমালয়ে শিবির গেড়ে আর্যাবর্তে তাঁদের প্রভাব বিস্তারের জোরদার চেষ্টা শুরু করেছেন। কিছু বশংবদ মহর্ষিকে দেব-প্রাধান্য প্রচারে নিয়োগও করেছেন। ঋষিরা আর্যাবর্তের শক্তিশালী রাজাদের দেব-আধিপত্যের বশবর্তী করার চেষ্টা করছেন এবং মন্ত্রগুপ্তির সাহায্যে একটা অলৌকিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করছেন মহান ভারতের উত্তরাখণ্ডে! এমন যখন চলছে, তখনই কি দেহধারী দেবতাদের 'লোকপাল'রূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস কার্যকর হয়েছিল? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যদি নাও হয় তবে কি মহর্ষিরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে বিস্মিত হয়েই তাঁদের দেবতা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেন?

ঐতরেয় উপনিষদের অপর একটি শ্লোক এই সন্দেহকে আরও গভীরে নিয়ে যায়। শ্লোকটি দেবতাদের খাদ্য সম্পর্কে। অর্থাৎ শ্লোকটি বলছে দেবতারাও ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন। তাঁরা মুখ দিয়ে অন্ন গ্রহণ করেন ও অপানবায়ু দ্বারা সেই অন্নকে শরীরের নিম্নভাগে প্রেরণ করেন। এমন কাজ তো দেহধারী জীবেরই পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া। ঈশ্বরও এমন কাণ্ড করেন, তা ভাবা যায় না একথা আরও স্পষ্ট করে বলা আছে যে, ঐ অন্ন বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা

যখন অসম্ভব হল তখনই তা দেবগণ মুখবিবর দ্বারা গ্রহণ করলেন ঃ 'তদ্‌পানেনাজি ঘৃক্ষৎ তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুঃ। অন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১।৩।১০। মানে, 'তৎপর সেই আদি পুরুষ অপানবায়ুদ্বারা (মুখগহ্বর হইতে নিম্নাভিমুখী বায়ু দ্বারা) ঐ অন্নকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন এবং উহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। অপানবায়ু অন্নের গ্রাহক এবং ইহাই আন্নায়ু' (হরফ প্রকাশনী সং, ১ম খণ্ড ।

এসব তত্ত্বের অবশ্য অনেক পাণ্ডিত ব্যাখ্যাও আছে যা দেবতার আলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বস্তুত যুক্তিসম্মত। তথাপি আমাদের সেসব ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ঐতরেয়র শ্লোক আমাদের জানিয়ে দেয়, জন্মের পর দেবতাদেরও সংসারসমুদ্রেই পতিত হতে হয়েছিল এবং তাঁদেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা নামক জৈব ব্যাপার আছে। ব্যাখ্যা যেমনই হোক আমরা বুঝতে পারি, জগৎ সৃষ্টির মূলে যে শক্তি, যাকে আমরা পরমেশ্বর রূপে কল্পনা করেছি, সেই মূলীভূত শক্তি আর তথাকথিত দেবগণ এক ও অভিন্ন নন। বেদে তাঁরা একই শক্তির বিভিন্ন কাল্পনিক রূপ। উপনিষদের যুগে এসে আবার তাঁরাই হলেন সেই পুরুষোত্তমেরই অন্যতম সৃষ্টি। অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে অপরাপর সৃষ্টির ভেদ অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেল। এই বিচিত্র ব্যাপার আমাদের দিচ্ছে নতুন চিন্তার খোরাক! প্রশ্ন জাগছে, এমনটা কেন হল ? দেবতাদের ক্ষিধে তেষ্টা আবার কী বস্তু ? তবে কি তাঁরা দেহধারী জীব ? নিজেদের ক্রিয়াকলাপের বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে তাঁরা কি পেয়েছিলেন দার্শনিক ব্যাখ্যায় দেবপ্রতিষ্ঠা ?

ডঃ ভি. এম. আপ্তে তাঁর Religion and Philosophy নিবন্ধে (*The Vedic Age*) বলিপ্রথা সম্বন্ধে বলেছেন 'It is hardly any wonder that the humanized gods of the Rigveda should share some human weaknesses and be susceptible to flattery and gifts. A full meal was certain to win divine favour. Thanksofferings were known '

অর্থাৎ, মানবিক গুণসম্পন্ন দেবতাদের খুশি করা ও প্রতিদানে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যেই শুরু হয়েছিল বলিদান ও নৈবেদ্য নিবেদনের প্রথা। মানুষ জানত, দেবতারা আহার করেন। তাই একদিন তাঁদের আহার্যেরও যোগান দিতে হয়েছিল মানুষকে। সেই থেকেই কি চলে আসছে নৈবেদ্য নিবেদনের রীতি ? শুধু খাদ্যই নয়, দেবতাদের দেওয়া হত ঘড়া ঘড়া সোমরস বা মদ। ইন্দ্র বেশ পোক্ত মদ্যপ ছিলেন। এক এক দেবতা বা পৃথিবীর এক এক প্রান্তের দেবতারা পছন্দ করতেন বিশেষ বিশেষ মদ। কোথাও বা মধু দেওয়া হত।

পর্বতনিবাসী দেবতাদের বশ্যতা স্বীকার করে তৎকালের যে মানব গোষ্ঠীর দলপতি দেবতাকে দিয়ে আসতেন পৃথিবীর ভোগ্য সম্পদ, দেবতার কৃপায় তিনি পেতেন কিছু কিছু অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শক্তি, বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষ যে শক্তিকে অলৌকিক শক্তিরূপে গণ্য করত। এই ভাবেই সৃষ্টি হতেন মোজেস, বেদব্যাস প্রমুখ পয়গম্বর। তাঁদের আনুগত্যের প্রতিদানে তাঁরা পেতেন দেবতার আশীর্বাদ। এভাবেই নৈবেদ্য ও প্রসাদ অথবা 'বর'-দান প্রথা চলে এসেছে। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির যাথার্থ্য বিচারে এ সত্যও আমাদের নজরে আসে।

দেবতাদের বিচিত্র ব্যবহারও আমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য রেখে গেছে। সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষদগুলির অন্যতম কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর নবম শ্লোকে যম নচিকেতাকে বলছেন, 'নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেঽস্তু,' অর্থাৎ 'হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে নমস্কার করি, আমার মঙ্গল হোক।' মানবপুত্র নচিকেতাকে যম নমস্কার জানাচ্ছেন এই ভেবে যে সদ্‌ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলে গৃহস্থের কল্যাণ হয়। কঠোপনিষদে যম একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থরূপেই বর্ণিত। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করায় নচিকেতাকে যম বলেছিলেন, 'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং'। মানে, নচিকেতার মতই দেবতারাও এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। দেবতার সঙ্গে প্রাকৃতজনের যে খুব বেশি তফাত নেই, যমের উক্তি তারই অপর এক প্রমাণ।

ঠিক অনুরূপ এক প্রশ্ন করেছিলেন ইহুদি পুরোহিত ও দেববাণীর লেখক এজরা। প্রশ্ন করেছিলেন আকাশ থেকে নেমে আসা বিমানারোহী দেবতাকে। এজরা লিখেছেন, 'আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, যে প্রতীকের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার অংশমাত্র সম্পর্কে আমি কহিতে পারি। কিন্তু তোমার জীবনের কথা যাহা জানিতে চাহিতেছ, তাহা কহিতে পারি না। আমি নিজেই তাহা জানি না।' (দানিকেনের 'আমার পৃথিবী,' অনুঃ অজিত দত্ত)। দেবতাদের এই অজ্ঞতা ও অসহায়তা মাঝে মাঝেই কি তাঁদের চাতুরী ও বুদ্ধিমত্তাকে আমাদের চোখে ম্লান করে দেয় না? মানুষের সঙ্গে এঁদের তফাত করা কি অসম্ভব হয়ে পড়ে না? একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, এইসব দেবতার চেয়ে বরং আমাদের ধর্ম ব্যাখ্যাতারাই ছিলেন অপেক্ষাকৃত চালাক। কেননা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁরাই ঐ উজ্জ্বল পুরুষদের অলৌকিক দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ও শ্লোক রচয়িতা ঋষিদের পরস্পরবিরোধী উক্তি প্রায়ই আসল দেবস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে।

দেহধারী দেবতারা বরং অনেক বেশি স্পষ্ট বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে। দানিকেন খুঁটে খুঁটে উদ্ধার করেছেন সেই আশ্চর্য অস্তিত্ব। ওল্ড টেস্টামেন্টের

পর্বে পর্বে আছে দেবতাদের সঙ্গে বিচিত্র সাক্ষাৎপ্রসঙ্গে বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতিবেদন। 'গড'কে 'দি লর্ড' বলা হয়েছে সেখানে। 'দি লর্ড অলমাইটি' গম্ভীর আদেশ ও আইন জারি করেছেন মোজেস প্রমুখ পয়গম্বরের মাধ্যমে। পয়গম্বর ব্যতীত সাধারণ মানুষকে দেবতা তাঁর পার্বত্য অধিষ্ঠানের কাছাকাছি ঘেঁষতে দেননি। ত্রাসসৃষ্টিকারী নিষ্ঠুর কণ্ঠে আদেশ দিয়েছেন, সাধারণে যেন দেব-আবাস-ভূমির কাছে না ঘেঁষে, কেননা তাহলে তারা ধ্বংস হবে।

দেবতা মোজেসকে আদেশ দিয়েছিলেন নৈবেদ্য প্রদানের। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দেবতার খাদ্যের যোগান দিতে হ'ত প্রাচীন পিতামহদের। সংগ্রহ করে আনতে হ'ত সোনা ও দামী খনিজ পদার্থ, মূল্যবান পাথর এবং মেষশাবক নৈবেদ্য। সাজিয়ে দিতে হ'ত বলির ব্যবস্থা। মেষ-মাংস রন্ধনের আদেশও দেওয়া হয়েছে। লর্ড গডের সুদীর্ঘ তালিকানুসারে যে বাজার সাজিয়ে আনতে হ'ত তার বৈচিত্র্য বস্তুত চমকপ্রদ। একজন ফ্যারাও বা একজন রোমক সম্রাটই শুধু দাবি করতে পারেন ঐসব দুষ্প্রাপ্য উপহারগুলি। দানিকেন সেই তালিকার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওল্ড টেস্টামেন্টের 'এক্সোডাস' পর্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন অভিনিষ্ক্রমণ (Exodus) পর্বের পঁচিশ অধ্যায়ের দুই থেকে সাত অনুচ্ছেদ অংশের। পাঠক নিজে যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন তবে অবাক হয়ে সেই 'লর্ড অলমাইটি গডে'র দর্শন পাবেন, যাঁকে একজন ত্রাসসৃষ্টিকারী বৈদেশিক বণিকের মতই মনে হবে তাঁর। ওল্ড টেস্টামেন্ট অজ্ঞাত এক রহস্যময় সময়ের রোমাঞ্চকর উপন্যাস। রোমাঞ্চ উপন্যাসের চেয়েও যা রোমহর্ষক।

যাঁরা বাইবেল পড়েছেন, তাঁরা জানেন, ইস্রায়েলীদের (কেবলমাত্র সেই বিশিষ্ট মানবযূথের!) ঈশ্বর লর্ড গড কতবড় লম্বা নৈবেদ্যের ফিরিস্তি দিয়েছিলেন তাঁর মর্ত্যবাসী স্তাবকবৃন্দকে। হুকুম ছিল, লর্ড গডের জন্য সেই লম্বা ফর্দ মিলিয়ে নৈবেদ্য পাঠাতে হবে।

একটা তালিকা শুনুন :

সদাপ্রভু বা লর্ড গড সশরীরে উপস্থিত হয়ে মোশিকে আদেশ করেছেন, 'কেহ রিক্ত হস্তে আমার নিকট উপস্থিত না হউক' (যাত্রা পুস্তক বা অভিনিষ্ক্রমণ পর্ব, ২৩/১৫)। 'তুমি আমার বলির রক্ত তাড়িযুক্ত দ্রব্যের সহিত নিবেদন করিও না, আর আমার উৎসব সম্পর্কীয় মেদ প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি না থাকুক। তোমার ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও। ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না।' (ঐ, ২৩/৮৮-১৯)। এই অদ্ভুত ঈশ্বর, যিনি রকেটে চেপে সিনয় পর্বতে অবতরণ-

কালে পর্বতকে ধূম্রাচ্ছন্ন করতেন ও ইস্রাইলীরা তাঁর সেই 'প্রতাপ বা রকেটে'র অগ্ন্যুদ্গিরণ লক্ষ্য করে সভয়ে প্রকম্পিত হতেন, সেই সদাপ্রভু মোশিকে বা মোজেসকে তাঁর পার্বত্য দুর্গে (রকেটটিও সিনয় পর্বতেই থাকত) আহ্বান করে আদেশ দেন ঃ 'তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে আমার নিমিত্ত উপহার সংগ্রহ করিতে বল' : উপহারের তালিকা ঃ 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল ; এবং নীল বেগুনী, লাল, এবং সাদা মসীনা সূত্র, ও ছাগলোম : ও রক্তিকৃত মেষচর্ম, তহশ চর্ম ও শিটীম কাষ্ঠ ; দীপার্থ তৈল এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধী ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য ; এবং এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদক মণি প্রভৃতি খচনীয় প্রস্তর। আব তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্মধাম নির্মাণ করুক......।' (অভিনিষ্ক্রমণ, ২৫/১-৯, ধর্মপুস্তক বা বাইবেল, ভারতের বাইবেল সোসাইটি, বাঙ্গালোর প্রকাশনা)। কৌতূহলী পাঠক অভিনিষ্ক্রমণ বা যাত্রাপুস্তকের ২৫ বল্লীর ১০ থেকে ৪০ এবং ২৬-- ২৯ বল্লীর ৩৭তম আজ্ঞা পর্যন্ত পড়লে ইঞ্জিনীয়র ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনা, ভোজনবিলাসী ঈশ্বরের ফিরিস্তি এবং নিয়ামক ঈশ্বরের নিয়মের আড়ম্বরের পরিচয় পাবেন। অবাক হয়ে তখন তাঁকে অবশ্যই ভাবতে হবে, বস্তুত ঐ নভশ্চর সদাপ্রভুটি সেদিন কী অদ্ভুত ধূর্ততার সঙ্গে নিজের নিশ্চিন্ত আরামপ্রদ বসবাসের আয়োজন করেছিলেন। অবশ্য বিনিময়ে তিনিও ইস্রায়েল সন্তানদের দিয়েছিলেন মিশ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি। বলা বাহুল্য, এ সব কাজ কোনো প্রকৃত ঈশ্বরের দ্বারা সম্ভব ছিল না নিশ্চয়।

সদাপ্রভুর দৈনিক নৈবেদ্যের দাবি ছিল এই রকম ঃ 'প্রতিদিন এক বর্ষীয় দুইটি মেষশাবক, একটি···প্রাতঃকালে···ও অন্যটি সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে। আর প্রথম মেষশাবকের সহিত উখলিতে প্রস্তুত হন পাত্রের চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত [ঐফা] পাত্রের দশমাংশ ময়দা, এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস দিবে।' সন্ধ্যায়ও অনুরূপভাবে ভক্ষ্য ও পেয় সদাপ্রভুকে দিবে কেননা তিনি 'সদাপ্রভু, তাহাদের (একমাত্র ইস্রায়েলীদের) ঈশ্বর, আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিশর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি ; আমিই সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর।' (ঐ, ২৯/৩৮—৪৬)। এভাবেই সদাপ্রভু পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে রকেটের ধূম্রজালের অন্তরাল থেকে একগোষ্ঠী পৃথ্বীমানবের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কড়া আদেশ ছিল, ইস্রায়েলীরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারকে ঈশ্বরের আসনে বসালেই তিনি তাঁদের নির্বংশ করবেন। অর্থাৎ বহিরাগত নভশ্চর প্রধানের প্রাধান্য প্রভুত্ব অস্বীকারের চরম ফল হল মহাবিনষ্টি। বাইবেলীয় নগর সদোম ও ঘোমরা ধ্বংসের কারণও ছিল সদাপ্রভুর প্রাধান্যকে অস্বীকার করার ফল।

মহাভারত পুরাণে মানুষ ও দেবতাদের আদানপ্রদানের বহু কাহিনী আছে। এমন কাহিনী ছড়ানো আছে পৃথিবীর অন্যান্য পুরাণেও। ভূমি ও সম্পদের অধিকার নিয়ে প্রাগিতিহাসের আমলে বহু দেবাসুর যুদ্ধ ঘটে গেছে। ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও তেমনি এক দেবাসুর যুদ্ধ। সে যুদ্ধ পূর্বাপর পরিচালিত হয়েছিল দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারে। সুতরাং ইতিহাসপুরুষ দেবতাদের কীর্তি কাহিনী বুঝতে হলে ব্রহ্মাতত্ত্ব থেকেই তা শুরু করতে হয়।

হিরণ্য অণ্ডের সন্ধানে

লামা ধর্মের দুটি পবিত্র পুঁথি তাঞ্জুর ও কাঞ্জুরের ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল ১৮৮৩ সালে।[১] এই দুই পুঁথিতে বর্ণিত আছে মহাবিশ্বে বিভিন্ন স্বর্গে অবস্থিত দেবতাদের বিভিন্ন আবাসের পরিচিতি। বাঙলা ভাষার পাঠক দানিকেনের 'প্রমাণ' গ্রন্থে পাবেন তার কতকাংশের সারাংশ অনুবাদ। প্রত্যেক স্বর্গের ও তাদের শাসক দেবতার পুরো ইতিহাস-কথার পর প্রতিটি রাজ্যের এক একটি দিবারাত্রের সঙ্গে আমাদের পার্থিব বছরের তুলনামূলক গণনা দেওয়া আছে সেখানে। যেমন. একটি স্বর্গের চব্বিশ ঘণ্টা সমান এই পৃথিবীর পঞ্চাশটি বছর। এমন একটি স্বর্গীয় দেবতার পরমায়ু পাঁচশ বছর হলে আমাদের গ্রহে তার পরিমাপ হবে নব্বই লক্ষ বছর।

শুনতে ভারি আশ্চর্য বোধ হয় বটে, তবে যখন মনে পড়ে. পার্থিব বছরের সঙ্গে আমাদের ব্রহ্মার কল্পান্তের হিসেব, তখন বুঝি তিব্বতী পুরাণে ও ভারতীয় পুরাণে কোনো একটি সত্যকেই ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।[২] কেননা, দু জায়গার পুরাণকার তো আর গোল টেবিল বৈঠকে বসে পুরাণ রচনা করেননি। মায়া পুরাণেও আছে এমনি সব অদ্ভুত হিসেব-পত্র।

প্রাচীন পুরাণগুলি ঘাঁটলে আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ স্তূপীকৃত হতে থাকে। গ্রহান্তর থেকে আগত উড়ন্ত হিরণ্য অণ্ডকে খুঁজে পাই বিশ্বের বিভিন্ন পুরাকথায়। সে সব বিবরণ খুঁজে দিয়েছেন দানিকেন। অজিত দত্তের অনুবাদ থেকে এখানে তারই কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

তিব্বতী পুরাণে অণ্ডের কথা বারম্বার উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে. "একটি শ্বেত আলোকের উৎপত্তি ঘটলো অসৃষ্ট জীব হতে এবং সেই আলোকের মূল বস্তু হতে নির্গত হল নিখুঁত একটি অণ্ড। রূপ তার অত্যুজ্জ্বল। আপাদ-মস্তক সে বস্তু উত্তম। তার ডানা ছিল না. কিন্তু উড়তে পারতো। তার মুখ. চোখ. মস্তক কিছুই ছিল না, তবু তার ভিতর হতে ধ্বনিত হত একটি কণ্ঠস্বর। পাঁচ মাস পরে অপূর্ব সে অণ্ড ভেঙে গেল.···তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক পুরুষ।"···

আফ্রিকার বান্টুদের আদিম কিংবদন্তীও বলে অণ্ডাকার ডিম্ব দর্শনের কাহিনী :

১. **Annales du Musee Guimet. Extraits du Kandjour—Leon Feer Paris 1883.**

২. পুরাণ মতে আমাদের চারশো বত্রিশ কোটি বছর সমান ব্রহ্মার এক অহোরাত্র।

"একটি বিশেষ অণ্ডে ভরা ছিল বিদ্যুৎ। আদি জননী তাহা হইতে গ্রহণ করিল অগ্নি। অণ্ড ভাঙিয়া গেল, তাহার অর্ধাংশ দুইটি হইতে দৃশ্যমান বস্তুসমূহ বাহির হইল। উপরিস্থ অর্ধাংশ বৃক্ষ-ছত্রাকে পরিণত হইয়া আকাশে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। নিম্নস্থ অর্ধাংশ রহিয়া গেল পৃথিবীতে।"[৩]

"চৈনিক লিয়াও সভ্যতার কিংবদন্তী বলে, আমাদের পৃথিবী নির্গত হয়েছে একটি ডিমের ভেতর থেকে। প্রথম মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল একটি লালচে সোনালি ডিমের ভেতরে শুয়ে।"

মিসরীয় মৃতের পুঁথিতেও আছে মহাজাগতিক অণ্ডের কথা।

ইণ্ডিয়রা বুঝেছিলেন, মহাকাশ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎগর্ভ বস্তুটি একটি মহাজাগতিক অণ্ড মাত্র নয়, তা বিশেষ একটি উড়ন্ত কক্ষ-স্বরূপ যার মাঝে শুয়ে শুয়ে এসেছিলেন মহাবিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিপতি এক আশ্চর্য পুরুষ। তিনিই উদ্ভাসিত করলেন পৃথ্বীলোকের পুরাপিতাদের। তাই তারা বস্তুটিকে শুধু ডিম্বাকার বস্তু বলেই ক্ষান্ত হল না: পূর্ব কলম্বিয়ার পার্বত্য চিবচারা বললেন, জ্ঞানালোক লুকিয়ে ছিল 'সদনসদৃশ' কী এক আধারে। সেই আধার থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল আলো। সে আলোকে প্রকাশিত হয়েছিল সর্ব চরাচর।[৪]

পুরাণ মতে ভারতীয় ব্রহ্মারও আবির্ভাব ঘটেছিল সুবর্ণ অণ্ডের ঢাকা খুলে। "মহা-প্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হলো। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তারপর অণ্ড দুইভাগে বিভক্ত হলে এক ভাগ আকাশে, অন্য ভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়।" (পৌরাণিক অভিধান)।

ব্রহ্মাকে পুরুষ বা মহাপুরুষই বলা হয়েছে। তিনি অবশ্যই পরমেশ্বর নন। জল সৃষ্টি করে সেই জলে বীজ নিক্ষেপণের বয়ানটি ব্রহ্মানুরাগীর

---

৩. এই ভাবেই তো বহির্বিশ্বের মহাকাশ ভেলার পক্ষে সমুদ্রবক্ষে বিশেষ মহাকাশ ক্যাপস্যুল নামিয়ে দিয়ে মূল যানে ফিরে যাওয়া সম্ভব। এসব প্রক্রিয়া আজ আর অলৌকিক অচিন্তনীয় ব্যাপার নয়; বিশ শতকের মহাকাশচারী মানব-ব্রহ্মারা মহাকাশে ভাসমান স্পেশ স্টেশনেও পৃথিবী থেকে বারম্বার গমনাগমন করেছেন। চাঁদে নেমেছেন।

৪. ইণ্ডীয় কিংবদন্তীটি সংকলন করেন স্প্যানিস লেখক, পেদ্রো সাইমন। তাঁর বইটির নাম, **Noticias Historiales de las conquistas de Tierra en las Indias Occidentales/Bogota, 1890.**

বর্ণনা। পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে, পুরাণকাররা সৃষ্টিতত্ত্ব যথার্থ বর্ণনা করেননি। প্রাপ্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যেমন সেই মহাকাশচারী দেবতাদের কাছে শুনেছেন ও বুঝেছেন সেই ভাবেই বিবৃত করে গেছেন। তাই আগু পিছুতে প্রচুর গোলমাল।

সমুদ্রবক্ষে পতিত অণ্ডাকার যানটিসহ সমুদ্রকেও ব্রহ্মাসৃষ্ট বলা হল। যদিও দেখতে পাই, ব্রহ্মা বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদের পরবর্তী। এমন এক পুরুষকে সমুদ্রের স্রষ্টা বলা হলেই তা আমাদের পক্ষে মাথা নেড়ে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

মহাভারত বললেন: "প্রথমত এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্যনীয়, অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।"—(কালীপ্রসন্ন)।

লক্ষণীয়, সর্বত্রই সৃষ্টিকর্তার জন্মরহস্য বর্ণনা করেছেন পৃথ্বীলোকের প্রাচীন পিতারাই। ব্রহ্মার আবির্ভাব কথা গেয়েছেন ভারত-ইতিবৃত্তকার বেদব্যাস। তারপর তা মুখে মুখে কালের প্রবাহ পথে বহে চলেছে অবশেষে শ্লোকবদ্ধ আকারে পুঁথিজাত হওয়া পর্যন্ত। নিরাকার ঈশ্বরের মহিমার সঙ্গে বিমিশ্রিত করে অণ্ডাকার যান-বাহিত এক সাকার পুরুষকে মহিমান্বিত করা হয়েছে বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা রূপে। অথচ এই ব্রহ্মার আগমনের আগেই পৃথীলোকে ঘটে গেছে অনেক কাণ্ড। লেখা হয়ে গেছে বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ। সেখানে ব্রহ্মা নামক কোনো স্রষ্টার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। শুধু বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে এক মহান পুরুষের কাল্পনিক চিত্র আঁকা হয়েছে বর্ণভেদ ব্যবস্থাকে ধর্মীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে পুরুষ ব্রহ্মা নন। তাছাড়া পণ্ডিতরা বলেন, ঐ দশম মণ্ডলটি পরবর্তীকালে বেদ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তা অর্বাচীন।

মূলে গোলমাল থাকলে তৎ-সম্পর্কিত কথা-কাহিনীও ভুলে-ভরা হতে বাধ্য। তাই দেখা যায়, মহাভারতের শ্লোকে ও পুরাণের বর্ণনায় সামঞ্জস্যহীন বক্তব্যের ছড়াছড়ি। ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বানাতে বসে শ্লোককারগণ গুচ্ছের সৃষ্টিছাড়া কথা একের পর এক গেঁথে গেছেন।

বলা হল, সম্বৎসরকাল ডিম্বমধ্যে অবস্থিতির ও ভূখণ্ড সান্নিহিত সমুদ্রবক্ষে ভাসমান অবস্থার পর সেই সুবর্ণ অণ্ডের ঢাকা খুলে ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন। এরপর তিনি যেভাবে সৃষ্টি-সম্পন্ন করেছিলেন বলে মহাভারতীয় বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে প্রাণীজন্ম সম্পর্কিত বিবর্তনতত্ত্বের বিস্তর গরমিল ধরা পড়ে।

মহাভারত বলেন, স্থানু, মনু, আদিত্য অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমার প্রমুখের সৃষ্টির পর "অনেকানেক বিদ্বান মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশদিক, সংবৎসর, ঋতু মাস পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশ সঞ্জাত হইল।"—(কালীপ্রসন্ন)।

আগে মানুষ, তারপর আকাশ বায়ু পৃথিবী : এ আবার কেমন কথা ? এই অকল্পনীয় ব্যাপার যে যাদুকর ব্রহ্মাই ঘটিয়ে থাকুন না কেন, তিনি যে খুব বিশ্বাস-যোগ্য কাজ করেছেন, একথা স্বীকার করা যায় না। বায়ুহীন, পৃথিবীহীন এক মহাশূন্যে মনু-আদি মানবগণ এবং 'ত্রয়োত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতাগণও সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন' বলে মানতে হলে মহাভারতের রাজর্ষি মহর্ষিদের শরীরযন্ত্রের কলকব্জাগুলিকে অতিলৌকিক বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু মনু ও অশ্বিনীকুমারদের তেমনভাবে ভাবার উপায় নেই। তাঁরা এই পৃথিবীতে বসেই গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। মনু-সংহিতা ও দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদের 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' গ্রন্থের কথা জানা যায়। অশ্বিনীকুমারদের বহু কীর্তিকাহিনী বহু পুরাকথায় লিখিত আছে, যে কীর্তিগুলি সাদা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, কোনোটা সার্জারি, কোনোটা ইঞ্জিনীয়ারি।

তাহলে ব্রহ্মার প্রকৃত স্বরূপ কি? কে সেই ব্রহ্মা যাঁর পরিকল্পনামাফিক মহাভারতের আদি থেকে অন্তে বর্ণিত সকল ঘটনাই নিপুণভাবে আবর্তিত হয়েছে? তাঁরই পরিকল্পনানুসারে দেবগণ হিমালয় স্বর্গ থেকে আর্যাবর্তে অবতরণ করে মর্ত্যবাসিনী মানবকন্যাদের গর্ভে দেবসন্তান উৎপন্ন করেছেন প্রাকৃতিক প্রজনন প্রক্রিয়ার দ্বারা। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন দেবপুত্র পাণ্ডবরা। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র দুর্যোধনের কল্পিত দোষ বর্ণনা করে তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য ব্রহ্মানুচর ব্রাহ্মণরা বিদুরের নেতৃত্বে চাপ সৃষ্টি করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের ওপর। পাশাখেলায় স্বেচ্ছায় সর্বস্ব খুইয়ে সামরিক প্রস্তুতির জন্য দেবতাদের আশ্রিত পাণ্ডবগণ বনবাস গ্রহণ করেছেন,—সে-ও ঐ ব্রহ্মারই রাজনৈতিক পরিকল্পনার ফল-শ্রুতি। জরাসন্ধ, শিশুপাল ও কীচক হত্যা হয়েছে ব্রহ্মার নির্দেশে। ব্রহ্মা-কূটনীতির ফলেই পাণ্ডবরা তাঁদের মিত্রশক্তি হিসাবে লাভ করেছেন দ্রুপদ ও বিরাট রাজাকে। ব্রহ্মার নিখুঁত রাজনীতিই শেষ পর্যন্ত পাণ্ডব বিজয়ের কারণ হয়েছে। এসবই ঘটনা। সে ঘটাবলীই ভারতের প্রাগিতিহাস। আর সেই প্রাগিতিহাসই মহাভারত। ধর্মাধর্মের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি বিচার করে মহাভারতের রাজনৈতিক পটভূমি এবং হিমালয় ও আর্যাবর্তের মানচিত্র চোখের সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারতের পাঠ গ্রহণ করলে এই বিস্ময়কর ইতিহাসই উন্মোচিত হয়ে পড়ে এবং ব্রহ্মাকে তাঁর সঠিক স্বরূপে ধরতে পারা যায়। (কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ)।

যদি ব্রহ্মাজী না হন স্বয়ং লোকস্রষ্টা, যদি তিনিও ইতিহাসেরই এক মহান পুরুষ, তবে তাঁর সেই আলোকিত আবির্ভাবের অন্যতর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি ?

পৃথিবীর পুরাকথাগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, অপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার নয়, সুবর্ণ অণ্ড থেকে ব্রহ্মার ঘটেছিল "তিমির বিদার অভ্যুদয়"। দেবতাদের তিনি আমদানি করেছিলেন ভারতবর্ষে। হিমালয়ের বদ্রীনাথ চৌখাম্বা অঞ্চল জুড়ে গড়ে তুলেছিলেন এক শক্তসমর্থ সংরক্ষিত দেবায়তন। যুদ্ধবাজ দেবতারা হিমালয়ের স্তরে স্তরে শিবির স্থাপন করেছেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু, শঙ্কর এক একটি শিবিরের আধিপত্য গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মাজী হয়েছেন সেই দেববাহিনীর সর্বোচ্চ মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী।

যে ব্রহ্মা মনুকে সৃষ্টি করলেন বলে বলা হয়েছে, মনুসংহিতায় সেই ব্রহ্মারই জন্মবৃত্তান্ত কথিত আছে। ব্রহ্মাসৃষ্ট মনু ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর স্রষ্টার জন্ম-রহস্য। এ ঘটনা যেমন রহস্যময় তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। মনু বললেন :

"এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার তমসাচ্ছন্ন ছিল। তাহা ছিল জ্ঞানের অতীত এবং তাহা কোন লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় ছিল না বা অন্য রূপে জানিবারও যোগ্য ছিল না, যেন সর্বতোভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিল। তৎপরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান মহাভূত প্রভৃতিকে প্রকাশিত করিয়া অপ্রতিহততেজাঃ এবং প্রলয়াবস্থার বিনাশকরূপে প্রাদর্ভূত হইলেন।"—৫ (অনু : হংসনারায়ণ)

মহাভরত ও মনুসংহিতা একই কথা বলছেন। বলছেন, ব্রহ্মার আবির্ভাবের

---

৫. আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥

একই বৃত্তান্ত আছে হরিবংশে। বিষ্ণুপুরাণও বলেন, 'হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাগ্‌বভূব।' সেখানে আবার বিষ্ণুই ব্রহ্মা। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে বলা হয়েছে, আদিতে সবই ছিল জল। তারপর পৃথিবী (অর্থাৎ মৃত্তিকা ?) নির্মিত হল।—সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা। ছান্দোগ্য উপনিষদে আদিত্য ব্রহ্মের কথা আছে। উপনিষদের অন্তমধ্যস্থ সূর্যব্রহ্ম পুরাণে হয়েছেন ব্রহ্মা। নিরাকার হয়েছেন সগুণ সাকার। এই ব্রহ্মাই আবার স্তুত হয়েছেন যজ্ঞের ঋত্বিক হিসেবে। অর্থাৎ বেদ উপনিষদের ব্রহ্ম ক্রমবিবর্তিত হয়ে পুরাণ মহাভারতের ব্রহ্মায় পরিণত হলেন, যাঁকে আর্য পুরোহিতরা যজ্ঞে বা সভায় পৌরোহিত্য করার জন্য সশরীরে আগমনের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। আর ব্রহ্মা যে হিমালয়ের ব্রহ্ম-লোক থেকে সমতলে নেমে পুষ্করে স্নান ও যজ্ঞ করে গেছেন তারও উল্লেখ আছে মহাভারতে।

পূর্বে এই বিশ্বসংসার অজ্ঞতার অন্ধকারে আবৃত ছিল। সেই ঘন তমসা বিদূরিত করলেন হিরণ্যঅণ্ড-সম্ভূত ব্রহ্মা।

কি বুঝব এ-র থেকে? স্পষ্টতই কি বলা হয়নি পৃথিবীর প্রাচীন পিতারা ছিলেন অজ্ঞান? মহাকাশ থেকে অণ্ডাকার উড়ন্ত বস্তু এসে পৃথিবীতে অবতরণ করল সে সময়। আর সেই 'সজনসদৃশ আধার' থেকে যিনি ও যাঁরা বেরিয়ে এলেন, মানুষকে তাঁরা দান করলেন জ্ঞাতব্য সকল বিষয়। অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত হল। যে অণ্ডগুলি পৃথ্বীপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়, অবতরণমাত্রই তার ঢাকনা খুলে মহাকাশচারী জ্ঞানময় পুরুষ আবির্ভূত হননি। তিনি অচেনা অজানা এই গোলকের মানুষজনের প্রতিক্রিয়া আগে সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর অণ্ডস্থিত যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে, যে ভাবে উপগ্রহগুলি আজ মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর পর্যবেক্ষণের সংবাদ প্রেরণ করে চলেছে আমাদের বিজ্ঞানী ব্রহ্মাদের। তারপর যখন তিনি বুঝলেন, এই গোলকবাসীর দ্বারা তাঁর আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই, তখনই তিনি বেরিয়ে এলেন মহাকাশযানের ঢাকনা খুলে। তাই দেখি, পাঁচ মাস মহাকাশযানে সুরক্ষিত অবস্থানের পর আত্মপ্রকাশ করেন তিব্বতী ব্রহ্মা, ভারতীয় ব্রহ্মার সমুদ্রবক্ষে অবস্থিতির কাল পরিমাণ হল এক বছর।

ব্রহ্মার সমৃদ্ধ প্রজ্ঞার সংস্পর্শে এসে সেকালের বিস্মিত মানুষ জেনেছিলেন বস্তুবিশ্ব ও নক্ষত্রলোক সম্পর্কে এমন অজানা সব জ্ঞানগর্ভ কথা, যার ফলে তাঁদের মনে হয়েছিল, অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হল। ব্রহ্মার প্রজ্ঞা নবজ্ঞান-পিপাসু গোপালক আর্যদের মনে এমন এক সমীহার সৃষ্টি করল, যার ফলে তাঁদের মনে হল, তৎপূর্ববর্তী পৃথিবী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তার জল স্থল নদী পর্বতাদি সম্পর্কে জানা ছিল না কিছুই, ব্রহ্মার জ্ঞানচক্ষুই যেন সৃষ্টি করল সেই সমুদয় পৃথ্বীলোক ও বিশ্বভুবন। ব্রহ্মা-ভক্তরা বললেন, ব্রহ্মাই সকল লোকস্রষ্টা। তিনিই সর্বলোককে অণ্ডময় করেছেন। সৃষ্টি করেছেন ঋষি ও দেবতাদেরও।

তৎকালে মহর্ষি ও দেবর্ষি ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা হিমালয়ের ব্রহ্মলোক ও দেবলোক থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে এসে সাধারণ মানুষকে তাঁদের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে বিস্মিত ও মন্ত্র-মুগ্ধ করতেন। অতএব তাঁরাও ব্রহ্মারই সৃষ্টি। তাছাড়া প্রাকৃতিক উপায়ে ও কৃত্রিম পরিব্যাপ্তির মাধ্যমে দেবতারা যে দেবসন্তান উৎপন্ন করেছিলেন তাও জানা যায় প্রাচীন পুঁথি থেকে। সুতরাং মনু-আদি মানুষেরা সেই অর্থে দেবমন্ত্রী ব্রহ্মার সৃষ্টি একথা বললেও ব্রহ্মা পরমেশ্বরের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে

গেলেন এমন কথা ভাবার অবকাশ নেই। পরবর্তী তথ্যাদির আলোকে ব্রহ্মার লৌকিক চরিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত ও মনু-বচনের সারমর্মও উপলব্ধ হবে।

ব্রহ্মা নিজের জ্ঞানময় তেজদীপ্তি দ্বারা প্রলয় অর্থাৎ স্থাণুবৎ অজ্ঞতাকে বিদূরিত করলেন।

পৌরাণিক দেবতাদের প্রত্যেকেরই ক্রমবিবর্তন আছে। আছে উত্থান পতন বিবাহ প্রজনন এবং জন্ম-মৃত্যু জাগতিক ক্রিয়াকর্মের লিখিত ইতিহাস। সেটাই তাঁদের পরমেশ্বরত্ব লাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। ব্রহ্মার সঙ্গে দেবগুরু মানুষ বৃহস্পতিকে অভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদ ও সংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণে। পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয়। জগদীশ্বরের উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ বা জাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণের ইতিহাস নেই। যিনি সকল মহাবিশ্বের মূলীভূত শক্তির উৎস, তাঁর সৃষ্টি ও মৃত্যুর ইতিহাস কে লিখবে? সকল শাস্ত্রই বলে, দেবতাদেরও তা জানা নেই। ব্রহ্মার বিবাহ হয়েছিল গন্ধর্ব মতে। ছিল পুত্র কন্যা। কামুকতার জন্য তিনি অভিশপ্ত হন। ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে দেবতাদের মধ্যে উত্থান-পতনের লড়াই শুরু হলে বুদ্ধিজীবী ব্রহ্মাকে বিষ্ণু ও শঙ্করের কাছে পরাজিতও হতে হয়েছে। ব্রহ্মা পূজা সীমিত হয়ে গেছে এবং ইন্দ্রের মত ব্রহ্মাও বহু দেবায়তনধন্য ভারতে ক্রমশ কোণ-ঠাসা হয়ে পড়েছেন।[৬]

---

৬. পদ্ম, স্কন্দ, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা তাঁর কামুকতার জন্য এবং প্রতিপত্তিশালী শিবের ক্রোধে অভিশপ্ত হন। পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতে সেই হেতু তাঁর পূজাপাঠও নিষিদ্ধ হয়। সীমিত কয়েকটি অঞ্চলে মাত্র ব্রহ্মাপূজা চালু আছে। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিচার করে মন্তব্য করেছেন, "ব্রহ্মার প্রতি এই অভিশাপগুলি থেকে মনে হয় যে পুরাণ রচনা-কালেই ব্রহ্মা তাঁর প্রতিপত্তি হারিয়েছেন; বিষ্ণু ও শিব ব্রহ্মাকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে উঠেছেন।" বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন পুরাণে এক এক দেবতাকে পরমেশ্বরের আসনে বসানোর চেষ্টায় অন্যান্য দেবতার মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়েছে; পৌরাণিক যুগে ভূখণ্ডের দখলদাবি নিয়ে বিভিন্ন দেবতা ও তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে এই রকম বিরোধ লড়াই চলতে থাকে। এই ইতিহাসও বলে, দেবতারা স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন ও ভূমির অধিকারিত্ব নিয়ে পরস্পরে বিবাদ করেছেন। এমন দেবতাকে পরমেশ্বর পদবাচ্য করার মত মারাত্মক ভুল আর কী হতে পারে? পরমেশ্বর বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা অধিপতি। তাঁকে কোনো ভাগীদার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বিবাদ করে অধিকার রক্ষা করতে হয় না।

যাঁর ঈশ্বর ক্ষুদ্রতা ও নীচতার দ্বারা আবদ্ধ, তিনি ক্ষুদ্রতর দেবদেউলে আটক থাকুন, আমরা আমাদের মহান ঈশ্বরের আসনটি সেই ক্ষুদ্রতার দ্বারা অপবিত্র হতে দিতে নারাজ!

ব্রহ্মার জন্মও আছে মৃত্যুও আছে। এমন ব্রহ্মাকে সর্বলোকেশ্বর বলে মান্য করা যায় না। বুঝতে হয়, তিনি কোনও এক পর্বতময় শীত-প্রধান গ্রহলোক থেকে তাঁর অণ্ডাকৃতি উড়ন্ত যানে চেপে এই গ্রহে এসে অবতরণ করেন এবং সুমেরু অঞ্চলে বসে ভিনগ্রহী দেবতা ও গোপালক আর্যদের বুদ্ধিদাতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁর সেই ব্রহ্মলোকটির মানচিত্রে চোখ রাখার সুযোগ পাব।

মেরুশৃঙ্গে ব্রহ্মলোক

ব্রহ্মা যে একম্ অদ্বিতীয় সত্তা নন, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে তারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাবিশ্বে জীবলোক শুধু এই পৃথিবীই না, বিভিন্ন সৌরমণ্ডলে আছে অসংখ্য জীবলোক এবং সেখানে বুদ্ধিমান মনুষ্যোপম জীবের অস্তিত্বও অবশ্যই সম্ভব।[১]

ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে সৌতি মুনি বলেছেন,—

"একটি ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মা অধিকার।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে সংখ্যা নাহি তার॥"

*　　　　*　　　　*

"ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
দেবতা মনুষ্য আদি আছে সর্ব জীব॥"

এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের হদিশ করা দেবতাদেরও দুঃসাধ্য ঃ—

"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাহা কে বর্ণিতে পারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নারে বর্ণিবারে॥"

চমৎকৃত হই এসব কথায়। পণ্ডিতরা বহু জীবলোকের বিবরণকে হয়ত কাল্পনিক ভেবে সাধারণ্যে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন স্বীকার করেননি। অথবা বহু জীবলোকের অস্তিত্বের ধারণা বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির অভাবে আলোচ্য হয়নি। বলা হ'ল, ইন্দ্রাদি দেবতার মত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও এক নন, বহু। তাঁদের প্রত্যেককেই এক পরমেশ্বর বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক এক দেবতার অনুগামীরা ভিন্ন ভিন্ন পুরাগ্রন্থ রচনা করে গেছেন। বিভিন্ন পুরাণই তার প্রমাণ। অথচ

১। অনেক বিজ্ঞানীই একমত যে পৃথিবীর বাইরেও অন্য সৌরজগতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।...প্রথম প্রাণের সৃষ্টিকাল থেকে মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০০ কোটি বছর, যার মধ্যে মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে আজ থেকে মাত্র ১০ লক্ষ বছর আগে। কাজেই পৃথিবীর মত পরিবেশযুক্ত কোন গ্রহে প্রাণের বিবর্তন হয়তো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। আবার কোথাও কোথাও এই বিবর্তনের ধারা হয়ত মানুষকেও ছাড়িয়ে গেছে, সেখানে মানুষের চেয়েও উন্নততর প্রাণী বসবাস করছে এবং আমাদের চেয়েও এক উন্নত সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। "এই মহাবিশ্বে মানুষই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী—এই দম্ভের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।"—মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ / শঙ্কর চক্রবর্তী / মনীষা।

আমাদের পণ্ডিতরা ঈশ্বরের মহিমা ব্রহ্মাদি দেবতার স্বরূপে লীন করে দিয়েছেন পুরাণের উদ্দেশ্যমূলক ছেলে-ভুলোনো গল্পগাছাগুলিকে সাধারণের কাছে বার বার সাড়ম্বরে হাজির করে।

ভারতবর্ষের শীর্ষস্থ হিমালয়ের নিসর্গশোভামণ্ডিত সুমেরু এলাকায় যে এক ব্রহ্মা এসে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আমাদের বলা হয়েছে, সেটিই স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক। সেখানেই অধিষ্ঠিত আছেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা। অর্থাৎ সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তাঁর দেবায়তন গড়েছিলেন গাড়ওয়াল হিমালয়ে,–এই কৌতুককর কথাকেই হাজার হাজার বছর আমরা পরম সত্যরূপে মান্য করে আসছি, একবারও প্রশ্ন করিনি, মহাবিশ্বের স্রষ্টা কি ঐ ইলাবৃতবর্ষের সামান্য ভৌগোলিক সীমানাটুকুকে মহাবিশ্বের বহির্ভূত করে গড়েছিলেন? ঈশ্বর শুধু লীলা করে গেলেন কতিপয় আর্য ব্রাহ্মণের (অর্থাৎ ব্রহ্মানুচর ভারতবাসীর) সঙ্গে? এত পুণ্য ভারতের উত্তরাখণ্ডেই কি কেবলমাত্র সঞ্চিত হয়ে ছিল? হবেও বা, আর সেজন্যই হয়ত ভারত আজও উত্তরাখণ্ডেই তার প্রধানমন্ত্রী সন্ধান করে বেড়ায়।

পুরাণ কথক সৌতি বলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ কে বর্ণনা করতে পারে? ব্রহ্মস্বরূপও কেবলমাত্র ধ্যানের দ্বারাই লভ্য। আর যদি সুমেরু শিখর-নিবাসী ব্রহ্মের তত্ত্ব জানতে চাও, তবে বলি,

ভারতীয় ব্রহ্মার অধিকারে ছিল একটিমাত্র ব্রহ্মাণ্ড। তিনি নিজেই তা স্বজন-বর্গের বাসোপযোগী করে নিয়েছিলেন ঃ

"অবশেষে চতুর্মুখ অনন্তের তরে
সুমেরুর মূলদেশে পুরী সৃষ্টি করে॥"[২]

সেই পুরীই ব্রহ্মার অধিকার-ভুক্ত শিবির। ইন্দ্র বিষ্ণু শঙ্কর প্রমুখের শিবির ইলাবৃতবর্ষের অন্যান্য স্থানে। নিষধ পর্বতের (শিবালিক পর্বতশ্রেণী?) উত্তরভাগ থেকে নীল পর্বত (বদ্রীনাথের উত্তরে নীলকান্ত পর্বত?) পর্যন্ত সমগ্র পর্বতমালাই গন্ধমাদন পর্বতের মর্যাদা লাভ করেছে পুরাণে। গন্ধমাদন পর্বতেই বিভিন্ন দেবতার দেবদেউল।

গঙ্গোত্রী হিমবাহকে ঘিরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আবাস। ব্রহ্মাতীর্থ উত্তরে, গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণে সুমেরু ও আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে কেদারনাথ বা মহেশ্বর তীর্থ। আর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বিষ্ণু স্থান বদরিকাশ্রম' বা বদ্রীনাথ। এই সমগ্র এলাকাটি এখন উত্তরকাশী ও চমোলী গাড়বালের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিতীর্থ পথ বিধৌত করে প্রবাহিত হয়েছে স্বর্গীয় নদী ভাগীরথী, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। প্রত্যেক স্বর্নদীর পার্শ্বপর্বত ধরে বর্তমানে যাত্রীবাহী মোটরযান চলাচল করে।

২। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

শুধু সৌতির ওপর প্রমাণের দায়িত্ব একার্যিকভাবে চাপিয়ে না দিয়ে ছুটে গেলাম পরাশর মুনির কাছেও। মৈত্রেয় শুনছিলেন মুনিসত্তমের মুখে জম্বুদীপের বর্ণনা, গ্রথিত হচ্ছিল বিষ্ণুপুরাণম্। পরাশরও একই কথা বললেন। বললেন, হে মৈত্রেয়, মেরু পর্বতের ওপরেই আছে ব্রহ্মার বিখ্যাত ব্রহ্মপুরী। আর চারদিকে চার কোণে আছে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুরীসকল (বা শিবির)। বললেন,

"চতুর্দশসহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরি মৈত্রেয় ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি।[২৯]
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ।
• ইন্দ্রাদিলোকপালানাংপ্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ॥" [৩০] (বিষ্ণু পু)

পরাশর আরও খোলসা করে বুঝিয়ে দিলেন স্বর্গ নামক সুমেরু পার্বত্য প্রদেশটির স্থানমাহাত্ম্য। বললেন,

"আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্—গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ॥[৩১] (বিষ্ণু পু)

অর্থাৎ মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে অবস্থিত। এই মেরুই ব্রহ্মপুরী।

হিমালয়ের পার্বত্যলোকে শুধু যে দেবতারাই বাস করেন, তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে একই ভূখণ্ডে বসবাস করেন গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দানবরাও ঃ

"গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষাংসি তথা দৈতেয় দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীষ্বহর্নিশম্ ॥"[৪১]

আমি তখন মনে মনে প্রশ্ন করছি উদ্বিগ্নভাবে, প্রভু! ইহাই কি স্বর্গলোক? শুনলাম, পরাশর বলছেন, "এই সকল স্থান ভৌম অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়",—ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্মিণামালয়া মুনে।" (বিষ্ণুপুরাণম্)।

বুক থেকে পাথর নেমে গেল। প্রণাম করলাম পরাশরকে। মনে মনে বললাম, হে মুনিবর! জ্ঞানীরা ভূস্বর্গের কথা বলেছেন বটে, তবে সাধারণের মনে তা এমন গোলমেলেভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভূস্বর্গকেই আমরা স্বর্গ ভেবে ভূর্লোকবাসী ব্রহ্মাকেই বিশ্বস্রষ্টা বানিয়ে বসে আছি। পরমেশ্বর এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে হাঁসফাঁস করছেন। যাঁর আদি অন্ত দুর্জ্ঞেয় তাঁকে ব্রহ্মা বানিয়ে সেই ব্রহ্মার অনুশাসন চাতুর্বর্ণ ভেদাভেদকে আমরা ঈশ্বরের নিয়ম বলে মান্য করে আসছি। আমাদের তা মানতে বাধ্য করছেন আমাদের গুরুকুল ভৌম ঈশ্বরেরা। ফলত মানুষের ওপর মানুষের নির্মম অত্যাচার ও শোষণ

পৌরাণিক আমল থেকে এই ভারতবর্ষকে গ্রাস করে ফেলেছে। আপনি যে আলোক দান করলেন তা চরাচরকে আলোকিত করুক!

যে যুগে ভৌম স্বর্গে যাতায়াত সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য, আমরা সে যুগ অতিক্রম করে এসেছি বহুকাল। গত তিন হাজার বছর ধরে স্বর্গীয় নদী অলকানন্দা-মন্দাকিনী, সরস্বতী-সরযূ, জাহ্নবী যমুনার নীলজলধারা ব্রহ্মপুরার কোলে কোলে উপল আকীর্ণ পার্বত্য পথ বেয়ে সমানে নেমে এসেছে আর্যাবর্তের মর্ত্য-ধামে। বিগলিত করুণারসধারায় অভিষিক্ত হয়েছি আমরা ভারতবাসী। গড়ে উঠেছে শহর নগর ধাম। পাল্টে গেছে ভারতের মানচিত্রে প্রাচীন জনপদগুলির নাম ও আকৃতি। ইতিহাসের পটপরিবর্তনের আস্তর পড়েছে যুগে যুগে। দেবতা ও ঋষিগণের অধিকৃত গন্ধমাদন পর্বতের বুকে ছুটে চলছে এখন যন্ত্রযান। দেবতার অধিকৃত স্বর্গধামে সমতলের মানুষ অবাধে যাচ্ছেন প্যাকেজ ট্যুরে।

পার্বত্য প্রদেশের এই উন্নতির ফলে ভৌম স্বর্গের মর্যাদা কমেছে না বেড়েছে সে হিসেব অবশ্য আমার নয়। আমি পাণ্ডুপুত্রদের মত, পৌরাণিক ঋষিদের মত অবাধে স্বর্গলোক ভ্রমণে যেতে পারছি এটাই মস্ত সৌভাগ্য। সেকালে জন্মালে দেবতাদের কালেকটর সাহেব যমরাজের আফিস থেকে ছাড়পত্র না পেলে গন্ধমাদন পর্বতের দ্বারদেশ থেকে বিমুখ হয়েই ফিরে আসতে হত। দেবতাদের সংরক্ষিত শিবিরের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারতাম না। যমরাজকে দেয় টোল ট্যাকস গুণে দিলেও যে-কারো পক্ষে ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ঘটত না। আজ সেই দেবতার সংরক্ষিত এলাকা নেই। সোজা অলকাপুরী পর্যন্ত সরকারকে টোল ট্যাকস আদায় দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায়। তবে মনিভদ্রপুরম বা মানা গ্রামের পর ভারতের সীমান্ত রক্ষীরা আর অগ্রসর হতে দেন না। শিবলোক মানসসরোবর ও কৈলাসে যাওয়াও আজ আর আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু অলকানন্দার কোলে কোলে নারায়ণ পর্বত অবধি অবাধে বেড়িয়ে এসেছি। আজও সে জায়গা পবিত্র স্বর্গভূমি বলেই পাণ্ডাদের দ্বারা কীর্তিত। অলকানন্দার পুলের এপারে স্বর্গ (নারায়ণ পর্বত), অন্যপারে মর্ত্য (নরপর্বত)।

অনেকেই আক্ষেপ করে লেখেন, ব্রহ্মপুরা হিমালয় গতায়াতের পক্ষে সুগম হওয়ায় পৌরাণিক মহিমময় পবিত্র ভাবটি অনেককাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। তাঁদের এই 'দাও ফিরে সে অরণ্য' মনোভাবটি দাদামশায়ের যুগ আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই হিমালয়ে খুঁজতে যান তাঁরা সেই সব অদ্ভুতকর্মা ঋষিদের, শত চেষ্টাতেও আজ যাঁদের দর্শন মেলা অসম্ভব। যখন ব্রহ্মপুরায় ছিল ব্রহ্মাদি দেবতাদের বসবাস, তখন সেই দেবতাদের কাছ থেকে দেবানুচর মর্ত্যবাসীরা পেতেন বৈজ্ঞানিক শক্তি,

যা ছিল নিছকই বিজ্ঞানের প্রসাদ। আজ যখন সেই দেবতারা নেই, তখন অনন্তকাল হিমালয়ে 'বায়ু ভক্ষণ' করে তপস্যা করলেও সে শক্তি লাভের আশা নেই। সুতরাং কোথায় পাব আমরা তাঁদের ? এখন সমুদ্র শোষণক্ষম একজন অগস্ত্যমুনি, ইচ্ছামাত্র ভস্মকারী একজন ভয়াবহ দুর্বাসাকে বরং অদ্ভুতকর্মা বিজ্ঞানী-দের মধ্যেই সন্ধান করা ভালো, তাতে বৃথাশ্রমের কারণ ঘটবে না।

হিমালয় এতই বিশাল ও মহান যে হিমালয় দর্শনে এমনিতেই শত জন্মের পুণ্য লাভ হয়। সেখানে গেলে সত্যিই এক স্বর্গীয় অনুভূতি আপনিই জাগে। সেই অনুভূতি তো ঈশ্বরেরই আসঙ্গানুভূতি। তার সঙ্গে পথশ্রমের সম্পর্ক কি ? শরীরকে কষ্ট দিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে ঐ ঈশ্বরানুভূতি তো আপনি উবে যাবে। একমাত্র সুস্থ মনই ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারে। যার শরীর অসুস্থ, যিনি পথে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুচিন্তায় কাতর, তাঁর নিজেকে ফেলে ঈশ্বরানুভূতি লাভের সুযোগ কোথায় ? তাই হিমালয়ের প্রতিটি প্রদেশ যাত্রীদের কাছে দিন দিন বরং আরও সুগম হয়েই উঠুক। হিমালয়ের কোলে একটি যন্ত্রযানের তুচ্ছ অস্তিত্ব যে কত নগণ্য, যিনি মুনি-না-খুঁজে হিমালয় দর্শন করেন একান্ত মনে তিনিই তা জানেন। আমি তাই সমবেদনা অনুভব করি বরং মহাভারতীয় যুগের পুরুষ বেদব্যাসপুত্র ধৃতরাষ্ট্র-ভ্রাতা পর্বতবাসী রাজচ্যুত পাণ্ডুর জন্য, যিনি বদ্রীনাথের দোরগোড়ায় গিয়েও সেদিন দেবতাদের সেই সংরক্ষিত অঞ্চলটি দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যাওয়া হয়নি তাঁর সুমেরুর পাদদেশেও। মহাভারতের ইতিবৃত্তে সেকথা আজও ইতিহাস হয়ে আছে।

রাজ্যত্যাগী পাণ্ডু তাঁর দুই রাণী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন শতশৃঙ্গ পর্বতে। পুরাণ মতে এই পর্বতও গন্ধমাদন পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত। জনশ্রুতি পাণ্ডুর সেই পর্বতবাসের স্মৃতি ধরে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। জনশ্রুতিতে এই পার্বত্য আবাস নির্দিষ্ট হয়েছে বদ্রীনাথের পথে পাণ্ডুকেশ্বরে। পাণ্ডুরাজার নামেই জনস্থান।

যোশীমঠ (৬২০০' ফুট) থেকে ঘুরে ঘুরে নামতে হয় বিষ্ণু প্রয়াগে (৪৫০০) ৷ দেবতা বিষ্ণুর নামে প্রয়াগ তীর্থ। অলকাপুরী থেকে কলস্বনা অলকানন্দা নেমে এসে এখানে মিলিত হয়েছেন ধৌলি গঙ্গার সঙ্গে। আদিগন্ত মহামৌন হিমালয় এই স্তব্ধ নির্জন প্রদেশের গাম্ভীর্যকে সহস্র গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর অনবরত ঝরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর শিথিল শৈলরাজি। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে গোবিন্দঘাট, বিশেষত গোবিন্দঘাট পার্বত্য ধসের কবলিত। প্রায়ই পথ অবরোধ করে গড়িয়ে পরে এখানে ছোটবড় মাঝারি শিলারাশি।

গোবিন্দঘাট থেকে মাইল দুয়েক আরও চড়াই উঠলে পাণ্ডুরাজার পার্বত্য

নিবাস পাণ্ডুকেশ্বর। অপূর্ব নিসর্গশোভামণ্ডিত পাণ্ডুকেশ্বর অলকানন্দার কোলে এখন বেশ একটি সমৃদ্ধ জনপদ! উচ্চতা ৬৪৫০ ফুট। এখান থেকে বদ্রীনাথ মাত্র পনের মাইল। এই পনের মাইলের হিসেব অবশ্য মোটর রাস্তা ধরে। পায়ে হাঁটা সোজা পথ আরও আছে এবং সেযুগে কেমন পথ ছিল আমরা আজ তা বলতে পারি না। পাহাড় রোজ ভাঙে, গড়ে ওঠে সেখানে নতুন পথরেখা। পাণ্ডুকেশ্বরের পর মোটর পথে হনুমান চটি। ভীমসেন স্বর্গধামে যাওয়ার পথে এখানেই দেবলোক পাহারাদার হনুমানের দ্বারা নিবারিত হন। এই হনুমানও যে নিছক মানুষই ছিলেন, সেসব তথ্যও পরে ও পরবর্তী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। হনুমান চটির পর স্বর্গীয় শোভাময়ী সুন্দরী বদ্রীনাথ ধাম, নর ও নারায়ণ পর্বত।

ব্রহ্মলোকের কথা থামিয়ে পাণ্ডুকেশ্বরের যৎসামান্য একটু পরিচয় দিয়ে রাখলাম স্থানটি সম্বন্ধে পাঠকের পরিচিতি ঘটানোর জন্য। গাড়ওয়াল হিমালয় অর্থাৎ ব্রহ্মপুরার পথে পথে রামায়ণ মহাভারতের যুগস্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে। পাণ্ডুকেশ্বর সেই স্মৃতিধন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে শিখা-উপবীতধারী ব্রহ্মাবাদী আর্য ব্রাহ্মণদের পাণ্ডুরাজা ব্রহ্মার সভায় যেতে দেখেছিলেন। এখানেই জন্ম হয় পঞ্চপাণ্ডবের। মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময় দ্রৌপদীর পতন হয় পাণ্ডুকেশ্বরে। মহাভারত পুরাণের 'শতশৃঙ্গ' জনশ্রুতিতে পাণ্ডুকেশ্বর হিসেবেই চিহ্নিত। পুরাণও লিখিত জনশ্রুতি। জনশ্রুতির মূল্য একেবারে অনৈতিহাসিক নয়। মহাভারতে প্রাপ্ত বিবরণের সঙ্গে জনশ্রুতি মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, পৌরাণিক আমলের নামের সঙ্গে বর্তমান নামের তফাত ঘটলেও জনশ্রুতির মাধ্যমেই পথপরিচয় সঠিক মিলে যায়।

শতশৃঙ্গ পর্বতে অবস্থানকালে একদিন পাণ্ডু দেখলেন, মুনিরা শোভাযাত্রা করে চলেছেন। কৌতূহলী রাজা এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে জানতে চাইলেন, "মহাশয়গণ! কোথায় গমন করিতেছেন?"

উত্তরে শোভাযাত্রীরা বললেন, "সেইদিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সভাপতিত্বে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের একটি বিরাট সম্মেলন হইবে।" তাঁরা সেই সভায় যাচ্ছেন ঃ

"সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে মহাত্মনাম্।
দেবনাঞ্চ ঋষিনাঞ্চ পিতৃনাঞ্চ মহাত্মনাম্" ॥[৩]

আর্থৎ মহাভারত জানালেন, ব্রহ্মার সভা- বসে হিমালয়ে। যিনি সর্বলোকস্রষ্টা তিনি সভা বসান একটি পার্থিব ভূখণ্ডে। সর্বলোকেশ্বরের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা

৩। মহাভারতম্ / আদিপর্ব / পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনূদিত।

কি সম্ভব ? না, একথা সেই মহাভারতের আমলেও যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই ব্রহ্মার সভার কথা শুনেও বুদ্ধিমান রাজা পাণ্ডু বিস্মিত হননি। তিনি জানতেন, ব্রহ্মা নামক এক দেহধারী পুরুষ আছেন যিনি প্রায়ই এমন সভা সমিতি করেন এবং মনুষ্যরা পায়ে হেঁটে সে সভায় ব্রহ্মার মন্ত্রণা শ্রবণ করে আসেন। তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নন। তাই এমন একটা সংবাদে পাণ্ডুকে কিছুমাত্র বিস্মিত হতে দেখা গেল না। বরং ব্রহ্মার সভায় যাওয়ার জন্য তিনিও আবেদন জানালেন মুনিদের কাছে। কিন্তু মুনিরা রাজাকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন না। হয়ত তাঁদের সে ক্ষমতাও ছিল না। দেবতার সংরক্ষিত শিবিরে তখন একমাত্র দেবদলভুক্ত চিহ্নিত মুনিরা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশাধিকার পেতেন না। পাণ্ডবরা দেব-অভিসন্ধি-পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্বর্গবাসী অর্জুনের সন্ধানে যখন এই পাণ্ডুকেশ্বরের ওপরে হনুমান চটি পর্যন্ত এসে পড়েছিলেন তখন দেবতারা তাঁদেরও সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, আর অগ্রসর হয়ো না, ফিরে যাও। পথে বাধা দিয়েছিলেন দেবরক্ষীরা।

এই সাবধানতার কারণ ছিল রাজনৈতিক। সুরবিরোধী অসুরদের দ্বারা ভৌম স্বর্গ তখন বারবারই আক্রান্ত হত। সমতলের মানুষকে সেজন্যই বিশ্বাস করতেন না এই পৃথিবীতে আগন্তুক দেবসম্প্রদায়। কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন তাঁরা শিবিরাগুলের চারদিকে।

পাণ্ডুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এসব কারণেই সম্ভব ছিল না। পাণ্ডু সমতলের রাজ্যচ্যুত ক্ষত্রিয় রাজা। মুনিরা তাঁকে স্তোকবাক্যে নিরস্ত করে বললেন, ব্রহ্মার সভা অত্যন্ত দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সুকুমারাঙ্গী সুখলালিতা রাজপত্নীদের নিয়ে পাণ্ডু যাবেন কি করে! বড় কষ্ট চড়াই ভাঙতে। পথ দুরতিক্রম্য। বললেন,

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদঙ্মুখাঃ।
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহুন্ বয়ম্ ॥
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্বাপ্সরাসাং তথা ॥
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ।
মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরাম্ ॥
সন্তি নিত্যাহিমা দেশা নির্বিক্ষ মৃগপক্ষিণঃ।
সন্তি কেচিন্মহাবর্ষা দুর্গাঃ কেচিদ্দুরাসদাং ॥[৪]

বললেন, আমরা পর্বতের উত্তর দিকে গিয়ে দেখেছি, সেখানে বহু রম্য প্রদেশ

৪। ঐ।

আছে। আছে দেব গন্ধর্ব অপ্সরাদের ক্রীড়াভূমি। সেখানেই কুবেরোদ্যান। আছে অনেক মহানদী এবং গিরিগহ্বর। বেশ কিছু দুর্গও চোখে পড়ে। আবার এমন কিছু অঞ্চল আছে যেখানে সর্বদাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। গাছপালা মৃগপক্ষি কিছুই চোখে পড়ে না। সেখানে অধিক বর্ষাপাতে পার্বত্য এলাকা অতি দুর্গম হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মলোকের এই ছবিও যে নিতান্তই পার্থিব হিমবৎ পার্বত্য এলাকার বর্ণনা তাতে আর সন্দেহ কি। দেবশিবিরে সুরম্য গৃহ এবং দুর্গ যে ছিল এ তো সব পুরাণেই উল্লিখিত আছে। অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্যগীতে সোমপায়ী গন্ধর্ব যক্ষরা সর্বদাই সুখভোগে ব্যস্ত থাকতেন। হিমালয়ের মত নদনদীর প্রাচুর্য জগতে আর কোথায়ই বা আছে। আছে সেখানে সুউচ্চ বৃক্ষ, নয়নলোভন পুষ্পিত উদ্যান। আছে নন্দন কানন এবং পাহাড়ের আকেঁ বাঁকে বিচিত্রবরণ অজস্র পথপুষ্প। বার হাজার ফুটের ওপরে মৃগপক্ষি দেখা না যাওয়ারই কথা। বৃক্ষের সংখ্যা হ্রাস পায়। বদ্রীনাথ অঞ্চলে সুবিস্তীর্ণ বৃক্ষহীন উপত্যকা বর্তমান। আর দশ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত বদ্রীনাথ ও বার হাজার ফুটে সুমেরু ক্রোড়লালিত কেদারনাথ তো নিত্যহিমা অঞ্চল বটেই। বর্ষায় পার্বত্য পথ যে সর্বত্রই ভয়াবহ ও দুর্গম একথা মুনিরা না বললেও পাণ্ডুর তা অজ্ঞাত ছিল না। যাই হোক, মুনিরা আরও একটি খবর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কোথাও কোথাও বা অনেকানেক বিমান দৃষ্টিগোচর হয়। বললেন,

"বিমান শত সংবাধাং গীতস্বন নিনাদিতাম্।"

এই বিমান বলতে বিমান পোত নাকি দেব আবাস, কি বোঝায়, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু আমরা পরে দেখব, অমরাবতীতে (বদ্রীনাথ অঞ্চলে) গিয়ে অর্জুন বস্তুত বিমান পোতই দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, ব্রহ্মলোকে বৈমানিকরা বিশেষ ব্যস্ত। প্রায়ই দেববিমান ওঠানামা করছে।

মহাভারত বলেছেন, পাণ্ডু শতশৃঙ্গ পর্বতে তপস্যা করছিলেন শাপমুক্তির জন্য।

প্রশ্ন, কিসের তপস্যা করছিলেন রাজা ? ঈশ্বরের ? যদি ঈশ্বরের তপস্যাই করবেন তবে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে পার্বত্য পথ ভেঙে একবারটি দর্শন করে আসার অমন সহজ সুযোগ কেবলমাত্র মুনিদের কথায় তিনি পরিত্যাগ করলেন কেন ? যাঁর জন্য তপস্যা তাঁকে যদি কয়েকটা চড়াই ভেঙে চট করে একবার চাক্ষুষ করে আসা যায় এবং শোনা যায় সেই ঈশ্বরের বক্তৃতা, তবে জীবন থাকতে সে সুযোগ তপস্যারত কোন্ বীরপুরুষই বা হেলায় ত্যাগ করেন ?

পাণ্ডু যে মুনিবচনে নিরস্ত হলেন, সামান্য কয়েকটি পর্বত ভাঙার আর

চেষ্টাও করলেন না এতে বেশ বোঝা গেল পাণ্ডু জানতেন, পৌরাণিক সেই দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর নন, তিনি অপার্থিব কোনো দেহধারী বুদ্ধিমান ভি. আই. পি। তাঁর দর্শনলাভে বঞ্চিত হলেও বিনানুমতিতে হাঁটাপথে তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস প্রদর্শন করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। ব্রহ্মার সভায় রীতিমত মেম্বার ডেলিগেট কার্ড আছে। ঈশ্বরের এমন কোনো পার্থিব সভাও নেই, বাছাই করা কয়েকজন মুনির পক্ষে পার্বত্য পথ ভেঙে তাঁর বক্তৃতা শুনে আসাও সম্ভব নয়। সুতরাং পাণ্ডু বিফল মনোরথে স্বনিবাসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ব্রহ্মার এবম্বিধ পরিচয় পাওয়ার পরেও যিনি বলবেন, বক্তৃতাকারী সেই সভাপতিই বিশ্বভুবনের স্রষ্টা জগদীশ্বর, তাঁর সঙ্গে তর্কে বসব না ; সাবধানে তফাত রচনা করে সরে দাঁড়াব। আমার তর্কে কাজ কি। পুরাণ মহাভারত যেমন বলেছেন, আমি যথাযথ তাই-ই পাঠকের সামনে তুলে ধরছি। তিনিই বিচার করুন। বলুন, সভাপতি ব্রহ্মাই জগদীশ্বর কি না ?

তাছাড়া যদি শুধু ব্রহ্মাই হতেন এক ও অদ্বিতীয় জগদীশ্বর তবু বা ভাবা যেত, তাই তো। কিন্তু সেই এক জগদীশ্বরের গদী দখলের জন্য যখন দেখি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে ভীষণ মারামারি কাটাকাটি কাড়াকাড়ি হয়ে গেছে সে যুগে, তখন ঐ দেবতাদের ঈশ্বরস্বরূপও ভাবতে পারি না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রত্যেকেই দাবি করেছেন তিনিই একমাত্র জগদীশ্বর। তার পরেও আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। ঈশ্বরের গদীতে তাঁরাও দাবিদার।

মাফ করবেন, এতগুলি ঈশ্বরের মধ্য থেকে আমার ঈশ্বরকে খুঁজে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি প্রকাশমান সর্বচরাচরে এবং তাঁর অবস্থিতি আমাদেরই মানসপদ্মে। তাঁকে সভা বা শত্রুনিধন করতে হয় না। ভক্তকে ধরে রাখার জন্য তিনি রাজনীতিও করেন না। বস্তুতপক্ষে কিছুই করেন না সেই সর্বময় কর্তা। যে চায় সে পায়। যে চায় না, তিনি তাঁকে বক্তৃতা দিয়ে আকর্ষণ করেন না।

কিন্তু ব্রহ্মা সভা করে মতলব আঁটেন রাজনৈতিক। পরিকল্পনা করেন, দেব-বিরোধী মানব সম্প্রদায়কে ধরাপৃষ্ঠ থেকে উৎখাত করে দেবসন্তান ও দেবস্তাবক পুরোহিতদের হাতে আর্যাবর্তের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দেওয়ার জন্য।

ব্রহ্মার পরিকল্পনা

এ পর্যন্ত ব্রহ্মার যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটাই সত্য, তা হল, ব্রহ্মা সর্বলোকস্রষ্টা পরমেশ্বর নন। তিনি দেহধারী এক পুরুষ। দেবতা নামক দেহধারী এক অপার্থিব মনুষ্যোপম জাতির বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী। সভা করেন সুমেরু পার্বত্য এলাকার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যেখানে পার্থিব ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যাতায়াত আছে। স্পষ্ট হয়ে উঠল আরও একটি সত্য। জানা গেল, এই ব্রহ্মার আগমন ঘটেছে আকাশ থেকে অণ্ড-সদৃশ কোনও ধাতব যানে যা ছিল বিদ্যুৎ চালিত। পক্ষহীন হলেও সেই সুবর্ণ অণ্ড উড়তে পারত। সে যান প্রথম সমুদ্র বক্ষে এসে অবতরণ করে এবং একটি দীর্ঘ বৎসরের প্রতীক্ষার পর ব্রহ্মা আবির্ভূত হ'ন সেই ধাতব যানের আবরণ উন্মোচন করে।

পৃথ্বী পুরুষদের সঙ্গে একই পার্বত্য প্রদেশে সভা করলেও ব্রহ্মাকে পৃথ্বীবাসী বুদ্ধিমানরাও সাধারণ মানুষ অপেক্ষা স্বতন্ত্র পুরুষ হিসেবেই গণ্য করতেন। তার কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ ছিল।

ব্রহ্মার গাত্রবর্ণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, তিনি ছিলেন রক্তাভ, তাঁর দেহের বর্ণ ছিল জবাকুসুমসঙ্কাশ। বলা বাহুল্য এমন রঙিন মানুষ য়ুরোপে বিশেষত জার্মানদের মধ্যে দেখা যায় বটে, তবু তাঁদের যথার্থ রক্ত বর্ণ বলা যায় না। দ্বিতীয়ত ব্রহ্মার ভাষা ছিল সংস্কৃত যার অপর নাম দেবভাষা। এই সংস্কৃত বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলির জন্মদাতৃ ভাষা হিসেবে গণ্য। সংস্কৃত ভেঙেই আমাদের ভাষাগুলি বিবর্তিত হয়েছে। তবুও একথাও সত্য যে সংস্কৃত তত্রাচ ভারতবাসীর জিহ্বায় সরগর হয়নি। সংস্কৃত থেকে শব্দ ভাণ্ডার গৃহীত হয়েছে। তার ব্যাকরণ বহুলাংশে আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণকে প্রভাবিত করেছে, তবু মনে হয়, সে ভাষা ভারতের মাটির ভাষা ছিল না। তা শুধু যে বিদেশী তাই নয়, তা ছিল একান্তভাবেই দেবজাতির ভাষা। আমরা বহু যুগের সাধনার দ্বারাও তাকে কার্যক্ষেত্রে আয়ত্ত করতে পারি নি। মহাকাশ পথে আগত দেবগণের সঙ্গে তাঁদের ভাষাও কি ভিন্নতর লোক থেকেই পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ অবস্থায় ভারত ভূখণ্ডে আনীত হয়েছিল?[১]

১. সংস্কৃত ভাষাকে ভাষাবিদ্‌রা বলেন সংস্কার সাধনের ধারায় এটি একটি সৃষ্টভাষা, যার জুড়ি নেই আর কোথাও, কিন্তু তা হলেও এভাষা বেদ-পরবর্তী। যদি ধারা হয়, এ ভাষার বাহকরা ছিলেন আর্য, তবে সেই সমৃদ্ধ আর্যদের উত্তর ভারতে অবস্থিতির কাল খুব বেশি দিনের নয়। একদল পণ্ডিত বলেন, মাত্র খৃষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে উত্তর ভারতে তাঁদের বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের

আগেই বলেছি, মহাভারতের ব্রহ্মার নাম বেদ উপনিষদ ব্রাহ্মণে নেই। সেখানে হিরণ্য গর্ভ প্রজাপতির উল্লেখ আছে। এতোদ্বারা কি এটাই বুঝতে হবে যে, মহাভারতের ব্রহ্মার আগেও হিরণ্য অণ্ডে আগত অন্যান্য পুরুষদেরও আগমন ঘটেছিল এবং তাঁরাই নিয়ে আসেন বৈদিক জ্ঞান ভাণ্ডার ? তাই কি পুরাণে মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও বেদস্তুতি করতে শোনা যায় এবং বৈদিক আচার আচরণ নিয়ে দেবতারাও তর্ক করেন ?

মহাভারতে একটি ঘটনা অন্তত অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রশ্নোৎপাদক।

পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে এক নারীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ বেদবিরোধী আচরণ, এই তর্ক তুলে রাজা দ্রুপদ সে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। দ্রুপদকে যুক্তির দ্বারা জয় করতে যখন যুধিষ্ঠিরও অক্ষম হলেন তখন সংবাদ পেয়ে হিমালয় থেকে ছুটে এলেন দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচর ও সর্বোত্তম প্রতিবেদন লেখক বেদব্যাস। তিনি বেদ বিভাগকর্তা রূপে প্রচারিত মহামানব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দ্রুপদের প্রশ্নের ও সংশয়ের উত্তরে বেদব্যাস বৈদিক যুক্তির অবতারণা করেন নি। শুধু দ্রুপদকে চোখ রাঙিয়ে বলেছিলেন, পঞ্চপাণ্ডবের অঙ্ক-শায়িনী হওয়ার জন্যই দ্রৌপদীর সৃষ্টি। সেজন্যই দেবসেনাধি-নায়ক শঙ্করের দ্বারা তিনি দ্রুপদগৃহে প্রেরিতা হয়েছেন। সুতরাং দ্রুপদ যদি শঙ্করের ইচ্ছাকে কার্যকরী না করেন তবে তার মারাত্মক ফলাফল তাঁকে ভোগ করতে হবে। শুনে দ্রুপদ হতাশ কণ্ঠে বলেছিলেন, "যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্মই হউক বা অধর্মই হউক, আমি এ বিষয়ে অপরাধী

গণনায় দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভারতে ছিলেন তারও দুহাজার বছর আগে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে। এই দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি অনুমিত হয়েছে ভারতের দক্ষিণ সমুদ্র থেকে। পণ্ডিতরা বলছেন আদি দ্রাবিড়ীয়রা আসেন ভারত মহাসাগরে নিমগ্ন লিমুরিয়া থেকে। দ্রাবিড়দের ভাষাই আদি ভারতের 'পিতৃপুরুষের ভাষা'। (আলেকজান্দার কোনদ্রাতভের 'তিন মহাসাগরের প্রহেলিকা' দ্রঃ)। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটিকে হঠাৎ-ই আমরা পেয়ে গেলাম তার চূড়ান্ত সমৃদ্ধ রূপে। এই অকস্মাৎ সমৃদ্ধির রহস্য আজও প্রশ্নের আকারে ঝুলছে আমাদের সামনে। অনেক মিসিং লিঙ্কের মত এটিও কম রহস্যময় নয়। দেবভাষা সংস্কৃত পৃথিবীর ভাষাগুলি থেকে এমন স্বাতন্ত্র্যই বা বজায় রাখল কী করে? সব ভাষাই বিবর্তিত হচ্ছে, তাই তাদের বলা হয় লিভিং ল্যাঙ্গুয়েজেস। সংস্কৃতের বিবর্তন নেই। তা প্রথমাবধিই চূড়ান্ত সমৃদ্ধ এবং বিবর্তন ও ক্রমঃসম্প্রসারণ না থাকায় আজ ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বা মৃতভাষা হিসেবে উল্লিখিত। কেন? এ ভাষাও কি বহিরাগত? এ প্রশ্নের জবাব দেবেন সেই ভাষাবিদ্‌রা যাঁরা নতুনভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতে ভালোবাসেন।

নহি।" (আদি / কালীপ্রসন্ন মহাভারত)। অর্থাৎ শঙ্কর নির্দেশিত পথও যে বেদবিরুদ্ধ, দ্রুপদের বক্তব্যে সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে। দেবশিবিরের সেনাধিনায়ক মহাদেবের ধর্মব্যাখ্যাও যথার্থ ধর্মকথা বলে বিশ্বাস করেন নি আর্যাবর্তের রাজপুরুষ দ্রুপদ। (কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ)।

পৌরাণিক যুগে বস্তুত পক্ষে বেদের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করা হয় দেবতা ও তদীয় দলভুক্ত পুরোহিত শ্রেণীর স্বার্থে।

যাই হোক, এসব দেবরাজনীতির আলোচনা এখন নয়, যথাকালে তা বিস্তারিত করা হবে। এখন আমরা ভিন্‌গ্রহী দেবতা ব্রহ্মার পরিকল্পনাটির কথা বলে মহাভারতের রাজনীতির আসরে প্রবেশ করব। কারণ মহাভারতের সব ঘটনাই ঘটেছে ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে এবং এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য দেবতারা মহাভারত কাব্যকথায় যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাতেই তাঁদের দেহধারী অপার্থিব অথচ লৌকিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে সর্বত্রই উড়ন্ত যানের সম্পর্ক থাকায় আমরা তাঁদের নভশ্চর রূপটিই স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করি। আর সেজন্যই এই দেবতাদের পৃথ্বীলোক-বাসীদের সঙ্গে তফাৎ করে দেখতে হয়। বুঝি, পৃথিবী যদি মানুষের দেশ, তো দেবতারা ভিনদেশী। আর যেহেতু পৃথিবী একটি গ্রহ, সুতরাং দেবতারা ভিন্‌গ্রহবাসী, এই পৃথিবীতে তাঁরা আসা-যাওয়া করেছেন, একবার নয়, বার বার।

ভিন্‌গ্রহী দেবতারা এইভাবে বারংবার পৃথিবীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আর সম্ভবত তাঁরা একই খেতাব ধারণ করে এসেছেন। দেবমন্ত্রী এসেছেন প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মা খেতাব নিয়ে, দেবসেনাধিনায়করা এসেছেন বিষ্ণু শঙ্কর প্রভৃতি নাম নিয়ে। তাই পুরাণ বলছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও একাধিক। আর প্রতি মনু-অন্তরে যে দেবরাজ ইন্দ্রের নব নির্বাচন হয়েছে তারও তালিকা আছে বিষ্ণু পুরাণে।[২]

---

২. অতীত সপ্ত মনুরা হলেন স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, এবং বিষ্ণুপুরাণ-কথক পরাশর মুনির আমলে সপ্তম মনু ছিলেন বৈবস্বত। প্রতি মনুর আমলে বিভিন্ন দেবতা ও ইন্দ্র এবং ইন্দ্রসভায় বিভিন্ন পুরুষ সপ্তর্ষি পদমর্যদায় ভূষিত হয়েছেন। স্বারোচিষ থেকে পাঁচজন মনুর অধিকারকালে ইন্দ্র ছিলেন যথাক্রমে, বিপশ্চিৎ, সুশান্তি, শিবি রাজা, বিভু এবং মনোজব। সপ্তম বৈবস্বত মনুর সময় ইন্দ্র ছিলেন পুরন্দর। বৈবস্বতের অধিকারকালে সপ্তর্ষিগণ আমাদের সুপরিচিত, বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ মুনি। দেবতারা ছিলেন আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ :

বিবস্বতঃ সুতো বিপ্র শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনু সংবর্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেঽন্তরে॥ ৩১

মহাভারতের আদি পর্বের (কালীপ্রসন্ন মহাভারত দ্রঃ) 'প্রাচীন রাজ্যসংস্থান' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'মনুষ্যলোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অসুরেরা* জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অসুরেরা সুরগণ (দেবতা) কর্তৃক বহুশঃ পরাজিত এবং ঐশ্বর্য ও স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। …জাত ও জায়মান অসুরের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল। ‥দানবেরা এইরূপে সসাগরা পৃথিবীব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

বর্তমান বইয়ের বিবিধ পরিচ্ছেদের আলোচনা সূত্রে আমরা ক্রমশই মহাভারতের এই রহস্যময় অনুচ্ছেদটির রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হব। এখানে তাই তর্ক প্রমাণ উল্লেখ না করে সরল ব্যাখ্যাটিই হাজির করছি।

'মনুষ্যলোকের অভ্যুদয়কালে' বলতে বোঝা যাচ্ছে, আলোচ্য সময়ের আগে যে মানুষ ভারতের সমতলে ও পর্বতে বসবাস করছিলেন তাঁরা উল্লেখযোগ্যভাবে দেবতাদের ত্রাসের কারণ হ'ন নি। দেবতারা বেশ অনায়াসেই তাঁদের আপন ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে ইচ্ছামত দেবরাজ্য বা স্বর্গরাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন*। কিন্তু আলোচ্য সময়ে মানব দলপতিগণ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন ও দেবগণের প্রাধান্য অস্বীকার করতে থাকেন। দেবতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চাতুর্বর্ণাশ্রম ও অন্যান্য অনুশাসনগুলিও তাঁরা মান্য করতেন না। দেবতাদের প্রসাদলোভী এই গ্রহের পুরোহিত সমাজের প্রতিও ভূপালগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। স্বজাতিকে ছেড়ে গ্রহান্তরবাসীদের কাছে আত্মসমর্পণ করায় দেবতাদের বরে বা সহায়তায় পুরোহিতরা বেশ শক্তি লাভ করতেন (যাকে 'সাধনায় সিদ্ধিলাভ' বলা হত)। ফলে তাঁদের সঙ্গে ভূমিজ ভূপালদের সংঘর্ষ উপস্থিত হত সাধারণ রাজনৈতিক কারণেই। দেবতাদের পক্ষে সেটাও ছিল দুঃসংবাদ। তাঁরা তাই চিন্তিত। চিন্তার কারণ, তাঁদের বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থা ও অনুশাসনের ভিত্তিস্বরূপ চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থাকে ভূমিজরা বানচাল করে দিয়েছিলেন এবং আক্রমণ করছিলেন তাঁরা দেবতা ও দেব-পক্ষীয় ভারতীয় বুদ্ধিমানদের (পুরোহিতদের)। এই অবস্থায় সুর-বিরোধী ভারতীয়

আদিত্য-বসু-রুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্র মহামুনে।
পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয় ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৩২
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোঽথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥ ৩৩

—বিষ্ণু ॥ ৩য়াংশ, ১ম অ।

*সুর মানে দেবতা আর যাঁরা দেবতাদের বিরোধী মহাভারতে তাঁরা 'অসুর' নামে অভিহিত।

ভূপালদের অসুর এবং তাঁদের অস্তিত্বকে ধরার ভারস্বরূপ বলে গণ্য করা হয়। বিশেষ বিবেচনার পর ব্রহ্মা একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন, ধরার সেই ভার হরণের জন্য। বলা বাহুল্য, পুরাণকাররা এইসব সাদামাটা ইতিহাসকে সর্বত্রই যেমন রূপকালঙ্কৃত গল্পগাছায় মুড়ে পরিবেশন করেছেন, এক্ষেত্রেও ভূভার হরণের কথাও তেমনি এক দুর্বোধ্য গল্পের আকৃতি গ্রহণ করেছে।

গল্পটিকে অতঃপর একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক ঃ—

গল্পটিতে বলা হয়েছে, ধরাতল দৈত্যভারাক্রান্ত হলে একদিন স্বয়ং বসুমতী ব্রহ্মার সভায় শরণার্থীরূপে সমাগত হলেন। লোকপালগণের সম্মুখে ব্রহ্মার আশ্রয় ভিক্ষা করলেন তিনি। শুনে ব্রহ্মা ধরিত্রীদেবীকে অভয় দান করে বললেন, "হে বসুন্ধরে! তুমি যে কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব।" (ঐ)

গল্পটিতে বলা হয়েছে বসুমতী বিপদাপন্ন। কিন্তু বসুমতীর মুখে কোনো সংলাপ নেই। প্রশ্ন জাগে, পৃথিবী কি স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে নালিশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন? এমন অসম্ভব ব্যাপার কি আদৌ সম্ভবপর ছিল?

যেহেতু ধরিত্রীর মুখে কোনো সংলাপ বসানো হয়নি, ব্রহ্মা নিজেই তাঁর আবেদনের মূল কথা ব্যক্ত করেছেন এবং যেহেতু তাঁর সভায় আলোচিত সমস্যাটি কেবলমাত্র সিন্ধুগঙ্গা-বিধৌত ভারতের উত্তরাখণ্ড বা আর্যাবর্তেরই সমস্যা, তাই সমগ্র ভূভাগ দূরে থাক, সমস্যাটি সীমিত ছিল একমাত্র উত্তরাখণ্ডেই, সে কারণ এই সভায় বর্ণিত ধরণী বলতে আমরা নিশ্চয় সসাগরা ও সপর্বতা এই নীল গ্রহটিকে বুঝব না। দ্বিতীয়তঃ, আগেই আলোচিত হয়েছে যে, সেই দেব সভাটিরও বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। সভাটি অনুষ্ঠিত হত হিমালয়ের সুমেরু পর্বতাঞ্চলে। ব্রহ্মার সভা ও স্বয়ং ব্রহ্মা যেক্ষেত্রে বাস্তব, সেখানে জড় পিণ্ডবৎ এই পৃথিবী হিমালয়শীর্ষে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হবেন, এমন অদ্ভুত প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবী বলতে আর্যাবর্তকেও বোঝায় না। আবার ব্রহ্মার অধিষ্ঠানও হিমালয়ে; অতএব, যে পৃথিবীর ওপর বসে মহাভারতকার মহাভারতকথা রচনা করেছিলেন, সেই পৃথিবীর পক্ষে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হওয়া একমাত্র শিশুবোধ রূপকেই সম্ভব।

তা হলে, অসুর ও দৈত্যের দ্বারা ধরিত্রী যে বিপদাপন্ন, একথা ব্রহ্মাকে জানালেন কে? দেবতা, না দ্বিজ, নাকি মহর্ষিগণ?

ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত সভাসদবৃন্দের মধ্যে ঐ তিন জাতের সভ্য ছাড়া গন্ধর্ব অপ্সরা এবং ধরণী, অবনী, পৃথ্বী ও বসুন্ধরা নাম্নী কোনোও এক স্ত্রীলোকের কথা বলা হয়েছে। ধরণীর মূর্তিটি খুবই অস্পষ্ট, প্রায় তিনি ছায়াবৃতা। তবে ব্রহ্মার উক্তিতে বোঝা যায়, ধরণী বসুন্ধরার ভার হরণের জন্য ব্রহ্মার কাছে আবেদন

জানিয়েছেন। অভয় দান করে ব্রহ্মা বলেছেন, অবনীমণ্ডলের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত আছেন। সুতরাং দেবতা গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণকে ধরার ভার হরণের জন্য ও অসুরদের 'অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত' অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দান করেছেন ব্রহ্মা। অংশক্রমে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ, মর্ত্যের নারী পুরুষের সঙ্গে যৌন-সংসর্গের মাধ্যমে একটি দেবানুমোদিত বংশধারা সৃষ্টি করা। প্রশ্ন হল, পৃথিবী কি স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে নালিশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ? তা যদি না হয়, তাহলে ধরণী বা অবনী কে ?

হিমালয়ে অবস্থানকারী বহিরাগত বুদ্ধিমানরা যদি হিমালয় পাদদেশস্থ ভূখণ্ডটিকে (আর্যাবর্ত) সেদিন ধরণী নামে অভিহিত করে থাকেন, তবে সেই ধরণীলোক থেকে ব্রহ্মার কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছানো সঙ্গত ব্যাপার হয়ে থাকতে পারে। বিশ্বসংস্থায় উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির বক্তব্য সেই সেই দেশের নামেই উপস্থাপিত হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অভিযোগ আনয়ন করেছেন : চীন সোভিয়েত দুনিয়াকে নয়া শোধনবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন ইত্যাদি। সেসব প্রতিবেদন পাঠে আমরা ভারত পাকিস্তান রাশিয়া চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক পৃথক কোনো শরীরধারী রূপ বুঝি না। বুঝি সেই সেই দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ আপনাপন রাষ্ট্রের বক্তব্য বিশ্বসভায় উপস্থাপিত করেছেন।

ব্রহ্মার সভায় দ্বিজগণ ও মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন। আর্য মাতব্বররা আসুরিক অত্যাচারের কথা সর্বদাই নিবেদন করে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। নালিশটা সম্ভবত তাঁরাই জানান এবং ব্রহ্মার সভায় সেই নালিশকারীদেরই (যাঁরা হিমালয় পাদদেশস্থ ভূখণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ) ধরণী নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকতে পারে। সম্মানার্থে বহুবচন যেমন, দেশ জাতি অর্থে তেমনই স্ত্রীলিঙ্গ ('বসুমতী নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া') ব্যবহৃত হয়েছে হয়ত। কিন্তু দেব সভাটিকে মনে রাখলে স্বয়ং ধরিত্রী দেবীর পক্ষে সেই সভায় উপস্থিত হওয়ার আজগুবি ব্যাপার একেবারেই কল্পনা করা যায় না।

আর্যাবর্তে দেবব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার জন্য নভশ্চর শিবিরের বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মা যে পরিকল্পনা করেছিলেন তারই প্রথম পর্যায় হল, জনবলে বলীয়ান দেববিরোধী আসুরশক্তির পাল্টা শক্তি দেবজন সৃষ্টির পরিকল্পনা। এই ব্রহ্মাসূত্র কার্যকর করার জন্য দেবতাদের শিবির প্রস্তুত হতে লাগলেন। আর্যাবর্তে দেবপুত্র এবং দেবানুরক্ত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপায় উদ্ভাবিত হল ব্রহ্মার সভায়। দেবমন্ত্রী ব্রহ্মা দেবতা ব্রাহ্মণ গন্ধর্বগণকে অংশক্রমে 'ভূতলে অবতীর্ণ' হওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ব্রহ্মার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি হ'ল, ঢের হয়েছে, সমতলবাসীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন

দ্বারা বিনিময় রাজনীতির খেলা আর নয়। এবার দেবশক্তিকে চারিয়ে দিতে হবে মর্ত্য মানবের খাসতালুকে। তাই পর্বত শীর্ষের সভায় বসে ব্রহ্মা হুকুম দিলেন, দেবগণ যাও! তোমারা পৃথ্বীপুরুষদের মধ্যেই একটি দেববংশধারা বা জেনেরেশান সৃষ্টি করো। তাদের দ্বারাই অতঃপর সমতলে দেব-উপনিবেশের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অসুরপরাক্রমের বাড়বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে দেব-আচরিত বর্ণাশ্রম ধর্মের।

ব্রহ্মার সেই পরিকল্পনানুসারে দেবতারা নেমে পড়লেন হিমালয়ের পাদদেশে। মানবীর সঙ্গে প্রাকৃতিক সহবাসের দ্বারা শুরু হল দেব বা বহিরাগতদের ঔরসজাত সন্তান সৃষ্টি। শুধু দেব-মানবী সহবাসই নয়, দেবস্তাবক ব্রাহ্মণরাও চললেন দেবানুরক্ত জেনেরেশান তৈরী করতে। উপায় যে শুধু প্রাকৃতিক সহবাস ছিল তাই নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়েও সন্তান সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। কত মুনি ঋষি যে দেবদত্ত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কতভাবে সন্ততি সৃজন করেছিলেন, তার বিস্তারিত তালিকা উপস্থাপিত করার প্রয়োজন এখানে নেই। সেসব কথা মহাভারতের পল্লবিত কাহিনীগুলির পর্বে পর্বে ছড়ানো আছে। তবে মহাভারতও মূলতঃ কুরুক্ষেত্রকেন্দ্রিক ইতিহাস হওয়ায় প্রধানত কুরুপাণ্ডব জন্মবৃত্তান্তকেই মহাভারতকার মুখ্যভাবে আলোচনা করেছেন। আমরাও সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হব। (মানবী গর্ভে দেবপুত্র সৃষ্টির কথা বাইবেলেও আছে)।

ভূ-ভার হরণের জন্য দেবতাদের প্রতি ব্রহ্মার পরামর্শ ছিল, হে দেবগণ! পৃথিবীতে (এখানে আর্যাবর্তে) আপনারা অংশক্রমে আবির্ভূত হ'ন।

বেশ দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা সন্দেহ নেই। কারণ এইভাবে একটি দেবজন গোষ্ঠী সৃষ্টিতে সময় দরকার ছিল ত্রিশ চল্লিশ বছর। দেব-ঔরসে মানবীগর্ভে দেব-পুত্রের জন্ম মুহূর্ত থেকে সেই পুত্রের পূর্ণবিকাশকাল পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে পঁচিশটা বছর তো অবশ্যই প্রয়োজন। সেকালের হিসেবে অবশ্য এ সময় যে খুবই দীর্ঘ এমন বলা যায় না। তখন মানুষের আয়ুষ্কাল হাজার বছরও ছিল। কুরুক্ষেত্রে যখন কুরু পাণ্ডবরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন তখন তাঁদের বয়স সত্তরোর্ধ। যুধিষ্ঠির ৭২, ভীম দুর্যোধন ৭১, অর্জুন ৭০ এবং নকুল ও সহদেব ৬৯। কৃষ্ণ ছিলেন যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুমাস আট দিনের ছোট। বাইবেলে আদমের বংশধারা বর্ণিত আছে। সেখানে এক এক পুরুষের জীবৎকালের মেয়াদ ছিল হাজার বছর। ন'শ বছরেও তাঁরা হয়েছেন সন্তানের পিতা। কুরু পাণ্ডবদের বয়সের অনুপাতে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বেদব্যাসের বয়সও শতাধিক। তখন কথায় কথায় বার বছর বনবাসী হতেন পুরুষেরা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য। ঐ বারটা বছর খুব বেশি সময় গণ্য হলে বনবাসেরর মেয়াদও নিশ্চয় কম করা হত। সুতরাং আমাদের পঁচিশ বছর পুরা সময়ের হিসেবে স্বল্পকালমাত্র। সে তুলনায় একালের দশশালা বিশশালা পরিকল্পনাগুলির মেয়াদই বরং বেশি।

যাই হোক, ব্রহ্মা বুঝেছিলেন, সমতলের মানুষের সঙ্গে যেকালে দেবতারা মৈত্রী স্থাপন করে হিমালয়ের দেবশিবিরকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন, সেদিন অতীত হয়েছে। সমতলবাসী মানব ভূস্বামীগণ (আর্য ভাষায়, অসুর দানব) অতঃপর শক্তিশালী ও একজোট হচ্ছেন। তাঁদের সমুচিতভাবে বুঝতে না পারলে হিমালয়ের দেবশিবির তো বিপন্নই, আর্যাবর্তে দেবানুগত রাজ্যগুলিও দেবানুশাসন টিকিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই সেখানে আদি ভূমিজদের খতম করা এবং দেবপুত্রদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়াতেই হবে সব সমস্যার সমাধান।

সুতরাং ব্রহ্মার পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়টি রূপায়ণের ভার দেওয়া হল দেবপক্ষীয় এবং দেবানুগত মর্ত্যবাসী পুরোহিতদের অন্যতম প্রধান দলপতি ঋষি দুর্বাসার ওপর। ব্রহ্মা-সূত্র কার্যকর করার জন্য হিমালয় শিবির কোপনস্বভাব মুনি দুর্বাসাকে পাঠালেন রাজা কুন্তিভোজের প্রাসাদে। যে কাজে তাঁকে পাঠানো হ'ল সে কাজ একমাত্র দুর্বাসার মত কড়া মানুষেরই সাধ্যকর্ম। নামে ঋষি হলে কী হয়, দুর্বাসা ছিলেন মুনির ছদ্মাবরণে এক নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট দলপতি। ছিল তাঁর সন্ত্রাস

সৃষ্টিকারী আর্যবাহিনী। মুনিবরের শিষ্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজার। দুর্বাসা রাগলে ভস্ম করে দিতেন বলে প্রবাদ। এই ভস্ম করার শক্তি ইনি অর্জন করেন হিমালয়ের দেব-শিবির থেকে।

যে কোন দুষ্টু কিশোর একটি সাধারণ ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্য দিয়ে খুব সরু আকারে সংহত সূর্যরশ্মি নিক্ষেপ করে কীট-পতঙ্গ দগ্ধ করতে পারে. পারে শুকনো পাতা ও কাগজে আগুন ধরিয়ে দিতে। ঐ ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি বিজ্ঞানের দান। হিমালয়স্থ বিজ্ঞানী দেবতারা ও তাঁদের এই ফ্যাসিস্ট অনুচর দুর্বাসাকে কোনো বিশেষ টর্চ দান করেছিলেন কি, (লেসর টর্চ ?) যার ব্যবহারে যে কোনো বস্তু মুহূর্তে দগ্ধ ও ভস্ম হয়ে যায় ? সম্ভবত ঐ টর্চটিই ছিল দুর্বাসার তপস্যালব্ধ শক্তি এবং রাজা প্রজা ঐ অদ্ভুত বস্তুটিকে ভয় করতেন। অবশ্য এ ভয় সকলেই করতেন না নিশ্চয়, করলে ব্রাহ্মণভীরু রাজা কুন্তিভোজের মত আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজগণও দেবদ্বিজদর্শনে সর্বত্রই পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে ফেলতেন। কিন্তু সেকালের ইতিহাস বলে. দুর্বাসাভীরু রাজার সংখ্যা আর্যাবর্তে তখন বরং মুষ্টিমেয়। শিশুপাল, জরাসন্ধ, শকুনি, দুর্যোধন কর্ণের ওপর বীরত্ব প্রদর্শনের ক্ষমতা দুর্বাসার ছিল না। দুর্বাসা দাপট প্রদর্শন করতেন তাঁদেরই ওপর যাঁরা দেব-ব্রাহ্মণ প্রতাপের কাছে আগেভাগেই মাথা নুইয়ে রেখেছিলেন। এজন্যই দুর্বাসাকে তাঁর বিক্রম প্রকাশ করতে দেখি কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, কুন্তিভোজ, রামলক্ষ্মণ এবং অসহায়া শকুন্তলার মত সহায়হীনদের ওপর। কৃষ্ণ যতবড় বীরই হোন না কেন, দেব-শিবিরের মস্তান দলপতি দুর্বাসার অত্যাচারকে তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিষ্ঠুর অত্যাচারী দুর্বাসার একবার শখ হয় কৃষ্ণজায়া রুক্মিণীকে ঘোড়ার বদলে রথে যোজনা করে সেই রথে বসে রুক্মিণীর পিঠে চাবুক চালাবেন। এবং তাঁর সেই বিকৃত সাধ কৃষ্ণের সামনেই পূরণ করে নিয়েছিলেন দুর্বাসা। ক্ষমতা পেলে দুর্জনে তার কেমন অপব্যবহার করে দুর্বাসা বোধহয় তারই এক প্রাচীন নিদর্শন।

দুর্বাসা দেবানুগৃহীত এবং দেব-ষড়যন্ত্রের এক প্রধান অংশীদারী পাণ্ডা। তাই দুর্বাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ নিগূঢ় নিশ্চয়ং ধর্মে যং তং দুর্বাসাসং বিদুঃ। অর্থাৎ ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব যিনি জানতেন তিনিই দুর্বাসা। মহাভারত ধর্ম বলতে দেবব্রাহ্মণ অনুমোদিত দেবব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার অনুকূল সেই সব কার্যকেই বোঝেন যা সুস্থ চিন্তায় পরম মানবতা-বিরোধী আচরণও হতে পারে। (এ সম্পর্কে পরে একাধিকবার আলোচনা করেছি)।

আর গূঢ়তত্ত্ব ? মহাভারত পাঠ শেষ করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, গূঢ়তত্ত্ব বলতে দেবষড়যন্ত্রের কথাই বলা হয়েছে। পয়লা ষড়যন্ত্র যেমন ভূ-ভার হরণের জন্য বা অসুরনিধনের অভিপ্রায়ে দেবপুত্র সৃষ্টি।

এই ষড়যন্ত্রের প্রথমভাগটি বাস্তবায়িত করেছিলেন দুর্বাসা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে কাজের ভার ছিল দেবানুচর বিদুরের ওপর এবং তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রহ্মার পরিকল্পনা সার্থক করে তোলার ব্যাপারে চমৎকার ভূমিকা পালন করে গেছেন দেবতাদের পরম বিশ্বস্ত ও সর্বগুণবান গুপ্তচর, মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এমন সব পাপোক্তিতে পাঠক রুষ্ট হচ্ছেন জানি. কিন্তু আমি নিরুপায়, মহাভারতেই আছে এই সব অবিশ্বাস্য তথ্য। ক্রমশ তা পাঠকের সামনে তুলে ধরব।

দেবব্রাহ্মণভীরু রাজা কুন্তিভোজের প্রাসাদটি নির্বাচিত হয়েছিল দুর্বাসার কর্মশালা হিসেবে। মুনিদের মাধ্যমে দেবশিবির খবর রাখতেন বস্তুত কার দ্বারা কাজ হবে। সম্ভবত খবর ছিল যে কাজ শুরু হতে পারে কুন্তিভোজের রাজপ্রাসাদ থেকে। রাজা কুন্তিভোজ যে দেবানুগত তা বোঝা গেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কুন্তিভোজের যোগদান ও মৃত্যুবরণে। খবর ছিল নিশ্চয় যে. কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী বুদ্ধিমতী। দেবপুত্র (রাজকুমার) তৈরীর পক্ষে রাজকুমারী কুন্তীর ক্ষেত্র বস্তুত সুনির্বাচিতই হয়েছিল। পাণ্ডব-বিজয়ের মূলে পরবর্তীকালে কুন্তীর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু পাণ্ডব জননীই ছিলেন না, ছিলেন তাঁদের একজন নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক পরামর্শদাত্রী। ষড়যন্ত্র করতেও শ্রীমতী কুন্তী যথেষ্ট পারদর্শিনী ছিলেন। বিদুরের সঙ্গে সংগোপনে তিনি দুর্যোধন শিবিরকে ঘায়েল করার জন্য কম চেষ্টা করেননি। কর্ণকেও হীনবল করতে গোপনে মহামতি কর্ণের কাছে ছুটে গেছলেন তিনি! অপমানিতা হয়েও ভেঙে পড়েননি। জানতেন তিনি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতে, পারতেন মিথ্যাকে সোচ্চারে সত্য বলে চালাতে। রাজনীতি মান-অপমান ধর্মাধর্মের তোয়াক্কা করে না ; মা ও মেয়েছেলে হলেও না। কুন্তী এমনই এক রাজনীতি-কুশলা নারীর প্রাচীনতম প্রতিমূর্তি। সুতরাং দেবপক্ষ বস্তুত জহুরীর মত কুন্তীরত্নটিকে চিনে নিতে পেরেছিলেন।

সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্বাসা যখন হঠাৎ কুন্তিভোজের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন, রাজার তখন দেহের রক্ত হিম হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। দেবানুগত রাজারা দেবশিবিরের প্রশ্রয়প্রাপ্ত দুর্বাসাকে ভয় করতেন। তাই দুর্বাসাকে তুষ্ট করার জন্য কুন্তিভোজ করজোড়ে আদেশের অপেক্ষা করেছেন। কুন্তিভোজকে ভয় দেখিয়ে দুর্বাসার পক্ষে দেবঅভিসন্ধি পূরণের জন্য ব্যবস্থা করে নিতেও বেগ পেতে হয়নি। হুকুম ছিল, দুর্বাসার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রাসাদের ব্যবস্থা করতে হবে। মুনিবর সেখানেই থাকবেন। তাঁর উদ্দেশ্য খুবই গোপনীয়। সুতরাং তাঁর প্রাসাদের কাছে যেন কুন্তিভোজের কাকপক্ষীও ভেড়বার চেষ্টা না করে! তিনি যখন ইচ্ছে যেখানে খুশি যাবেন ও যখন ইচ্ছে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করবেন। এবং

নিজের যত্ন ও শুশ্রূষার জন্য দুর্বাসা কুন্তীকেই নির্বাচন করলেন। হুকুম হল, একমাত্র সে-ই থাকবে দুর্বাসার প্রাসাদে আর একটি প্রাণীও নয়। কুন্তীকে নিয়ে দুর্বাসা কোন্ কাজটি করবেন, কুন্তিভোজের তাও জিজ্ঞাসা করার মত মনোবল ছিল না। দুর্বাসার আদেশ শুনে রাজা কাঁপতে কাঁপতে অন্তঃপুরে এসে রাজকুমারী কুন্তীকে বলেছিলেন, কুন্তী যেন ভয়ঙ্কর দুর্বাসাকে পরিচর্যা করে তুষ্ট করে। না হলেই সর্বনাশ। রাজ্যপাট সব যাবে। এবং উপদেশ দিয়ে মেয়েকে বললেন, "ব্রাহ্মণ জাতি সহজেই অতি কোপন স্বভাব···কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অসাধারণ গুণসকল তোমাতে বিদ্যমান···তোমার রূপ লাবণ্য, অলোক-সামান্য" সুতরাং বুড়োকে তুমি ঠাণ্ডা রেখো, মা! না হলে "দ্বিজশ্রেষ্ঠের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে আমার বংশ ধ্বংস হইবে .....". (বন, কালীপ্রসন্ন)।

কুন্তিভোজের রাজ্যে স্বতন্ত্র প্রাসাদে বসে কুন্তীকে নিয়ে কী করেছিলেন রাগী দুর্বাসা ?

যতটুকু জানা যায়, তাতে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দুর্বাসার উদ্দেশ্য ছিল গোপনে কুন্তীকে দেবকার্য ও দেব-উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত করে তোলা। তিনি বেশ দীর্ঘকাল ধরে কুন্তীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুললেন। কুন্তীর লেখা-পড়া ও রাজনীতি-শিক্ষা ঐ দুর্বাসার কাছেই। প্রশ্ন তাই, যে দুর্বাসা অভিসম্পাত দেওয়া ছাড়া কারও উপকার করতেন না, যিনি ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে আদায় করে বেড়াতেন দেব-ব্রাহ্মণের প্রতি দাস্যভাব ও আনুগত্য, তিনি হঠাৎ ছুটে এলেন কেন কুন্তীকে শিক্ষিতা করে তুলতে? লোকটির চরিত্রে কোথাও তো পরূপোকারের বাসনা ছিল না। এমন এক অত্যাচারী মুনি কুন্তীর প্রতি সদয় হয়ে উঠলেন কি বিনা কারণে? কেনই বা তিনি কড়া আদেশ জারি করলেন এই মর্মে যে, তাঁর প্রাসাদের ত্রিসীমানায় কেউ যেন না আসে এবং তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য কুন্তিভোজ যেন রাজগোয়েন্দাবাহিনী নিয়োগের দুঃসাহস প্রকাশ না করেন। কেন, তিনি কি এ সময় সর্বদাই দেবশিবিরের সঙ্গে গোপন হট লাইন রক্ষা করে চলছিলেন যা ছিল একান্তভাবেই টপ সিক্রেট? আমার মনে হয়, তাঁর এইসব কাজকারবারের উদ্দেশ্য বস্তুত তাই ছিল। পরে সূর্যদেব যখন কুন্তীর সঙ্গে সহবাস করতে আসেন তখন কুন্তীকে তিনি ভর্ৎসনা করে যা বলে ফেলেন, সে সব কথাতেও দুর্বাসার উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের গূঢ়তত্ত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। সূর্য বলে-ছিলেন, দুর্বাসাকে কুন্তীর শিক্ষকরূপে দেবশিবিরই নিযুক্ত করেছিলেন, এ-তত্ত্ব তিনি অবগত আছেন। সূর্যকে আহ্বান জানিয়েও যখন সূর্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে কুন্তী নারী-সুলভ ছলাকলা প্রদর্শন করে মিলন বিষয়ে তাঁর সলজ্জ আপত্তি জ্ঞাপন করছেন, ব্যস্ত সূর্যদেব তখন অধৈর্য-বশত গোপন বিষয়টি

ফাঁস করে ফেলেন। কুন্তীকে ত্বরান্বিত করার জন্য সূর্য বলেছিলেন, "সুন্দরি! মহর্ষি দুর্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎ সমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার অভিলাষ (সঙ্গমবাসনা) পূর্ণ কর। .." (আদি, কালীপ্রসন্ন)।

সূর্যের উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সমস্ত ব্যাপারটি দুর্বাসা বিশেষ গোপনে করলেও তিনি কুন্তিভোজ প্রাসাদে যা যা ক্রিয়াকাণ্ড করেছেন, হিমালয়স্থ দেবশিবির তার প্রতিটি সংবাদই রাখতেন। তাই সূর্যের উক্তি, দুর্বাসা তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎ সমস্তই অবগত আছি। এর পর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কুন্তীকে যখন নির্জন প্রাসাদে দেবকার্য সাধনের জন্য বিশেষ প্রযত্নে তৈরী করছিলেন সেই মুনিবর, তখন তিনি দেবশিবিরের সঙ্গে একটা গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে গেছেন। সেজন্যই তাঁর কড়া হুকুম ছিল, কুন্তী ব্যতীত অপর কেউ যেন তাঁর কর্মশালা (প্রাসাদের) ধারকাছে না আসে এবং রাজা যেন চেষ্টা না করেন তাঁর গতিবিধির ওপর কোনরকম গোয়েন্দা নজর রাখার।

কুন্তীকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মা সূত্রের প্রথম খেলা এভাবেই শুরু হয়েছিল।

পাকা এক বছর কুন্তীকে নিয়ে স্বতন্ত্র প্রাসাদে ছিলেন মহর্ষি দুর্বাসা। এই এক বছরে কুন্তীকে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন।

মহাদেব দেবকার্যের জন্য সামরিক কায়দায় অর্জুনের ধৈর্য কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণ করেন, দুর্বাসাও একইভাবে কুন্তীর ধৈর্য, তিতিক্ষা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেন। স্বভাব-অত্যাচারী মুনি অসম্ভব পরিশ্রম করতে বাধ্য করতেন সুখলালিতা রাজকুমারী কুন্তীকে। মুনিবরের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় সারাদিনমান অভুক্ত পৃথাকে অপেক্ষা করতে হত, আবার হয়ত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়ে যেত নিষ্ফল প্রহর গণনা করে। কেননা "ব্রাহ্মণ প্রাতঃ-কালেই আগমন করিব বলিয়া কখন সায়ংকাল, কখন বা রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত হইতেন।" হাসিমুখে কুন্তীকে সহ্য করতে হত সে অত্যাচার। ব্রাহ্মণের কোপানল উদ্রিক্ত করার মত সাহস স্বয়ং রাজা কুন্তিভোজেরও ছিল না!

কুন্তীর পরবর্তী কার্যকলাপ, বেদ বেদান্ত ও ইতিহাসের জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও ষড়যন্ত্রী ক্রিয়াকলাপ আরও ধারণা সৃষ্টি করে এই যে, দুর্বাসা তাঁকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন। এ সমস্তরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রাজমহিষী রূপে তাঁকে আমরা বার বার গূঢ় রাজনীতি করতে দেখেছি। শুনেছি তাঁর মুখে জ্ঞানগর্ভ কথা। দেখেছি সঠিক সময়ে তিনি সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্মণদের মতই স্বার্থসিদ্ধিকালে মিথ্যাচারণ করতে তাঁকে কখনো ইতস্তত করতে দেখা যায়নি। তাঁর পালক পিতার মধ্যে এ জাতীয় চারিত্রিক

দোষগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় না। দুর্বাসা ছাড়া তাঁর প্রথম জীবনে কুন্তী যে আর কারও কাছে কোনো পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, এমন সংবাদও আমাদের কাছে নেই। তাই মেনে নিতে হয় কুন্তীর শিক্ষা চূড়ান্ত উৎকর্ষতা লাভ করে এবং সম্ভবত সম্পূর্ণও হয় দুর্বাসাপ্রদত্ত শিক্ষাতেই। এই সবের পেছনে দেবাদেশই ছিল মুখ্য কারণ। আর এই ঘটনাবলী বিশেষ পরিকল্পনানুসারে ঘটতে শুরু করে ব্রহ্মা কর্তৃক দেববংশধারা সৃষ্টির প্রকল্পটি নিয়ে কাজ আরম্ভ হওয়ার পরে। দেখা গেল, শিক্ষা শেষে দুর্বাসা কুন্তীকে যে মন্ত্র অথবা যন্ত্রটি দিয়ে গেলেন সেই দানেরও উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মার পরিকল্পনাটি রূপায়িত করা অথাৎ আর্যাবর্তে এমন একটি দেব-ঔরসজাত রাজবংশের সৃষ্টি করা যা দেববিরোধী অসুর শক্তির সঙ্গে সর্বশেষ যুদ্ধে লড়াই করবে। দুর্বাসার বরদানের ফলেই জন্ম লাভ করেন পঞ্চপাণ্ডব।

শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে পৃথাকে পরীক্ষার পর সন্তুষ্ট দুর্বাসা তাঁকে সংগোপনে একটি মন্ত্র দান করেন বলে মহাভারতকার আমাদের জানিয়েছেন। মন্ত্রের উদ্দেশ্য পুত্র লাভ। সেও আবার যেমন তেমন পুত্র নয়। সে সন্তান হবে দেব-ঔরসজাত দেবপুত্র। মানবী গর্ভে দেবপুত্র? তাও কি সম্ভব?

সম্ভব তো বটেই। কেবলমাত্র কুন্তীই তো নন, দুনিয়ার সকল প্রাচীন পুরাপুঁথিতেই আছে মানবী গর্ভে দেবপুত্র উৎপন্ন হওয়ার কাহিনী। অদ্ভুত কথা এই, প্রাচীন রাজবংশ সৃষ্টি হয়েছে দেব-ঔরস থেকেই। প্রাচীন রাজারা সূর্যদেব চন্দ্রদেবদেরই বংশধর। তাঁরা দেবনির্বাচিত ক্ষমতাবান শাসক সম্প্রদায়। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পুরাপুঁথি Pyramid Text থেকে মিশরীয় রাজশক্তি সম্পর্কে যা জানা যায় তাও বলে মর্ত্যের সেই ফ্যারাও অথবা রাজারা ছিলেন স্বর্গীয় পুরুষ। তাঁরা ছিলেন 'উত্তম দেবতা' অথবা 'গুড গডস', আর দেবতারা ছিলেন, 'মহান দেবতা' কিম্বা 'গ্রেট গডস'। Veronica Ions তাঁর Egyptian Mythology গ্রন্থে লিখেছেন, In these early dynastic time (3000 B. C.) the pharaoh was divinely appointed to rule; to be the intermediary between his people and the gods. Delegated to rule by the gods, the pharaoh was soon thought to be descended from them and to partake of their divine nature" (ব্রাকেট আমার)। দেবনেতৃত্বে জমির মালিকানা নিয়ে যুদ্ধ এবং জয় পরাজয় (যাকে বলছি, দেবাসুর যুদ্ধ) ঘটে গেছে সেখানেও। আর সেই সব দেবাসুর যুদ্ধের ইতিবৃত্ত সযত্নে রক্ষিত আছে বিভিন্ন পুরাপুঁথিতে। পুরাপুঁথিগুলি সর্বত্রই মানুষের শুধু কষ্টকল্পনার ফসল নয়, মানুষ তাদের যুগ যুগ বুকে করে আগলে রেখেছিল এই কথা জানত বলেই যে, ঐ পুঁথিতে আছে তাদের উত্থানপতনের ইতিহাস। গল্প নয়, পুঁথিগুলির মধ্যে ছিল সমস্ত

রহস্যবিদ্যা, প্রকৃত জ্ঞানভাণ্ডার। কাল যত এগিয়েছে, পুঁথিবর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ নৈকট্য ততই শিথিল হয়ে গেছে। নতুন নতুন চিন্তা আঙ্গিক ও আচরণ এবং দেবতাদের অনুপস্থিতি তারপর পুঁথির বিবরণকে অপরিচিত হেঁয়ালী বলেই গণ্য করতে আরম্ভ করেছে। রাজার স্বর্গীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে পুরোহিত সম্প্রাদয়ের হাতে। পুঁথিগত ইতিবৃত্তের ওপর পুরোহিতরা নতুন করে হস্তামর্শন শুরু করেছেন, হেঁয়ালী হয়েছে ক্ষমতাবানের দ্বারা রচিত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত গল্পগাছায় বিকৃত। ক্রমাগত এইভাবে বিকৃত হতে হতে ঐতিহাসিক চরিত্রটি বেবাক পাল্টে গেছে। গবেষকরা স্বয়ং তাই বহুকাল হিমসিম খাচ্ছেন ওগুলির সঠিক পাঠোদ্ধারের জন্য। আজও চেষ্টা চলেছে। সে যুগে যে সব অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটেছিল তারই সমতুল কাজকারবার করতে যখন যেমন সক্ষম হচ্ছি আমরা, তখনই প্রাচীন হেঁয়ালী আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে। সেকালের বিমান রকেট ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র আজ আমাদেরও মুঠোয়, তাই ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, সেদিনও এগুলি ছিল, শুধুই হয়ত তা হেঁয়ালী নয়। পরীক্ষা-নলে (টেস্ট টিউবে) জীবন-ভ্রূণ সৃষ্টি করে অতি সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা সেই অত্যাশ্চর্য পুরা ঘটনার দিকে আমাদের এগিয়ে দিলেন, যে বৈজ্ঞানিক পন্থা গান্ধারীর অকালপ্রসূত মাংসখণ্ডটিকে খণ্ডিত আকারে পরীক্ষানলে রেখে শতপুত্র ও একটি কন্যা সৃষ্টিতে সফল হয়েছিল।

দুর্বাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দিয়ে গেলেন। সেই মন্ত্রের সাহায্যে কুন্তী পেলেন যে কোনো দেবতাকে সংগমার্থে আহ্বান করার সুযোগ। আমার প্রশ্ন, মানুষকে দেওয়ার মত হরেক রকম ব্যাপার থাকতে মুনিবর তাঁকে অমন একটি অদ্ভুত বর দিয়ে পিঠটান দিলেন কেন? দেবকন্যা মানবপুত্র বিবাহ করেছেন (যেমন গঙ্গা)। কুন্তীর সঙ্গে কোনো দেব জেনেরালের বিবাহও তো দিয়ে দেওয়া যেত। দেবঔরসে, পুত্রপ্রাপ্তি যদি মর্ত্যের কুমারীকে অতই মাতাল করে থাকে তবে তো দেব-মহিষী হতে পারলে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন প্রাপ্তির সুখ ভোগ করতে পারতেন। দুর্বাসা কিন্তু তাঁকে সে সব কিছুই পেতে সাহায্য করেননি। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর দেব পরিকল্পনাটিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কাজও হয়েছিল সেই রকম। মন্ত্র দিলেন, যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করার জন্য। আরও রহস্য এই যে, দুর্বাসা তাঁকে বলেছিলেন, মা হওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রতিবন্ধকতা আছে। বলা হয়েছে, পৃথার মাতৃত্বলাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক আছে জানতে পেরে দুর্বাসা তাঁকে 'আকর্ষণ শক্তিশালী' মন্ত্র দিলেন। এখানে প্রশ্ন, কুন্তী যে মা হতে অক্ষম এমন নয়: সে অক্ষমতা থেকে থাকলেও তাঁর কুমারী অবস্থায় বৃদ্ধ মুনি অথবা কুন্তী, কারো পক্ষেই তো সে খবর জানার কথা নয়। তাহলে, মা হতে তাঁর

প্রতিবন্ধকতা আছে মুনিবর তা জানেন কেমন করে ? ধ্যানে তো নয়ই, কোনো ডাক্তারী জ্ঞানেও তা জানবার কথা নয়। মা হওয়ার প্রতিবন্ধকতা বলতে বুঝি, মুনিবর আগেই জানতে পেরেছিলেন, কুন্তী এমন কোনো পুরুষের মহিষী হবেন, পিতা হতে যিনি অক্ষম।

কিন্তু তিনি সেকথাই বা কেমন করে বুঝলেন ? তিনি কি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন কুন্তী কোনো পুরুষত্বহীন রাজার মহিষী হয়েছেন ? স্বয়ং মহাদেবই দিব্যচক্ষে কিছু চাক্ষুষ করতে পারেন না যেখানে, তখন দুর্বাসা কোন্ দিব্যদৃষ্টি বলে এ তথ্য জানবেন ? কোষ্ঠী অথবা হস্তগণনা করে ? তর্কের খাতিরে যদি মানাও যায়, সে ভাবেই তিনি জেনেছিলেন, তবে কোনো সক্ষম মর্তমানব যাতে কুন্তীর সন্তানের পিতা হতে পারেন তার জন্য ব্রাহ্মণ একবারও চেষ্টা না করে সরাসরি দেবতা আহ্বানের বর দান করলেন কেন ? সে যুগে স্বামী অক্ষম হলে স্বামীর নামে (ক্ষেত্রে) দেবর ভাসুর দ্বারা সন্তান লাভের রীতি তো প্রচলিতই ছিল। মুনিবর কিন্তু সে সব কিছুই ভাবলেন না। তড়িঘড়ি একটি মন্ত্র বা যন্ত্র দিয়ে বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দান করে তাঁর দেবকার্য সাধন করলেন। ষড়যন্ত্রের মূল সূত্রই এইখানে। দেবপুত্র উৎপাদন এই সূত্র বিচারের পর আর অস্পষ্ট থাকে না। তাছাড়া, আগেই বলেছি, আমাদের অনুমানের সমর্থনে আরও যা পাওয়া যায় তা হল, সঙ্গমোন্মুখ সূর্যের সাক্ষ্য।

দুর্বাসা কুন্তীকে প্রায় জোর করেই বর দান করে গেছেন। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করতে বললেও কুন্তী যখন কোপন-স্বভাব মুনির কাছে কোন অভীষ্ট বর-লাভের জন্য প্রার্থনা জানাতে (সম্ভবত) সাহস পাচ্ছিলেন না, তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দুর্বাসা বললেন ঃ 'তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ করিতে **অনভিলাষিণী** হইলেও আমি তোমাকে **দেবগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত** এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা অকামই হউন বা সকামই হউন, মন্ত্র প্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্তী হইবেন।' মহাভারতকার আরও জানিয়েছেন, 'অনিন্দিতা কুন্তী দ্বিজবরকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না।' (বন কালী, সাক্ষরতা)।

কথায় বলে, গরজ বড় বালাই। কুন্তীকে দেব-আহ্বানে প্রলুব্ধা করে যাওয়ার জন্যই তো দুর্বাসার কুন্তিভোজ-প্রাসাদে আগমন। দেবতা প্রভুরা তাঁকে ঐ কাজেই নিয়োগ করেছেন। কুন্তী চান বা না চান, দুর্বাসাকে মন্ত্র দান করেই দেবশিবিরে ফিরতে হবে। দেবপ্রভুদের কাছে নিবেদন করতে হবে আরব্ধ কর্ম তিনি সাফল্যের সঙ্গেই সমাধা করে এসেছেন। তাই দেখি, কুন্তীকে বরদান করার ব্যাপারে দুর্বাসা অমন ব্যাগ্র।

ব্যাপারটা যে নিপুণভাবে পূর্বপরিকল্পিত তার আরও একটি প্রমাণ এই যে, বরদানের প্রস্তাব উত্থাপনকালে প্রথমেই কুন্তীকে তিনি সেই বর প্রার্থনা করতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যার সঙ্গে কেবলমাত্র বিবাহ ও মাতৃত্বের প্রশ্নই জড়িত। বলেছেন ঃ 'তুমি অনন্যসুলভ···(অন্য বর ছাড়া সেই বরই) প্রার্থনা কর (যে বর প্রভাবে) সমস্ত সীমন্তিনীর অগ্রণী হইবে।' অর্থাৎ সকল বিবাহিতা স্ত্রীজাতির মধ্যে সেরা হবে। সেকালে সেরা স্ত্রীরত্না তিনিই, যাঁর কপালের সিঁদুর অক্ষয়। যিনি স্বামী সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী এবং সেকালে আর হয়ত বা একালেও, যিনি সুপুত্রের জননী। কিন্তু কুন্তীকে স্বামীভাগ্যে যথার্থ ভাগ্যবতী বলে স্বীকার করা যায় কি? যৌন-অক্ষম স্বামী পাণ্ডুর সঙ্গে সহবাসের সুযোগ এক দিনের জন্যও যাঁর ভাগ্যে জোটেনি, প্রথম যৌবন যিনি পুরুষত্বহীন সেই স্বামীর সঙ্গে বনবাসী জীবন যাপন করেই কাটিয়েছেন এবং আজীবন উদ্বেগে, বনবাসেই যাঁর জীবনের সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে হয়েছে, রাজকন্যা ও সুখলালিতা সেই কুন্তী কি বস্তুতই ভাগ্যবতী? 'কুন্তী' ও 'দ্রৌপদী' নাম দুটি হিন্দু পরিবারে খুবই অল্পশ্রুত। দুর্বাসার আশীর্বাদে কুন্তী বরং আজীবন দুঃখ কষ্টই ভোগ করেছেন। অবশ্য দেবপুত্রের জননী হওয়ার ইতিহাসে তিনি বিশিষ্ট রমণীর মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। কুন্তীর মহিয়সী ইমেজ তৈরী করার জন্য মুনিরা ইতিবৃত্তটির শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তবু বলব, পঞ্চপাণ্ডব পরিশেষে বিজয়ী হলেও পাণ্ডব বিজয়ের মধ্যে যে বিশেষ আনন্দ ও গরিমা ছিল না, যুদ্ধ সমাপ্তির পর বুদ্ধিমতী কুন্তীও তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কৌরব শিবিরের বিপক্ষে কুরুবংশেরই প্রধান দুই ষড়যন্ত্রী বিদুর ও কুন্তীকে তাই আমরা রিক্ত বিমর্ষ এবং অপরাধী রূপেই দেখতে পাই। বুঝতে পারি, যুদ্ধ বিজয়ের পর দেবপক্ষের ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কুরুক্ষেত্রে স্বজন নিধনকারী দেবানুগত পাণ্ডবগণ এবং বিদুর ও কুন্তীর কাছে। তাই যে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য অত কৃচ্ছ্রসাধন সেই রাজ্যে (যা তখন নামান্তরে ক্ষত্রিয়হীন শ্মশানভূমি মাত্র) যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হলেও কুন্তী বা বিদুর রাজ্যসুখ বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। গেছেন তাঁরা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে বনবাসে। এমন যে কুন্তী-জীবন, দেবতার বর লাভে তা কি খুবই সুখের হয়েছিল? আজ সেই ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করলে বুঝতে পারি, কুন্তী জীবনে এক দিনের জন্যও সুখের মুখ দেখেননি। শেষ অধ্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ছেলেরা তাঁর যে রাজ্যে অভিষিক্ত হল, তা বিরোধ বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বজনহত্যার সমাধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুরোহিত শ্রেণীই বস্তুত নেপথ্য ক্ষমতার মালিক। অপরাধবোধে তাই বিদুর কুন্তী ও পাণ্ডবদের পরাজিত এবং বিমর্ষ হতেই দেখি আমরা।

ব্যজ্যাকাঙ্ক্ষা একটি ঐতিহাসিক ট্রাজেডিকে চিরকালের জন্য অমর করে রেখেছে। আজকের নয়া বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে সেই ইতিহাসের দিকে দৃকপাত করলে আমরা শুধুমাত্র পাণ্ডবদের করুণাই করতে পারি আর চোখের জল ফেলি কর্ণের জীবনভোর অকারণ লাঞ্ছনার জন্য, যার মুখ্য দায়দায়িত্ব কুন্তী কখনই এড়িয়ে যেতে পারেন না।

আসলে দেব-ষড়যন্ত্রের জালে প্রথমেই কুন্তীকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

দেবকার্য সাধনের দ্বিতীয় যন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন পাণ্ডু, কিন্তু সে কথা পরে।

বলা হয়েছে, দুর্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্রটির প্রয়োগমাত্র যে কোনো দেবতা 'ভৃত্যের ন্যায় বশবর্তী হইবেন।' কথাটা মিথ্যে নয়। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ঐ মন্ত্রটির গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তাই অসময়ে মন্ত্র প্রয়োগ করে কুন্তী দেবশিবিরকে বিচলিত করলেও সূর্যকে ছুটে আসতে হয়েছিল যথার্থই ভৃত্যের মত। দেবসভায় মন্ত্রদানের প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়েছে, দেবপুত্র উৎপাদন যখন দেব-বুদ্ধিদাতার আদেশ, তখন আর আহ্বানের সময় অ-সময় বলে কিছু নেই। বরং পাতাজালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজকন্যাকে জড়িয়ে ফেলাই ছিল হিমালয়স্থ বহিরাগত শক্তির লক্ষ্য। ওদিকে অদ্ভুত এক উপায় মুঠোর মধ্যে পেয়ে লাস্যময়ী চপলা রাজকুমারী তাঁর কৌতূহল দমন করতে পারেননি। আকর্ষণী শক্তি তাঁর ওপরও সংগোপনে ক্রিয়া করতে আরম্ভ করেছিল। দুর্বাসার কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে ঐ উপায় প্রয়োগের ফলাফল যে কোনো দেবতার সঙ্গে রতিক্রিয়ার সুখানন্দে সার্থক হবে। বুদ্ধিমান কতিপয় পরবর্তী কবি দেব-ইমেজ সৃষ্টির জন্য সচতুরভাবে ঐ কামক্রিয়াকে 'যোগবল' বলে ধোঁকাসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হননি। আদি মহাভারতকার বিষয়টিকে নিছক পার্থিব রতিক্রিয়া হিসাবেই উল্লেখ করে গেছেন। 'যোগবল' দ্বারা কোনো দেবতা মানবীগর্ভে দেববীজ বপন করে গেলেন, এ-বক্তব্য অক্ষম প্রক্ষেপকারীগণ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন-নি। বরং পার্থিব যৌনক্রীড়ার কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। শুনতে অদ্ভুত, তবু সত্যি, বহুঢক্কানিনাদিত ঈশ্বরের শক্তির অংশ দেবতারাও ছিলেন সকাম। বলা হয়েছে, পৃথ্বীনারী পৃথার সঙ্গে তাঁরা কামক্রীড়ায় রত হন। ভাবা যায় না, কল্পনা করাও অসম্ভব যে, ঈশ্বর স্বয়ং ছুটে আসবেন তাঁরই সৃষ্ট জীবের সঙ্গে পার্থিব উপায়ে রতিক্রীড়া করতে। জীবাত্মা শ্রীরাধা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রতিলীলার যে কাব্যকাহিনী পদাবলী কীর্তনাদিতে সর্বজনবিদিত তা জীবাত্মা পরমাত্মার সাযুজ্য লাভের রূপক রূপকথা মাত্র। কিন্তু কুন্তী ও দেবতাদের ঘটনা তেমন কোনোও উচ্চমার্গের কাব্যকথা নয়, তা বস্তুতঃ এবং পার্থিব রতিকলারই ইতিহাস। মহাভারতেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি বর্তমান।

দুর্বাসা-প্রদত্ত উপায়টি পরখ করার বাসনায় কুমারী কুন্তী যখন দেব-আহ্বানে মনোস্থির করে ফেলেছেন, তখন 'চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার (কুন্তী তার নিজের) ঋতুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্বক কন্যাকাবস্থায় রজস্বলা হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।' (ঐ)। শুনতে খারাপ লাগলেও একথা না বলে উপায় নেই যে অসামান্যা রূপবতী শ্রীমতী কুন্তীর মধ্যে যৌবনযাতনা ছিল বেশ তীব্র। কুন্তী ছিলেন বিশেষভাবে সকাম এবং রতিরঙ্গে পারদর্শিনী। আর তাঁর এই স্বভাব-চাপল্য যে কুমারী অবস্থা থেকেই পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে মহাভারতকারের উপর্যুক্ত বক্তব্য তা-ও আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। কত বিচিত্র ছলাকলা জানতেন কুন্তী দেবী, দেবতাদের সঙ্গে তাঁর অকুণ্ঠ যৌনমিলনের দৃশ্যগুলিতে তা ধরা পড়ে গেছে। আমরা সেই সেই দৃশ্যে আমার এই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাব। এখানে আরও উল্লেখ করে রাখি যে, দেবর বিদুরের সঙ্গেও তাঁর ছিল গোপন প্রণয় এবং হয়ত বা দেহজ মিলনের সম্পর্ক। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদুরপুত্র কিনা এ নিয়ে শ্রীমতী ডঃ ইরাবতী কার্ভে একটি চমকপ্রদ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথায়' ডঃ কার্ভের মতবাদের যথাযথ বিশ্লেষণ না করে প্রথাবদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এই বৈপ্লবিক বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কুন্তীবিদুর সম্পর্কের গভীরতর আলোচনায় উপযুক্ত সময়ে আমরা কিন্তু দেখতে পাব, বস্তুতই দেবর বিদুরের সঙ্গে কুন্তীর ছিল গোপন প্রণয়ের সম্পর্ক। কিন্তু সে বিতর্ক উত্থাপনের জায়গা এখানে নয়। নভশ্চর দেবতারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে চমকপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, আমার পরবর্তী গ্রন্থ 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির'-এ সেসব প্রসঙ্গের সবিস্তার আলোচনা করেছি। যুধিষ্ঠিরের পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত বিতর্কও সেখানেই স্থান পেয়েছে।

দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রটি পরখ করার জন্যই নাকি কুন্তী তাঁর বাল্য বয়সে এবং কুমারী অবস্থায় সূর্যকে আহ্বান করেছিলেন। মহাভারত আমাদের সে কথাই বোঝাতে চাইলেন। বলা হল, বালসুলভ চপলতাবশতঃ সেই গর্হিত কার্জটি কখন যে আনমনে করে ফেললেন রাজকুমারী তা সম্ভবতঃ তিনি নিজেই বুঝতে পারেননি। কিন্তু তাঁর পূর্বাপর আচরণ এ বিষয়ে বিপরীত সাক্ষ্যই রেখে গেছে। কেবলমাত্র কৌতুকছলে তিনি যদি সূর্যকে আহ্বান করে থাকতেন, তাহলে দুর্বাসা-কৌশলটি প্রয়োগের আগেই তাঁর মন আসন্ন যৌনমিলনাকাঙ্ক্ষায় রভসিত হয়ে উঠত না। কিন্তু বস্তুতপক্ষে দুর্বাসা-কৌশল ব্যবহার করার প্রাঙ্‌মুহূর্তে তিনি 'কন্যাকাবস্থায় রাজস্বলা' হওয়ায় নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হয়েছেন। তাঁর সেই মানসিক অবস্থাটি মহাকবি সুন্দর কাব্যিক ব্যঞ্জনার দ্বারা পরিস্ফুটিত করেছেন। কালীপ্রসন্নর অনুবাদে সে বর্ণনা এই রকম ঃ "একদা কুন্তিভোজকন্যা

দ্বিজপ্রদত্ত মন্ত্রসমূহের প্রতি সন্দিহান হইয়া চিন্তা করিলেন, মহাত্মা ব্রাহ্মণ যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার ঋতুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্বক কন্যাকাবস্থায় রজস্বলা হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।" (বন, কালী, ৩১১, প্রথম সংস্করণ, সাক্ষরতা)। রাজকুমারী জানতেন দুর্বাসা-কৌশল প্রয়োগের অর্থ মাতৃত্ব কামনা। সূর্যের ঔরসে সন্তানলাভের শিহরণ যাঁকে অধৈর্য করে কন্যাকাবস্থায় আপন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে প্রলুব্ধ করে, তিনি তাঁর কৈশোরেই যৌনাবেগের তাড়না অনুভব করেছেন নিশ্চয়ই। অথচ ঘটনা তাই হলেও স্বয়ং মহাভারতকার অথবা পরবর্তী কোনো প্রক্ষেপকারী পৃথার ভাবমূর্তি বা 'ইমেজ' ধরে রাখার জন্যই ঘটনাটিকে নতুন পালিশ দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। যিনি ভবিষ্যতে ব্রহ্মার পরিকল্পনা অনুসারে বিজয়ী পাণ্ডবের জননী হবেন, তাঁর ভাবমূর্তি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করলে বিজয়ীদের পক্ষে সাধারণ্যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় অসুবিধা দেখা দিতে পারে। পাণ্ডবদের প্রতি একটি সর্বজনীন শ্রদ্ধাভাব সৃষ্টি করা না গেলে তথাকথিত দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণে ফাঁক থেকে যাবে। তাই পাণ্ডব, পাণ্ডবজননী ও দেবপক্ষে সমবেত সকল ব্যক্তিকেই জনমনে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। দুর্যোধনসহ দেববিরোধীপক্ষের প্রতি সাধারণের সকল মমতা নষ্ট করে ফেলাও এর উদ্দেশ্য ছিল।

মহাভারতীয় তথ্য সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, দুর্যোধনের প্রতি তখন জনসমর্থন কম ছিল না। অন্যদিকে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির চেয়ে ভয়ই ছিল প্রবল। বুদ্ধিমান দেবরাষ্ট্রনীতি তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বুঝেছিল শুধুমাত্র ভয় ও সন্ত্রাস নয়, ভয়ভক্তিও নয়, নির্ভেজাল ভক্তিভাবই তাঁদের প্রতিষ্ঠায় অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে; অন্যথা দেশীয় রাজন্যবর্গকে উৎসাদিত করে যুধিষ্ঠির যে সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে বসবেন সেই ভূভাগ শাসনে রাখতে বাধা পেতে পারেন তিনি, দেখা দিতে পারে সন্দেহ, অবিশ্বাস, অভক্তি ও বিদ্রোহ। তাই ভক্তি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পাঁচমিশেলি গপ্পো তৈরী হয়েছিল। তাই কি পরবর্তীকালে ঘটমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়েছিল মহাভারতের অংশবিশেষে নতুন নতুন কথা ও কাহিনী সংযোজিত করার? কাহিনী সূত্রে আমরা দেখতে পাই, যেহেতু তিনিই বেদব্যাস জননী সত্যবতীর অবৈধ পিতা এবং ইন্দ্রের বন্ধু, সেই-জন্যই উপরিচর বসু উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগসর্বস্ব এক অতি সাধারণ রাজা হলেও, মহা-ভারতকার সে রাজাকেও মহাত্মা বানিয়েছেন। এই অদ্ভুত প্রচার রাজনীতিই আবার দেখি, কুন্তীর কামনাকে নিছক বালস্বভাবসুলভ কৌতূহল বলে প্রচার করতে উদ্‌গ্রীব। সূর্যের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ ও সহবাসের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে

তা কিন্তু কোথাও অবোধ বালিকা বলে প্রমাণ করে না। দেখা যায়, তিনি কাম-ক্রীড়ায় বিশেষ পরিপক্ক। সন্দেহ হয়, মনে মনে প্রস্তুত হয়েই তিনি আহ্বান করেছিলেন দেবশিবিরের সবচেয়ে তেজোময় ও উজ্জ্বল-সুন্দর পুরুষ সূর্যদেবকে। আহ্বান করার কালেই পঞ্চশরে অভিভূত হয়েছেন, কামপীড়িতা হয়ে যৌবনাবেগ অনুভব করেছেন। কুমারী অবস্থায় তাঁর এহেন মনোশ্চাঞ্চল্য অশ্রদ্ধেয়, তাই তাঁর হয়ে সাফাই গেয়েছেন প্রচারক, বলেছেন, ঘটনাটি ছেলেমানুষী কৌতূহলের জন্যই ঘটে গেছে।

বলা বাহুল্য সেদিন মানুষের সরলতাকে যত সহজে এক্সপ্লয়েট করা সম্ভব ছিল, আজ আর তেমন সুবিধে নেই। আমরা বুঝতে পারি, এভাবেই মুনিদের হস্তামর্শন চলেছে মহাভারতের পর্বে পর্বে, এজন্যই মহাকাব্যের শ্লোকস্তরে অত স্ববিরোধী বক্তব্যের সমাহার; এসব কারণেই মহাকাব্যের কোনো কোনো অংশ সুলিখিত, কোথাও কোথাও বঙ্কিম-কথিত 'গর্দভের রচনা' একটি মহৎ কাব্যের গরিমাকে খর্ব করেছে।

দুর্বাসা-প্রদত্ত মন্ত্র বলে কুন্তী হয়েছিলেন দেবপুত্রের জননী, একথা বলার মধ্যেও তো সেই একই ফাঁকি। একই চাতুরী বর্তমান। তৎকালীন বুদ্ধিমানরা একটি দূরভাষ যন্ত্রকে মন্ত্র বলে চালিয়ে ছিলেন আর বিজ্ঞানে অনগ্রসর সরল মানুষ তাই বিশ্বাস করে দেবতা ও ঋষিদের অলৌকিক ক্ষমতার জয়গানে দেশ দেশান্তর মুখরিত করে তুললেন। লেখা হল পুঁথি, যা যুগযুগান্তর আমাদের একই ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল।

মহাভারতের মূল কাহিনী অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা পাণ্ডববিজয় গাথাকেন্দ্রিক কাহিনীটি আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী আলোকে পুনশ্চ পাঠ করলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দেবতারা অলৌকিক উপায়ে কিছুই করতেন না, সুতরাং তাঁদেরই বলে শক্তিমান মুনিরাও যে অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকারী ছিলেন না তা সহজেই অনুমেয়। সব অলৌকিক কাহিনীই যথার্থ বিচারে তার আসল স্বরূপ প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। দেখা যায়, বাস্তব কাহিনীর ওপরে বুদ্ধিমানরা সেকালে অলৌকিকতার প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই কৌশলটি ব্যাখ্যা করতে পারলেই সাদা স্বচ্ছ বাস্তব কাহিনীটি অলৌকিকতার নির্মোক খুলে বার হয়ে আসে। পরবর্তী গ্রন্থ 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির'-এ পর্বানুক্রমিকভাবে অলৌকিক গল্পগাছা বাছাই করার চেষ্টা করেছি। এখানে দুর্বাসা-মন্ত্রটির স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বলা হয়েছে, শিক্ষা সমাপ্ত হলে দুর্বাসা কুন্তীকে প্রায় জোর করেই একটি মন্ত্র দিয়ে গেলেন। ঐ মন্ত্রদ্বারা আহূত হলে যে কোনো দেবতাই কুন্তীর সঙ্গে প্রাকৃতিক

উপায়ে সঙ্গত হওয়ার জন্য ছুটে আসতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু মানুষকে আশীর্বাদ বা বরদান করার মত কি আর অন্য কোনো বিষয় ছিল না? যেহেতু ব্রহ্মার পরিকল্পনানুসারে উপযুক্ত গর্ভে দেবপুত্র সৃষ্টি করাই তখন লক্ষ্য, সেজন্য কুন্তীকে দেবপুত্র সৃষ্টির একটি সজীব যন্ত্রে পরিণত করে মুনিবর অন্তর্ধান করলেন।

এইবার মন্ত্ররহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য আরও একটু পরবর্তী ঘটনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শতশৃঙ্গ পর্বতে যখন পাণ্ডুরাজা কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে বসবাস করছিলেন তখন পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী দুর্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্রবল প্রয়োগে বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করে তাঁদের ঔরসে পুত্র লাভ করতে থাকেন। পাণ্ডুর অপর মহিষী মাদ্রীও একই উপায়ে পুত্রের জননী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলে কুন্তী তাঁকে একবারই মাত্র সেই মন্ত্রবল প্রয়োগ করার সুযোগ দেন। দ্বিতীয়বার পুত্রলাভের বাসনা সত্ত্বেও মন্ত্রবল প্রয়োগের উপায় না থাকায় মাদ্রী আর গর্ভ ধারণের সুযোগ পাননি। প্রশ্ন হল, কুন্তী যদি মাদ্রীকে কোনো মন্ত্রই শিখিয়ে দেবেন, তবে মাদ্রী তা ইচ্ছেমত বারবারই তো প্রয়োগ করতে পারতেন। তিনি তা পারলেন না কেন? কেন দ্বিতীয়বার সেই মন্ত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সপত্নী কুন্তীকে অনুরোধ করার জন্য যৌন-অক্ষম স্বামী পাণ্ডুর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল মাদ্রীকে?

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ শক্তি মন্ত্র শক্তি নয়। ছিল তা যন্ত্র শক্তি। এবং যন্ত্রটি ছিল বেতার ট্রান্সমিশন বা দূরাভাষ যন্ত্র। সেজন্যই যন্ত্রের সাহায্য বিনা মাদ্রী দ্বিতীয়বার তাঁর সাধ পূরণ করতে পারেননি। মন্ত্র শক্তি হলে একবার তা লাভ করার পর পুনর্বার সেই উপায়টি প্রয়োগের জন্য কুন্তীর সদিচ্ছার ওপর মাদ্রীকে নির্ভর করতে হত না।

সুতরাং দুর্বাসা প্রদত্ত শক্তির রহস্যটি ব্যাখ্যা করলে মন্ত্রশক্তির চেহারাটি যন্ত্র শক্তি হিসেবেই দেখা দেয়।

সূর্যকুন্তী সংবাদ

তড়িঘড়ি দেবকার্য সাধন করেই দুর্বাসা বিদায় নিলেন। তিনি যে তাঁর ওপর ন্যস্ত কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছেন, এই সংবাদটা দেবশিবিরে পৌঁছে দিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করাই ছিল তখন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই যাবার সময় কুন্তীকে আরও একটি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে ভুল হয়ে গেছল মুনিবরের। তিনি হয়ত চপলা কুন্তীর চরিত্রটি খতিয়ে দেখেননি। বুঝতে পারেননি, দেবদত্ত উপায়টি প্রয়োগের জন্য কুমারী অবস্থাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠবেন রাজনন্দিনী কুন্তী, এবং তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী।

দুর্বাসা বিদায় নেওয়ার পর দুর্বাসা-প্রদত্ত যন্ত্রটির অদ্ভুত ক্ষমতা খতিয়ে দেখার ইচ্ছাতেই হোক অথবা দেবসঙ্গ উপভোগের ব্যাকুলতার জন্যই হোক, কুন্তী আর অপেক্ষা করেননি। অধৈর্যবশত তিনি আহ্বান করে বসলেন দেবতাদের মধ্যে উজ্জ্বলকান্তি সুন্দরতম পুরুষ সূর্যকে। পাঠক জানেন, এই সূর্যের ঔরসেই মহাভারতের অন্যতম প্রখ্যাত বীর কর্ণের জন্ম। কুন্তীর অবিমৃষ্যকারিতায় জাত বলেই কর্ণকে আজীবন দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। দেবপুত্র হয়েও তিনি ছিলেন দেব-শিবিরের দ্বারা পরিত্যক্ত। কুন্তীপুত্র হয়েও সূতপুত্র অপবাদে আমরণ লাঞ্ছিত। আর এ সবের জন্যই দায়ী কুন্তী ও দেবতারা। যে কুন্তী ব্রহ্মার পরিকল্পনায় নির্বাচিত, যিনি ভবিষ্যৎ আর্যাবর্তের শাসককুলে পাণ্ডবদের জননী, তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বিত হয়েছিল কর্ণের সত্যকার জন্মরহস্য সম্পর্কে। কুন্তী তো বটেই, দেবতা সূর্যও তাঁর ঔরসজাত সন্তান কর্ণের পরিচয় কোথাও ব্যক্ত করতে পারেননি। দেব অভিসন্ধি সার্থক করার জন্য কুন্তীকে আপন সন্তানের মৃত্যু আসন্ন দেখেও মুখ বুজে থাকতে হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত। পাণ্ডবপক্ষে অবশেষে বীরেন্দ্র কর্ণকে প্রলোভিত করে আনার জন্য কুন্তী ও কৃষ্ণ গোপনে কর্ণজন্মকথা কর্ণকে জানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সত্যরক্ষক কর্ণ আর্যাবর্তের সিংহাসনের লোভেও বন্ধু দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করেননি। এসব ঘটনা দেব-রাজনীতির কথা। সেসব আলোচনার স্থান অবশ্য এখানে নয়। এখানে দেহবান দেবতার স্বরূপটি কুন্তীর সঙ্গে সহবাসে কী ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অত:পর সেটাই আমরা লক্ষ্য করব। দেখব, শুধু সূর্যই নন, পরবর্তীকালে কুন্তীর আহ্বানে শতশৃঙ্গ পর্বতে যে দেবতারা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের আবির্ভাব কোনও অলৌকিক উপায়ে ঘটেনি, তাঁদের আচরণেও অলৌকিকতার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁরা প্রত্যেকেই এসেছেন উড়ন্ত দেবযানে এবং কুন্তীর সঙ্গে প্রাকৃতিক

প্রথায় মিলিত হয়ে কুন্তীগর্ভে দেবপুত্রের বীজ বপণ করে গেছেন ঃ পাণ্ডবদের জন্মও হয়েছে সাধারণ মানুষের মতই দীর্ঘ দশ মাস গর্ভবাসের পর।

বনপর্বে মহাভারতীয় কাহিনীর এইভাবে পাঠোদ্ধার করা যায় ঃ

সূর্যের চিন্তা করতে করতে "প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশন" করেছিলেন পৃথা। তাঁর এই প্রস্তুতি কি বালসুলভ? এ কি নিছক কৌতূহল? দুর্বাসাদত্ত কৌশলটি পরীক্ষার কৌতূহল? না কি আর কিছু? পাঠকই বিচার করবেন।

সূর্য এসে বললেন, "কল্যাণি! আমি মন্ত্রপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বংশবদ হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি করিব বল।"

সুচতুরা কুন্তী তখন শুরু করলেন সেই চিরন্তন ছলাকলা, যে বিদ্যা যে কোনো রমণেচ্ছু নারীরই প্রকৃতিপ্রদত্ত বিদ্যা, যা তার সৌন্দর্য, যা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। বললেন, ক্ষমা করুন, শুধু কৌতূহলবশেই আপনাকে আহ্বান করে ফেলেছি।

সূর্য কিন্তু সহজ পাত্র নন। কুন্তীর মনন ও মুখ যে একই বক্তব্য বলছে না, তা তিনি বুঝে ফেলেছেন তখন। সামনে রমণীয় শয্যা, সন্নিকটে কাম-বেপথু রমণী, কটাক্ষে যার পঞ্চশর সর্বক্ষণ জ্যামুক্ত হচ্ছে, মুখে সে যাই বলুক, অন্তরের আহ্বান সে কি লুকিয়ে রাখতে পারে? অতএব সূর্যকে বোকা বানানো গেল না।

সূর্য বললেন, "আমি বুঝিয়াছি, আমা হইতে অপ্রতিম শৌর্যশালী কবচ কুণ্ডল-ধারী সন্তান উৎপাদন করা তোমার অভিসন্ধি। অতএব এক্ষণে আত্মদান কর, তোমার অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইবে।..."

ছবিটা চোখ বুজে একবার কল্পনা করে নিন! তারপর বলুন, এ সূর্য কি আকাশের ঐ গনগনে গোলকটি হতে পারেন? ইনি সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন এক পুরুষমাত্র। এসেছেন রমণী সম্ভোগে। মিছেই এতকাল এমন একটি ব্যক্তিকে আকাশের বুকে ঝুলে-থাকা জড় গোলক বলে ভেবে এসেছি আমরা। এ সূর্য রমণপটু এবং ইনি আসাযাওয়া করেন উজ্জ্বল বিমানে চেপে।

রমণ-পটিয়সী পৃথা ছলাকলা যথেষ্টই করেছিলেন। মনে মিলনাকাঙ্ক্ষা যত তীব্রই হয়ে থাক, উজ্জ্বল সুপুরুষ সূর্যকে তিনি বলেছিলেন, না, না ভগবন্! আপনি বরং 'বিমানে আরোহণ করুন'। ভুল করে ডেকে ফেলেছি আপনাকে। ক্ষমা করুন।

সূর্যের তখন ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভাঙা অবস্থায়। চরম বজ্র আদেশে সূর্য গর্জে উঠেছেন, "হে কুন্তি! আমি তোমাকে বালিকা মনে করিয়াই অনুনয় করিতেছি, অন্য রমণী আমার অনুনয় লাভে সমর্থ নয়।" অর্থাৎ নেহাৎ বালিকা না হলে সূর্য নিশ্চয় অন্য পন্থা গ্রহণ করতেন (বলাৎকার?)। ক্ষমতাগর্বী

ব্রাহ্মণরা তখন পছন্দসই নারী পেলে বলাৎকারই তো করেছেন। পরাশর মুনির অতর্কিত বলাৎকারে সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল। মুনিরা এ সব সাহস পেয়েছেন প্রভু দেবতাদের মদতে। সুতরাং দেবতা সূর্যের পক্ষে একই পথ গ্রহণ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ ছলনাপূর্ণ অসম্মতি জানানোর পর পৃথা তাঁর আসল দ্বিধার কথা অকপটে স্বীকার করে বলেছেন, "দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয় তাহা হইলে লোক মধ্যে আমাদের কুলের কীর্তি নাশ হইবে।...অতএব যদি আপনি এই কার্যকে ধর্মানুগত করেন, তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনাকে আত্মপ্রদান করিতে পারি।"

ভগবানের কী দুরবস্থা ! সামান্যা নারীকে বশে আনতে তাঁকে তো কম বেগ পেতে হয়নি। যে ভগবান 'যোগবলেই সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন বলে মহাভারত বারম্বার সোচ্চার হয়ে উঠেছে, দেখা গেল, বিশেষভাবে গলদঘর্ম হয়েও সূর্যের দ্বারা সেই 'যোগবল' প্রয়োগ করা কিন্তু সম্ভব হয়নি। তবু কী আশ্চর্য ! কোনো মহাশয় ব্যক্তি ফের একটি বিভ্রান্তিকর শ্লোক জুড়ে দিয়ে বলেছেন, "ভগবান সহস্র-কিরণ স্বীয় তেজঃ প্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন।" (বন, কালী পৃঃ ৩১৩)

এতবড় ডাহা মিথ্যে ঐ প্রক্ষেপকারীদের পক্ষেই মহাভারতের যত্রতত্র অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। এতবড় ডাহা মিথ্যে যুগ যুগ ধরে সমুদয় ভারত-বাসীর পক্ষেও মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়নি। ধর্মের অহিফেন বটিকা সেবন করলে মিথ্যার তুরীয়ানন্দে এইভাবে বুঁদ মেরে সব কিছু মেনে নেওয়াই তো স্বাভাবিক। বিশ্বাসেই যে কেষ্ট মেলে, তর্কে বসলে কেষ্ট ঠাকুরটিকে কখনো শিখাধারী উত্তর-প্রদেশী গোয়ালা, কখনো বা দেবশিবিরের বিশিষ্ট বশংবদ দেবানুচর রূপেই দেখা যায়।

বৈষ্ণবের চিদানন্দরূপম বিশ্ব বিধাতা আর মহারতের 'শ্রীকৃষ্ণ'কে যাঁরা মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেন, মানুষকে ঈশ্বর বানিয়ে আপামর জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে তাঁরা খুবই পটু। এবং যাঁরা সেই বিভ্রান্তির শিকার হতেই ভালবাসেন, তাঁদের তর্কে নামিয়ে মৌতাত ভেঙে দিতে চাই না। বরং বলি, রিপ ভ্যান উইংকলের মত, আহা, সেই বাছারা যুগ যুগ ঘুমিয়েই থাক।

কিন্তু যাঁরা সত্যকে জানতে চান ; বুঝতে চান বুদ্ধিমানের ছল-চাতুরী ; জানতে চান নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, তাঁদের বলব ঃ দেখুন, সর্বমান্য দেবতার কীর্তি সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাভারতে কীভাবে রেকর্ড করা আছে। পড়ুন বিচার করুন নিজেরাই ঃ

কাজের মানুষ সূর্য সহবাসের আগে কিছু কাজের কথা সেরে রেখেছেন। কুন্তীকে বলেছেন, চিন্তা নেই, যদি জানাজানি হয়েও যায় তবু ব্যাপারটি তিনি কৌশলে ম্যানেজ করে দেবেন। আরও বলেছেন, "তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি কহিতেছি, আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক মহাযশা পুত্র সমুৎপন্ন হইবে ; কিন্তু তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

"কুন্তী কহিলেন, 'দেব ! যদি আপনি আমাকে পুত্র প্রদান করেন, তবে যেন ঐ পুত্র কুণ্ডলদ্বয় এবং সহজাত অভেদ্য বর্মধারী হয়।'

"সূর্য কহিলেন, 'হে নিতম্বিনি ! তোমার পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত এবং কুণ্ডল ও সহজাত বর্মধারী হইবে।"

মহাভারত আমাদের মেনে নিতে বলেছেন কুন্তীর বালসুলভ চপলতাকে। কিন্তু সূর্য-কুন্তী সংলাপে কুন্তীকে আমরা বেশ সুচতুর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারিণীরূপেই দেখতে পেলাম। মনে মনে দেবশিবিরের উজ্জ্বল পুরুষটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা যাঁর শরীর মন অধিকার করে আছে, সূর্যকে তিনিই এমন ভাব দেখালেন যেন মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে গৌণ ব্যাপার, একটি পরাক্রান্ত পুত্রলাভের জন্যই তিনি সকল লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আত্মনিবেদন করেছেন। অথচ ঘটনাবলী বিপরীত সাক্ষ্যই রেখে গেছে। কে না জানে কর্ণের জন্য তাঁর মনে তিলমাত্র স্নেহের স্থান ছিল না ! এই অবৈধ দেবপুত্রটিকে জাতির সংকটময় চরম মুহূর্তেও তিনি স্বীকৃতি দেননি। সন্তান অপেক্ষা তাঁর আপন মহিমময়ী ভাবমূর্তি বজায় রাখতে বরং অধিকতর যত্নশীল ছিলেন তিনি। বিচিত্রবীর্যের বংশরক্ষার জন্য সত্যবতী পেরেছিলেন বেদব্যাসের অবৈধ জন্মকথা পরম ব্রহ্মচারী ভীষ্মের গোচরে অনায়াসে নিবেদন করতে। কুন্তী কিন্তু কুরুক্ষেত্রের বিধ্বংসী যুদ্ধ নিবারণের জন্যও পারেননি পঞ্চপাণ্ডবকে কর্ণজন্মের ইতিহাস শোনাতে। একমাত্র তাঁর প্রিয়তম পুত্র অর্জুনের প্রাণ রক্ষার্থে খুবই সতর্ক গোপনতার সঙ্গে ছুটে গেছলেন দানশীল মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণের কাছে। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্ণ গর্ভধারিণীর নিষ্ঠুর চতুরালিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তবু 'হে ধরণী দ্বিধা হও' বলে আত্মহত্যা করতে পারেননি কুন্তী। ব্যর্থ হয়েছে তাঁর সেই অগ্নিপরীক্ষা।

সুতরাং কবচ কুণ্ডলধারী পুত্র লাভ তাঁর কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। মিলনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তিনি একটি কারণ খাড়া করেছিলেন মাত্র।

অন্যে পরে কী কথা, স্বয়ং সূর্যদেবও তাঁর সেই বিরাট ছলনা ধরতে পারেননি। অলৌকিক ক্ষমতাশালী ঈশ্বরপ্রতিম কোনো অকম্পনীয় অস্তিত্ব হলে 'যোগবলে'ই অন্তর্যামী দেবতা নিশ্চয়ই এক কামনাকাতর রমণীর মনোগত অভিপ্রায় অনায়াসে পাঠ করে মনে মনে একটি রহস্যময় হাসি হাসতে পারতেন। কিন্তু বেচারা

সূর্যের ততদূর ক্ষমতাও ছিল না। তিনি পারেননি সামান্য এক নারীর ছলনা ধরে ফেলতে। বরং বালিকার সঙ্গে বিতর্কে কাল কাটিয়েছেন তিনি। বাদানুবাদকালে পার্থিব ধর্মাধর্মের বিচার করে কুন্তীকে মনোবল যোগান দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন শুধু। সুতরাং মহাভারত যেমন করেই বলার চেষ্টা করুন না কেন, এ হেন এব উজ্জ্বলকান্তি সূর্যকে অলৌকিক শক্তিধর ঈশ্বরের অংশজ ভাবা অসম্ভব। মহাভারত জানাচ্ছেন, দেবশিবিরের অন্যতম এক পদস্থ সমরাধিনায়কের অসম্ভব তাড়া ছিল কর্তব্যপালন করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তনের। কুন্তীর মানসিকতা নিয়ে গবেষণার তাই কিছুমাত্র অবসর ছিল না তাঁর। তিনি কোনো রকম ভূমিকা ও প্রাঙমিলন রমণে আদৌ ঔৎসুক্য বোধ করেননি।

কুন্তীর অপ্রয়োজনীয় আবদার তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়ে সূর্য বললেন ঃ আত্মদান করলে তিনি অবশ্যই তাঁর অভীষ্ট লাভ করবেন। একটি পরাক্রান্ত দেবপুত্র তো পাবেনই, পাবেন পুত্রের জন্য একটি দুর্ভেদ্য বর্ম এবং কুণ্ডল।

সূর্যের বক্তব্যে আমরা তাই আরও জানতে পারলাম, 'সহজাত কবচ কুণ্ডল' বলে বাস্তবিক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। কর্ণকে তিনি কবচ ও কুণ্ডল দান করবেন কেবলমাত্র এমনিই একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : বলেছিলেন ঃ "বরারোহে! অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন তাহা এবং উৎকৃষ্ট বর্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।"

বলা বাহুল্য, এই প্রদান করার অর্থ নিশ্চয় এমন নয় যে আমাদের মেনে নিতে হবে, কর্ণ তাঁর বাজুর মাংসল আবরণের মধ্যে কবচ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতই যখন বারংবার বলছেন, 'কবচ' মানে 'বর্ম' তখন তাকে তাগা তাবিজ ভেবে নেওয়ার ও সেইমত প্রচার করার স্বাধীন দুর্বুদ্ধি একমাত্র পুরাণ কথকরাই সেকালে অর্জন করে থাকতে পারেন। আমরা কী করে নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সায় দিতে পারি? কী করে মান্য করি সেই বাক্যে, যা বলে, কবচটি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে প্রদান করার সময় কর্ণকে তাঁর বাজু কর্তন করতে হয়েছিল?

অশ্রদ্ধেয় আবোলতাবোলে সমস্ত ইতিবৃত্ত এমনভাবে তালগোল পাকানো যে সেই গোলমাল ছাড়াতে আরও খানকয় মহাভারত রচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে আরো ঢের ব্যাখ্যাকার হয়ত নতুন নতুন আলোকপাত করে আমাদের মহান পুরাকাহিনী মহাভারতের পুনশ্চ মূল্যায়ন করবেন, ইতিহাসকে উদ্ধার করবেন কথকঠাকুরদের দুর্বল গল্পগাছার স্তূপ খুঁড়ে, আমি আমার সীমিত ক্ষমতায় সেই জাতীয় কর্তব্যেরই উদ্বোধন করে যাই। আমার এই দুঃসাহস, জানি, অনেকেই বিদ্বেষবিক্ষুব্ধ মনে লক্ষ্য করেছেন ও রাগে ফুলছেন।

কিন্তু আমি নিরুপায়। আবহমানের ভাঁড় সেজে আমি আরও একটি স্তুতিপূর্ণ পাণ্ডব-জয়গাথা রচনার পরিশ্রম স্বীকার করে নিতে অক্ষম।

সূর্য বলেছেন, "হে ভাবিনি! তুমি আমার প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিদ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর, দেখ, তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় তোমার প্রতারণা পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।" (ঐ, পৃঃ ৩১২)।

দুর্বাসার 'ক্ষেত্রে' 'মন্ত্র' আর এক্ষেত্রে 'দিব্যদৃষ্টি' কথা দুটি পাঠক-মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই ধরা পড়ে, শব্দ দুটির সঙ্গে কোথাও কোনো অলৌকিকতার সংস্পর্শ নেই। 'মন্ত্র' গোপন বিদ্যাকেই বোঝায়। তাই তো আমরা বলি, 'যন্তরমন্তর'। কূটকর্মকে তাই বলা হয়, 'মন্ত্রণা'। গুপ্ত পরামর্শদাতারই খেতাব, 'মন্ত্রী'। মন্ত্র যেমন, তেমনি মন্ত্রগুপ্তি শব্দটিও রহস্যময় ব্যাপারস্যাপারের সঙ্গে জড়িত। তাই মন্ত্র বললেই স্তব স্তুতি বুঝতে হয় না।

দুর্বাসা মন্ত্র দান করে গেলেন। অর্থাৎ এক রহস্যবিদ্যা শিখিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান হলে সেই রহস্যবিদ্যা কোনো 'যাদু' নয়, একটি যান্ত্রিক 'দূরভাষযন্ত্র' বা 'ওয়্যারলেস বক্স', মুনি-ম্যাজিক হলে ঐ বিশেষ যন্ত্রটির নাম হয়, আকর্ষণী মন্ত্র বা 'বশীকরণ মন্ত্র', এর দ্বারা কুন্তী পেরেছেন দেবতাদের সঙ্গে অর্থাৎ হিমালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে তাঁদের ডাকতে।

সেকালে দেবতারা মহর্ষিদের যে গোপন বিদ্যার কিছু কিছু দান করেছেন রহস্যবিদ্যা হওয়ায় সেই মন্ত্রণাগুলিকে 'মন্ত্র' বলা হয়ে থাকলে শব্দটি শোনামাত্র আমাদের পক্ষে ভেবে নেওয়া অনুচিত হবে যে, তা ছিল কোনোও অলৌকিক ব্যাপার। স্তব ও স্তুতি, স্তোত্র ও বন্দনাগীতি পূজার্থে রচিত ছন্দবদ্ধ শ্লোক। কিন্তু 'মন্ত্র' রহস্যময় গোপন ব্যাপার। কখনো তা সামরিক শিবিরের 'কোড' ভাষা, কখনো বা যান্ত্রিক কৌশল।

অনুরূপভাবে 'দিব্য' ও 'দৈব' শব্দ দুটিকেও অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত না করেও তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব। দেবতারা স্বয়ং যখন বাস্তব দেহবান পুরুষ, তখন তাঁদের কার্যাবলীও অবশ্যই বাস্তব।

ইন্দ্রাদি দেবতারা সূর্যকে পৃথার কাছে পাঠিয়ে প্রাসাদের ওপর ভাসমান অবস্থায় অপেক্ষায় ছিলেন। প্রতীক্ষা করছিলেন, কতক্ষণে অভীষ্ট কর্ম সমাধা করে সূর্য নির্ঝরঘাটে ফিরে আসেন, তারই জন্য। পাছে অপর কারও দৃষ্টিতে তাঁদের বিমান অথবা একক হেলিকপ্টার নজরে পড়ে যায়, ভেস্তে যায় সমস্ত পরিকল্পনা, তাই তাঁরা হয়ত নিঃশব্দ বিমানে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন (ভরদ্বাজ-পুঁথি জানায় তৎকালে নিঃশব্দ বিমানের অস্তিত্ব ছিল)। সেই দুর্লক্ষ্য দূরত্ব ভেদ করে তাঁদের দেখতে হলে সাদা চোখে দেখা যায়

না। সাদা চোখে অনেকেই তো তখন বিমান উড়তে দেখেছেন, দেখেছেন দেবগণ আকাশপথে ঘুরে বেড়ান। কুন্তীও সেইভাবে চোখ তুলে দেখতে পেতেন তাঁদের, যদি তাঁরা ভাসমান অবস্থায় নিকট দূরত্বে অবস্থান করতেন। কিন্তু বলা হয়েছে, তিনি সেভাবে দেখতে পারনি, দেখছেন সূর্যপ্রদত্ত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে। প্রশ্ন হল, এই দিব্যদৃষ্টি বস্তুটি তাহলে বাস্তবিক কী? মনে করুন, সূর্য বেশ শক্তিশালী একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র কুন্তীর চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেছেন, হে ভাবিনি, এইবার দেখ, ঐ তাঁরা আমাদের লক্ষ্য করছেন। ব্যাপারটা তাহলে আর আমাদের কাছে কোন ভৌতিক অপ্রাকৃত ক্রিয়াকাণ্ড হিসেবে বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। আমাদের বিজ্ঞানীরা আজ আমাদের কমজোরি চোখে চশমা ও দূরবীক্ষণের দিব্যদৃষ্টিই তো দান করেছেন। কে তা অস্বীকার করবেন? আজও যদি দেবতা বলে কেউ থেকে থাকেন, তবে তো ঐ বিজ্ঞানীদেরই দেবতা বলে মেনে নিতে হয়। সেদিনও বিজ্ঞানীরাই ছিলেন দেবতা। তবে তাঁরা বহিরাগত। আজ আমরা নিজেরাই নিজেদের ঐ দিব্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। দেবতা শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারগুলিই 'দিব্য' ও 'দৈব' ঘটনা। তার সঙ্গে 'কপাল জোর' ও 'কপালে করাঘাতের' কোনো সম্পর্ক আছে কি?

বলেছি, একক হেলিকপ্টারের কথা। হ্যাঁ, এমন বস্তু বস্তুতই আছে। আজকের মানুষের দখলেই আছে। উড়ন্ত মানুষের পিঠে সেই উড্ডীন যান লাগানো থাকে, যা একটি যন্ত্র বা মোটর। সেই মোটরে যুক্ত থাকে হাওয়া কাটানোর পাখা। চালকযন্ত্রটি থাকে একটি ছোট্ট বাক্সের আকারে বুকের সঙ্গে বাঁধা। আবার পাখাবিহীন 'রকেট-বেল্টে'র সাহায্যেও আজকের শূন্যচারী উড়ে বেড়াতে পারেন। হনুমানের এমন একটি 'রকেট-বেল্ট' ছিল কিনা তা আজ কে প্রমাণ করবে? তবে হনুমানের পক্ষে লাফ দিয়ে সাগর পার হওয়া রকেট-বেল্টের সাহায্যে অবশ্যই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। রাক্ষসীর পিঠে চড়ে ভীমের পক্ষে হনিমুনে বার হওয়া মোটেও বীরত্বের পরিচায়ক নয়, তবে উড়ন্ত যানে কুমায়ুন-কন্যা হিড়িম্বা ভীমকে নিয়ে হনিমুন সেরে আসতে পারতেন অনায়াসেই। ইন্দ্রাদি দেবগণ শূন্যমার্গে, সুতরাং, বিভিন্ন উপায়েই ভেসে থাকতে পারতেন। বাইবেলের প্রতিবেদন হলে উপায়ের যথাযথ বর্ণনাও পেতে পারতাম আমরা। মহাভারতে মন্ত্রগুপ্তির কারিগরিই সমধিক। তাই যথাযথ বর্ণনার বড় অভাব। অধিকাংশই ধরে নিতে ও ভেবে নিতে হয়। এইসব ভাবনা যে একেবারেই 'সায়ান্স ফিকসন' জাতীয় কল্পনাশ্রয়ী ভাবানন্দ নয়, তা প্রমাণ করার জন্য পুরাপুঁথিরই সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হয়। মহাভারতের আজব ক্রিয়াকাণ্ড বোঝার জন্য এখানে দানিকেন-উদ্ধৃত পলিনেশীয় আনুষ্ঠানিক মুখোশ, আসিরীয় চারপাখাওয়ালা জীব, টুলার মূর্তির

হস্তধৃত 'আনুষ্ঠানিক বস্তু', মায়া পুরোহিতের পিঠে লাগানো 'আনুষ্ঠানিক সজ্জা' প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। পুরাকথা ও অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাক্ষ্য উদ্ধার করে দানিকেন তাঁর যে অপূর্ব ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন তা একবার পড়ে নিলে ভালো হয়। দানিকেন গভীর প্রত্যয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার দ্বারা এই সবকিছুকেই একক উড্ডীন যানের কোঠায় তালিকাবদ্ধ করেছেন। (অজিত দত্ত অনূদিত দানিকেনগ্রন্থ 'বীজ ও মহাবিশ্ব', ১ম সং)।

রকেট বেল্টের সাহায্যে এককভাবে উড়ন্ত মানুষ

গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও ইন্দ্রাদি দেবগণের শূন্যে অবস্থানের আরও একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে : দেবাশিবির সূর্যের রক্ষক বা রক্ষীবাহিনী হিসাবেও প্রেরণ করে থাকতে পারেন ইন্দ্রের সেনাপতিত্বে কিছু দেবরক্ষীকে। দেবরক্ষী

প্রেরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। কুন্তীর আহ্বানে এসে থাকলেও রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর এই অবৈধ দৈহিক মিলনের গোপন ব্যাপারটি কোনওক্রমে জানাজানি হয়ে গেলে সূর্যের পক্ষে তা বিড়ম্বনা ও বিপদের কারণ হতে পারত। কুন্তী একে নাবালিকা তায় কুমারী। সুতরাং রাজা কুন্তিভোজ এই ঘটনার সংবাদ পেলে সূর্যকে ছেড়ে কথা না-ও বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে একটা বিপজ্জনক সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠলে একাকী সূর্য রাজবাহিনীর দ্বারা হত নিহত অথবা বন্দী হতে পারতেন। দেবতারা যতই বৈজ্ঞানিক বলে বলীয়ান হয়ে থাকুন, পৃথ্বীমানবের কাছে বহুবারই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তাঁদের। তাই একাকী সূর্যকে এমন একটি গর্হিত কর্ম সম্পন্ন করতে পাঠিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হয়ত নিশ্চিন্ত বোধ করেননি। রক্ষক হিসেবে তাঁর সহগামীরূপে হয়ত প্রেরণ করেছিলেন সসৈন্যে স্বয়ং দেব-সেনাধক্ষ্য ইন্দ্রকেও। ভয়ের কারণ ছিল বলেই হয়ত সূর্য প্রাঙ্-মিলন মিথুনক্রীড়ায় সম্মত হননি।

সূর্যের বক্তব্যে আরও বুঝি, বুদ্ধিমান সেই পুরুষের চোখে কুন্তীর প্রতারণা ধরা পড়ে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, সঙ্গমেচ্ছু নারী ছলনা করে কালহরণ করেছেন মাত্র। মুখে সূর্যকে ফিরে যেতে বললেও মনে মনে তিনি মিলনের জন্য খুবই প্রস্তুত। সূর্য তাই কঠিন সত্য উচ্চারণ করে কুন্তীকে আঘাত দিয়ে 'দেবকার্য সাধনে' সত্বর নামিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। রূঢ় কণ্ঠে বলেছেন, তোমার প্রতারণা আমরা বুঝি সুন্দরী, কিন্তু সাবধান, যদি আমাকে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হয়, তাহলে সে ব্যর্থতা দুর্বাসার ব্যর্থতা বলেও গণ্য হবে। ব্যর্থতার জন্য চরম শাস্তি পেতে হবে সেই বুড়োকে যিনি তোমার 'স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা না করিয়াই তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিব।'

অদ্ভুত কথা, মহাভারত একবার বলেন, দুর্বাসা এমনই শক্তিধর যে তাঁর মন্ত্রের আকর্ষণে দেবগণ 'ভৃত্যের ন্যায়' আহ্বানমাত্র ছুটে আসতে বাধ্য, তখনই আর এক মুখে শোনান, দেবাদেশমত কার্য সম্পাদনে দুর্বাসার ত্রুটি ঘটে থাকলে সূর্য তাঁকে কঠিন শাস্তি দিতে পারেন। একথায় দুর্বাসাতেজের আস্ফালন কি নিতান্তই নিষ্ফল প্রতিভাত হয় না? বুঝতে অসুবিধে হয় কি, সূর্য এক কঠিন হৃদয় দেবসেনাপতি, এসেছেন দেবশিবিরের প্রয়োজন সাধনে, যে কাজের ব্যর্থতার জন্য দেবশিবিরের কাছে তিনি তো ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবেনই না, কুন্তীর নির্বাচনে ত্রুটি থেকে যাওয়ায় ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না দুর্বাসাকেও।

সামরিক নিয়ম সর্বত্রই এমনি কঠিন। সেখানে ক্ষমা পায় না যেমন সামরিক অধিকর্তার ব্যর্থতা, তেমনিই শিবিরনিযুক্ত স্পাই-এর অপদার্থতাও ক্ষমার্হ নয়।

না, যোগবল নয়, কুন্তীকে পথে আনতে মহাশয় সূর্যকে বেশ খাটতে হয়েছিল।

এমন এক ব্যক্তির পক্ষে কি গগনমার্গ থেকে বিশ্বচরাচরকে সৌরকর দান করা সম্ভব ! ঐশ্বরিক ক্ষমতা এহেন ব্যক্তির মধ্যে খুঁজতে যাওয়ার অর্থ পাগলামি নয় কি ?

সূর্যদেবের সমস্ত ঈশ্বরীয় মহিমা ম্লান করে দেওয়া নিশ্চয় মহাভারতকারের উদ্দেশ্য ছিল না। তেমন ইচ্ছে থাকলে আদি কবি সূর্যকুন্তী মিলনদৃশ্যকে অন্য-ভাবে রচনা করতেন। আসলে আদি কবি যেমন জানতেন, পরম সততার সঙ্গে ঠিক তেমনটিরই বর্ণনা করে গেছেন। পরবর্তী কোনও বুদ্ধিজীবী দুর্বল কলমে সূর্যনামক একটি খাঁটি পুরুষের ওপর জবরদস্তি ঈশ্বরীয় মাহাত্ম্য আরোপ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই আচরণের জন্য দোষারোপ করতে পারি না আমরা আদি কবির ওপর।

সূর্যকুন্তী সহবাসের মূল মহাভারতীয় চিত্রটি ছিল এই রকম ঃ

"তখন সূর্যদেব···কুন্তীর সহিত সহবাস বাসনায় তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি (কুন্তী) তদীয় (সূর্যের) তেজঃ প্রভাবে বিচেতনা হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সূর্যদেব কহিলেন, 'হে সুশ্রোণি ! তবে এক্ষণে তোমার পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হই ; সত্য কহিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র কোবিদ্ হইবে এবং তুমিও পুনরায় স্বীয় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।'

"কুন্তিভোজনন্দিনী সূর্যকে অভীষ্ট সাধনে তৎপর দেখিয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার বাক্যে অনুমোদনপূর্বক লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীয়ে শয়ান রহিলেন !"

চিত্রটি পার্থিব কামক্রীড়া ছাড়া অন্য কিছু বলে বিশ্বাস করা শক্ত। সূর্যের পূর্বাপর আচরণ, তাঁর ধর্মাধর্ম ও যুক্তিতর্ক, তাঁর শঙ্কা ও অধৈর্য, কুন্তীর গর্ভাধানে তিনি অক্ষম হলে ব্রহ্মাসূত্র ব্যর্থ হওয়ার জন্য দেবশিবিরে তিনি নিন্দার্হ হবেন বলে সূর্যের কার্যসাধনে বিশেষ তৎপরতা, এইসব আচরণের কোনটিই অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক নয়। তবু যাঁরা প্রক্ষেপকারী ব্রাহ্মণদের মত "ভগবান সহস্রকিরণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভধান করিলেন" ভেবে পরিতুষ্ট থাকতে চান এবং সূর্য নামক এক দেবতার ভজনা করে লাভ করতে চান পরামার্থ, ক্ষমা করবেন, স্বয়ং সূর্যদেব নিজে এসে স্বীকার করলেও সেই মহান বিশ্বাসীদের বোঝানো যাবে না যে সূর্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরীয় ক্ষমতার অধিকারী নন, স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে গণ্য হওয়ার মত কোনো গুণই তাঁর ছিল না।

শুধু সূর্যই নন, কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অন্যান্য দেবগণও এসেছিলেন যান্ত্রিক বিমানযোগেই।

"সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম সূর্য্যোপম, জ্বলদনলসন্নিভ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়) বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে বলিলেন, "সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কী অভীষ্ট প্রদান করিব?"

কুন্তী তাঁর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন। তখন ঃ

তস্মিন্ বহু মৃগেঽরণ্যে শতশৃঙ্গে নগোত্তমে।
পাণ্ডোরর্থে মহাভাগা কুন্তী ধর্মামুপাগমৎ ॥ (সিদ্ধান্তবাগীশ)

অথাৎ, পর্বতশ্রেষ্ঠ শতশৃঙ্গের ওপর পশুসমাকীর্ণ বনের মধ্যে মহাভাগা কুন্তীদেবী পাণ্ডুর জন্য ধর্মের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সেই বিমান বা দেবতাদের রহস্যময় রশ্মিরথের কথা এখানেও উল্লিখিত রয়েছে। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্মও বিনা যান্ত্রিক যানে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে পারেননি। সূর্যের মত ধর্মও এক দেহধারী পুরুষ। বিমানযোগে তিনি এসেছিলেন শতশৃঙ্গ পর্বতে আপন ঔরসে কুন্তীর ক্ষেত্রে যৌনঅক্ষম পাণ্ডুকে পুত্র দান করে যাওয়ার জন্য।

বস্তুতপক্ষে ধর্মকুন্তী সহবাসজাত পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্মপর্ব থেকেই ব্রহ্মার পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করতে শুরু করল। দেবশিবিরের মহামন্ত্রী ব্রহ্মাজীর কৌশলে সৃষ্টিকাজ শুরু হল মানবীগর্ভে দেবপুত্র উৎপাদনের আর এই কাজ অতি সাধারণ জাগতিক উপায়েই সমাধা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেবসভায় স্থির হয়ে যায় ধৃতরাষ্ট্র গোষ্ঠীকে উৎসাদিত করে আর্যাবর্তে দেবপুত্র যুধিষ্ঠিরকেই সম্রাট বানানো হবে। মহাভারত সেই সম্রাট বানানোরই ইতিহাস।

ঋগ্বেদে যম নামক দেবতার সংবাদ বার দুয়েক পাওয়া গেলেও 'ধর্ম' নামক কোনো স্বতন্ত্র দেবতার উল্লেখ নেই। আমরা অবশ্য জানি, যিনি যম, তিনিই ধর্ম (আবার মহাভারত বলেন, যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর)। যাই হোক, ঋগ্বেদীয় সূক্ত থেকে জানা যায় যম পিতৃলোকের রাজা এবং দুটি কুকুরসহ যমবাহিনী সেই পিতৃলোকের কঠোর পাহারাদার। যমের একটি যমজ বোন ছিলেন, যমী। যম সম্পর্কে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায়, অথর্ববেদে। কেননা যমকে জানতে হলে খবর করতে হয় পিতৃলোকের।

যে আর্য ঋষিদের সঙ্গে দেবতাদের সমঝোতা ও দহরম মহরম গড়ে উঠেছিল, তাঁরাও বসবাস করতেন হিমালয়ের তুষারতীর্থে! দেবানুমোদন লাভ করতে না পারলে সেখানে যাওয়া যেত না। যাঁরা বহিরাগত নভশ্চর দেববৃন্দের বিশ্বস্ত পরিজন, দেবলোকের ঊর্ধ্বে দ্যুলোক নামক পার্বত্য প্রদেশে থাকতেন সেই পিতৃগণ। তাঁদেরই রাজা ছিলেন যম। পিতৃগণকেও তাই দেবজনবর্গের মধ্যেই গণ্য করা হত। এঁদের মধ্যে ছিলেন, নবগ্ব, অথর্বণ, ভৃগু, সৌম্য ও অঙ্গিরস সম্প্রদায়।

অঙ্গিরসরা বেশ ভালো যোদ্ধা। এঁদের পিতৃগণ আখ্যা কেন দেওয়া হয়েছিল তা সুস্পষ্ট নয়। শ্রীরাজেশ্বর মিত্র অথর্ববেদ থেকে পিতৃলোকের যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন, ওঁদের 'পিতৃ' আখ্যা দেওয়ার কারণ হয়ত এই যে ওরা "দেবগণের উত্তম উপদেষ্টা ছিলেন।" (স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা)। বৃহস্পতি সেজন্যই তো দেবগুরু। লক্ষণীয়, ঈশ্বরপ্রতিম দেবতাদেরও উপদেশ গ্রহণ করতে হত মর্ত্যবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ আর্য ব্রাহ্মণদের কাছে!

শ্রীমিত্র পিতৃলোকের যে মানচিত্রটি উদ্ধার করেছেন অথর্ববেদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে, তা জানায়, দেবলোকের মত পিতৃলোকও বিভিন্ন পার্বত্য সড়ক দ্বারা যুক্ত ছিল। সেইসব পার্বত্যপথে যমানুচররা তাদের হিংস্র পাহাড়ি কুকুরবাহিনী নিয়ে অতন্দ্র প্রহরায় সর্বদা সতর্ক থাকতেন। নজর রাখতে হত দেবশত্রু অসুরদের ওপর। অসুররা ছিলেন আদিম ভারতীয় প্রজাতি। প্রায়ই দেবব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে কৃষিজ ও গবাদি সম্পদ লুণ্ঠন করতেন তাঁরা।

"তাঁরা যুদ্ধবিদ্যায় অতিশয় কুশল ছিলেন। তাঁরাও দেবতাদের মত একপ্রকার লৌহজাল ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের হাতেও লৌহময় পাশ থাকত (অ: ১৯/৬৬)।" লিখেছেন, "কিছু সংখ্যক অসুর (দেবজন কর্তৃক) বিতাড়িত হতে হতে সুদূর মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে আসীরীয় সভ্যতার পত্তন করতে সক্ষম হন।" (ঐ/ব্রাকেট আমার)। অসুর ছাড়াও দেবতাদের মধ্যে গোষ্ঠী বিবাদের ফলে দেবজন শত্রুর সৃষ্টি হয়েছিল। দেবতাদের মধ্যেও ছিল চোর তস্কর অন্যায়কারী। সংহিতায় এঁরা 'দেবপীয়ু' নামে অভিহিত।

দেবযান বা দেবলোকের পথে দেবরক্ষীরা তাই সতর্ক থাকতেন এবং পিতৃযান বা পিতৃলোকের পথে পাহারা দিতেন। যমানুচররা দেখতেন, কোনো দেবশত্রু যেন নজর এড়িয়ে দেবলোক পিতৃলোকে প্রবেশ করতে না পারে। অপরিচিত যে মর্ত্যবাসীরা বাণিজ্যিক অথবা অন্যতর প্রয়োজনে পর্বতারোহণ করতেন, ঐ দুই লোকের দ্বারদেশে তাঁদেরও আটক করা হত। আগেই বলেছি, দেবানুমোদন ছাড়া অর্জুন ব্যতীত এমন কি দেবপক্ষীয় রাজা পাণ্ডু এবং অপর পাণ্ডবদেরও

দেবলোক ব্রহ্মলোকে যেতে দেওয়া হয়নি। সেই দেবলোক বা স্বর্গারোহণের সময় অপর পাণ্ডবদের মৃত্যু ঘটলে একমাত্র যুধিষ্ঠিরকেই নিষিদ্ধ পথে অগ্রসর হতে দিয়েছিলেন দেবতারা। তবু যমরাজের সতর্কতার অভাব ছিল না। যুধিষ্ঠিরকে নজরবন্দী রাখার জন্য প্রহরায় পাঠিয়েছিলেন তিনি একটি সুশিক্ষিত সারমেয় প্রহরীকে। সেই যমদূত কুকুরটিকে মহাভারতের কোনো বুদ্ধিমান কবি স্বয়ং যমরাজরূপে খাড়া করে দিয়েছেন। কবিকৃপায় যমের এই অস্বাভাবিক পদাবনতি ঘটলেও মহাভারতীয় উদ্দেশ্য কিন্তু ঠিকই সিদ্ধ হয়েছে। অলৌকিকতা সৃষ্টি করা গেছে এবং যমপ্রহরী কুকুরের 'টপ সিক্রেট' অস্তিত্বকে তৎপরতার সঙ্গে গোপন করা সম্ভব হয়েছে। এসব সিক্রেট তো সাধারণের জ্ঞাতব্য নয়। অথচ মহাভারত সাধারণের জন্যই রচিত। সুতরাং তথ্য গায়েব হয়েছে। এইসব ব্যাপার লক্ষ্য করে স্পষ্টই বোঝা যায় আর্য ব্রাহ্মণরা কেন সেদিন বেদ উপনিষদকে সাধারণের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন। বেদ উপনিষদে ছিল সেই সব গূঢ়তত্ত্ব যা তার সমকালে অবাধভাবে পঠিত হলে দেবতারা হয়ত ধরা পড়ে যেতেন। ফাঁস হয়ে যেত হিমালয় স্বর্গের পার্থিব পরিচয়। তাই তাঁদের রচনা করতে হল একটি মহাভারত। মহাভারত অল্পজ্ঞানীকে মিথ্যা অলৌকিক কল্পকাহিনী শুনিয়ে দেবব্রাহ্মণদের অনুগত করার চেষ্টা করল। অদ্ভুত, অপূর্ব, বুদ্ধিদীপ্ত একটি কৌশল অবলম্বিত হল, যা জাতির পুরা-ইতিহাসকে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। সাধারণ মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত পিতৃলোকাধিপ যমকে তাঁরা খাড়া করেছিলেন এক মহান অতিলৌকিক বিচারকরূপে। বলা হল, অধার্মিককে তিনি দেন কঠোর সাজা। ধার্মিককে সাহায্য করেন স্বর্গারোহণে।

কথাটার মধ্যে অবশ্যই যথেষ্ট সত্য ছিল। তবে সে সত্যও ঐ 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র মতই বিভ্রান্তিকর। সত্য হল, যম মহাপ্রভু দেবলোকগামী সন্দেহজনক যাত্রীদের (যাঁরা দেবব্রাহ্মণদের মার্কামারা মিত্র পক্ষ নন) তাঁর বন্দীশালায় নিক্ষেপ করতেন। হয়ত অত্যাচারী যমদূতরা এবং যমপোষ্য কুকুরগুলি সেই দেবশত্রুদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে নিহত করত; হয়ত বা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় কিছু মানুষকে ফেরত পাঠানো হত দেবতাদের সংরক্ষিত সীমানার বাইরে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। উদ্দেশ্য, অত্যাচারিত মানুষগুলি প্রত্যাবর্তনের পর সমতলবাসীদের কাছে বলবে তাদের যমালয়ে যন্ত্রণাময় বন্দী জীবনের কথা। শুনে সন্ত্রস্ত হবে অন্যেরা। নরক যন্ত্রণার ভয়ে দেব-ব্রাহ্মণদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে তারা। নাম লেখাবে দেবরক্ষিত সম্প্রদায় হিসেবে, অর্থাৎ চিহ্নিত ধার্মিকে পরিণত হবে। অবশ্য ধার্মিক হলেই যে তাকে দেব-আবাস সেই পার্বত্য স্বর্গে গমনাগমনের অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হবে এমন নয়। দলে দলে সবাইকে স্বর্গে

যেতে দিলে দেবতাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত হত না ? সবাই নয়, ধার্মিক অথবা দেবব্রাহ্মণদের অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ছিলেন দেবকার্য সাধনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ব্যক্তি, স্বর্গগমনের দুর্লভ ছাড়পত্র কেবলমাত্র সেই সব ভি. আই. পি.-দের কপালেই জুটত। দেবতারা বহুভাবে বাজিয়ে নিতেন তাঁদের। অর্জুনকে কী কঠোর পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, পরে তা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছি। ছাড়পত্র পেতেন দুর্বাসার মত বুদ্ধিমান দলপতিরা। আবার মস্ত দল না থাকলেও কেবলমাত্র জ্ঞান গরিমা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার জোরেও অনেকে দেবলোকে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন, গণ্য হয়েছেন দেবজনের মধ্যে অন্যতম রূপে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রমুখেরা আপন প্রতিভার জোরে হিমালয়ের সংরক্ষিত প্রদেশে গিয়ে বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন। দেবতা ও যমরাজাও এইসব ভি. আই. পি.-দের সম্মান করতেন। দেবকার্য সাধনে এঁদের সহায়তার মূল্য ছিল অপরিসীম।

এভাবেই স্বর্গ ও নরকের ধারণা তৈরী হয়েছিল। দেবগুপ্তচরবাহিনীর এবং দেবরক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক সেই যমরাজ এভাবেই কারকে দিতেন দেবলোক গমনের অথবা স্বর্গারোহণের ছাড়পত্র, আবার কারকে করতেন যন্ত্রণাময় নরকে অর্থাৎ তাঁর বন্দীশালায় নির্বাসিত। অথর্ববেদ যমের যে চিত্র এঁকেছেন, সে ছবি দেবপ্রহরীদলের নৃপতি, পিতৃলোকের নিয়ামক ও নির্মম শাস্তি বিধায়ক যম মহাপ্রভুকে বহিরাগত নভশ্চর দেবতা হিসেবে খাড়া করে না। মনে হয়, যম পিতৃগণেরই একজন, তবে দেবতাদের দ্বারা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনিও দেবতা হিসেবেই গণ্য। ঠিক একইভাবে ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকেও তো দেবতাই বলা হয়। আসলে কিন্তু তাঁরা দেবজন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেব-আশিসপ্রাপ্ত মর্ত্যলোক-বাসী। তাছাড়া দেবতা হলে বেদে হয়ত যমের ওপর অনেক বেশি সূক্ত দেখতে পেতাম আমরা। অশ্বিনীকুমারদের ওপরেও ঢের সূক্ত আছে। কিন্তু যম সম্পর্কে বৈদিক সূক্ত অদ্ভুত রকমের কৃপণ। যে দুটি সূক্ত দশম মণ্ডলে খুঁজে পাওয়া যায়, সে দুটিও যমের পার্থিব ব্যক্তিত্বকেই ফুটিয়ে তোলে।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে যম ও যমীর কথোপকথন আছে। সেই বাক্যালাপ যমের চরিত্রে কোনো অতি-মানবীয় গুণারোপ করে না। বোঝা যায়, যম স্বয়ং আর্য রীতি-নীতি ও সামাজিক বিধিবিধানের দ্বারা আবদ্ধ। এই সূক্তে যমী যমকে নিভৃত সহবাসের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সহোদরার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে রাজি হননি যম। যমী সানুনয়ে বলছেন, "যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায়

আমার শরীরে প্রবেশ কর।" (ঋ, ১০।১০।৩)। কিন্তু যে কাজ দেবতারা করেন, অর্থাৎ যে রীতি ও নীতি দেবসমাজে প্রচলিত, মনুষ্যপুত্র হয়ে যম তা করতে অনিচ্ছুক। সহোদরাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাই বলেছেন, "একার্য পূর্বে কখনো আমরা করিনি। আমরা সত্যবাদী। কখনো মিথ্যা বলিনি।" এবং এইখানে তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় প্রদান করে জানিয়েছেন, "গন্ধর্ব আমাদের পিতা আর অপ্যা যোষা আমাদের উভয়ের মাতা।" (ঐ, হরফ প্রকাশনী)। গন্ধর্বগণ দেবজন হলেও দেবতা বা বহিরাগত নন। সায়নাচার্য অবশ্য এই শ্লোকে উক্ত গন্ধর্বের অর্থ করেছেন, সূর্য। কিন্তু যম যমী যে স্বয়ং দেবতা নন তার অপর সাক্ষ্য যমের উক্তিতেই আছে ঃ

যমী তখন নিতান্ত কামব্যাকুলা। তবু যম বলছেন, না এ স্থান নির্জন নয়। গর্হিত কর্মের অনুষ্ঠান এখানে অকর্তব্য, কেন না, "ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ চরন্তি।" (১০।১০।৮)। অর্থাৎ এস্থানের ওপরেও দৃষ্টি আছে সকল দেবগুপ্তচরের। এ'দের সর্বত্র গতায়াত, এ'রা চোখ বোঝেন না কখনো। অর্থাৎ স্বয়ং যমরাজ, যিনি পিতৃলোকের রাজা, তিনিও দেবগুপ্তচরের নজরবন্দী। লজ্জা অথবা ভয় পান তাঁদের। কেননা তিনি জানেন, "ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাকে পাপী বলে।" (ঐ।১২)। যমীর উক্তিতে যখন জানছি ভগ্নির সঙ্গে সহবাস দেবসভ্যতায় অচল নয়, তখন যমের এই দ্বিধা তাঁকে কোনোমতেই দেবগোষ্ঠীভুক্ত বলে প্রমাণ করে না। কেননা যম যমীর মনে কষ্ট দিয়ে কষ্ট পেয়েছেন। উপায় থাকলে তিনি নিশ্চয় যমীর বাসনা পূরণ করতেন। হতাশ যমী তাঁকে কাপুরুষ বলে তিরস্কারও করেছেন। তবু যম তাঁর সঙ্গে সহবাস করতে পারেননি।

সুতরাং যম মহাপ্রভুটি ছিলেন দেবনিযুক্ত দেবলোক পথের প্রহরীপ্রধান। যাত্রীদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হলে দেবলোকে প্রবেশের পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র দিতেন তিনি। কিন্তু সন্দেহজনক ব্যক্তিকে (অধার্মিক) পাঠাতেন যন্ত্রণাগারে। তাঁর অন্যান্য প্রহরীদের মধ্যে কিছু কুকুর প্রহরীও ছিল, একথা আগেই বলেছি। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের চোদ্দ সূক্তে যমকে তাঁর অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞদ্রব্য গ্রহণ করতে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যজ্ঞকারী ঋষি। যমের প্রহরী কুকুর সম্পর্কে বলা হয়েছে। "যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ। তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥" (ঐ।১১)। অর্থাৎ তোমার প্রহরী যে দুটি কুকুর পথ রক্ষা করে এবং যাদের নজরে সকল মানুষকেই ধরা দিতে হয় তাদের কোপ থেকে এই মৃতব্যক্তিকে রক্ষা কর। এখানে অবশ্য চতুর্চক্ষুবিশিষ্ট একধরণের অজ্ঞাতকুলশীল সারমেয়র কথা

বলা হয়েছে (কে জানে ঐ অদ্ভুত জীবগুলিও গ্রহান্তরবাসী দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে এসেছিল কিনা) এবং মাত্র দুটি কুকুরেরই উল্লেখ আছে। তবু অনুমান করা যায়, বিভিন্ন পার্বত্যপথ পাহারা দেওয়ার জন্য যমের কুকুরবাহিনী ছিল একাধিক। শিক্ষিত কুকুর সর্বোত্তম প্রহরী। (নাৎসী জার্মাণগণ বন্দীশিবিরের পাহারায় এবং নিজেদের সঙ্গে হিংস্র কুকুরবাহিনী রাখতেন)। এই শ্লোকে যে মৃতব্যক্তির নিরাপত্তার প্রার্থনা আছে, শুধু সেটুকুর জন্যই যমকে অতিলৌকিক কোনো চরিত্র ভাবারও কারণ নেই। তখন যমদূতদের পাল্লায় পড়ে বহুজনকেই প্রাণ হারাতে হয়েছে। সম্ভবত সেইজন্যই মৃত্যুর সঙ্গে যমালয়ের একটি সম্বন্ধ পরবর্তীকালে কল্পিত হয়ে থাকবে। তাছাড়া যে যম স্বর্গে যাওয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করেন, পরবর্তীকালে তাঁর সেই কার্যাবলীকে সম্যক বুঝতে না পেরেই হয়ত মৃত্যুর সঙ্গে স্বর্গ নরক গমনের ধারণা গড়ে ওঠে। বর্ণিত স্বর্গ ও নরক হিমালয়েই অধিষ্ঠিত ছিল সেদিন। পরবর্তীকালে মুনিদের দ্বারা ক্রমাগত মন্ত্রগুপ্তি ও অলৌকিক গল্পগাছা সৃষ্টির ফলে মানুষের মনে দুর্বোধ্য স্বর্গ নরকের ধারণা জন্ম লাভ করে। এ বিষয়ে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র একটি চমৎকার ব্যাখ্যা হাজির করেছেন ঃ

"এই যে পিতৃযান, দেবযান প্রভৃতি দেবমার্গের সঙ্গে মর্ত্যবাসীদের যোগাযোগ,—এ অতি সুদূর অতীতের কথা। ক্রমে সেগুলি বহুলাংশে কমে এসেছিল এবং বিলীয়মান দেবসভ্যতার শেষ বিলুপ্তি ঘটায় এই সমস্ত পথ রক্ষা করাও সাধ্যায়ত্ত হয় নি। ফলে এগুলিকে অরণ্য গ্রাস করে ফেলেছিল এবং নানা কারণে নানাভাবে এই বিরাট পার্বত্য প্রদেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন যে কতবার ঘটেছে তা বলাও বোধকরি সম্ভব নয়। কিন্তু এইসব মার্গের ঐতিহ্য মানব সংস্কারে এতো দৃঢ় হয়ে বসে গিয়েছিল যে মৃত্যুর পরে পরলোকগত আত্মার এই দুটি পথে গতির একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, যেটা পরে বিশ্বাসে পরিণত হয়।" (ঐ)।

যুধিষ্ঠিরের পিতৃপরিচয়ের খোঁজে বেরিয়ে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করলাম আমরা। জানলাম, ব্রহ্মপুরা অথবা গাড়োয়াল হিমালয়ের পথে পথে দেবগুপ্তচর বাহিনীর প্রধান, পিতৃলোকপতি যম দেবস্বার্থ (বা ধর্ম) এর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তাই তাঁর খেতাব ছিল ধর্মরাজ। অন্যদিকে, (সমতল আর্যাবর্তে) যিনি রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রস্থল হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের সভাসদ্‌বৃন্দের মধ্যেই একটি দেবগুপ্তচর বাহিনী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের নেতৃত্ব দান করে গেছেন, সেই কীর্তিমান পুরুষ বিদুরও দেবশিবিরের দ্বারা 'স্বয়ং ধর্ম', এই মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। যম এবং বিদুরকে হয়ত সেজন্যই অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে। উভয়েই দেবস্বার্থের রক্ষক। ধর্মরাজের বিদুররূপে

জন্মগ্রহণ করার কাহিনীটি সুতরাং কথক-ঠাকুরদের সুপরিকল্পিত সৃষ্টি বলেই মনে হয়। সাদা যুক্তি হল যে, যে ধর্মরাজ সাধারণ মনুষ্যপুত্র (আগের আলোচনা অনুসারে আমার তর্ক), তিনি যখন হিমালয়ের পার্বত্য পথ পাহারা দিচ্ছেন, আর্যাবর্তে বিদুর তখন পাণ্ডবদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন। সুতরাং মুনির অভিশাপে ধর্মরাজ মর্ত্যে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করে থাকলে বিদুরের জীবৎ-কালে সেই ধর্মরাজকেই আবার হিমালয়ে দেবকার্য সাধনের জন্য কর্তব্য কর্ম করতে নিশ্চয় দেখা যেত না। আসলে 'ধর্ম' শব্দটি গুপ্তবাহিনীর ঐ দুই নেতার মর্যাদাসূচক খেতাব ছিল। বলা হয়েছে, যিনি ধর্ম তিনিই বিদুর; যিনি বিদুর তিনিই ধর্ম। যম কিন্তু শুধুমাত্র 'ধর্ম' নন, তাঁর পদমর্যাদা ছিল আরও বেশি, তিনি ধর্মরাজ।

মহাভারত বলেছেন, কুন্তী ধর্মের সঙ্গে সহবাসের দ্বারা পুত্র যুধিষ্ঠিরকে লাভ করেন। ধর্মরাজ কুন্তীর সঙ্গে সহবাসার্থ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ কথা কিন্তু বলা হয়নি যে, পাণ্ডু দেবতা ধর্মকেই (যম?) আহ্বান করতে বলেছিলেন। দেবতাগণ কর্তৃক বিদুরও ধর্ম খেতাব প্রাপ্ত, এই গূঢ় রহস্য কুন্তীর জানা থাকতে পারে। জেনে শুনেই তিনি ধর্ম খেতাবধারী বিদুরকে আহ্বান জানিয়ে থাকলেও কিন্তু প্রকারন্তরে স্বামীর আদেশই পালন করেছেন। না হলে এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে শুধুমাত্র, ধর্মকে আহ্বান জানানোয় দেবশিবির বিদুরকেই পাঠিয়ে দেন বিমানযোগে। গ্রন্থান্তরে উত্থাপিত আলোচনায় আমরা জানতে পারব, বিদুরের সঙ্গে কুন্তীর ছিল গভীর গোপন প্রণয়-সম্পর্ক। তাই ধর্মদেবতাকে আহ্বান করার পর যখন অপরিচিত পুরুষের বদলে স্বয়ং বিদুর এসে উপস্থিত হন, কুন্তী নিশ্চয় তখন অখুশী হননি।

সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু একটি গাম্ভীর্যময় পরিবেশে কুন্তীর সঙ্গে সহবাস করে ব্রহ্মার পরিকল্পনা সার্থক করে গেছেন। ঐ তিন ক্ষেত্রে দেবতা ও কুন্তীর কথোপকথনে বেশ একটি অপরিচিতির দূরত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম কিন্তু ধর্মকুন্তী সংবাদে বিশেষ লক্ষণীয়। ধর্ম শয়নগৃহে প্রবেশ করেই পরম পরিচিতের মত রহস্যতরল কণ্ঠে সম্বোধন করেছেন কুন্তীকে। যম মহাপ্রভু হলে আমরা নিশ্চয় একটি মুদগরধারী গম্ভীর পুরুষেরই পরিচয় পেতাম।

মহাভারতে ধর্মকুন্তী সংবাদের পাঠ এই রকম: "ধর্ম হাসিতে হাসিতে কুন্তীকে বলিলেন, 'সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কী অভীষ্ট প্রদান করিব?"

কেন, এত হাসাহাসির কারণ কি? অন্য কোনো দেবতা তো অনুরূপ হাস্য-বিগলিত উচ্ছলতা প্রকাশ করেননি। আর যমের ক্ষেত্রে হাসিঠাট্টার তো প্রশ্নই

ওঠে না। নিষ্ঠুর 'থার্ড ডিগ্রী' শাস্তির অহোরহ নির্দেশ দান করা যাঁর দৈনিক পেশা, সে পুরুষটি কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হয়েই হাস্যপরিহাস শুরু করবেন, এতটা আশা আমরা নাই বা করলাম। যমের কোনো চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়নি। ধর্মের আগমনে কুন্তী খুবই আহ্লাদিত হয়েছেন 'হৃষ্টচিত্তে' বলেছেন, "মহাত্মন্ ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন।" (আদি পর্ব)।

সুতরাং সন্দেহ থাকে, যে ধর্ম যুধিষ্ঠিরের জন্ম দান করে গেলেন, তাঁর বস্তুত স্বরূপ কী ? স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস নিজমুখে বলেছেন, বিদুরই যুধিষ্ঠিরের পিতা। সমগ্র মহাভারত জুড়ে বিদুরের পূর্বাপর আচরণ সবই যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আরোহণের আনুকূল্য করে গেছে। কুন্তী-বিদুরের গোপন প্রণয়-সম্পর্ক বার বার প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কুন্তী বিদুরালয়েই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং বিদুরের সঙ্গে হত তাঁর সমস্ত রকম গোপন পরামর্শ। বিদুর কুন্তীর বহু সংবাদ মহাভারতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকলেও স্ফীতকলেবর সেই মহাগ্রন্থে বিদুর-পত্নী অথবা সেই বৈধপত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের কথা আমাদের লক্ষ্যে আনা হয়নি। মৃত্যুর আগে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে শেষবার দু চোখ ভরে দেখে যেতে এসেছিলেন। মহাভারত কাব্যে সে দৃশ্য অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। তাছাড়া ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে কুন্তীর (বিবাহিত অবস্থায়) প্রথম সন্তানের পিতা হওয়ার দাবি বিদুরেরই সর্বাধিক। কেননা তিনি কুন্তীর দেবর এবং তৎকালীন নিয়োগ প্রথানুসারে দেবরকে নিয়োগ করার রীতিই প্রচলিত ছিল।

এই হরেক প্রশ্নের পর যুধিষ্ঠিরের পিতৃত্বের অধিকারী হিসেবে বিদুরের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য বলে মনে হয়। মহাভারতীয় তথ্য সন্ধান করে আমি পেয়েছি একাধিক বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি। সে হিসেবে আমি প্রথম পাণ্ডবের পিতা হিসেবে বিদুরকে মেনে নিতেই সমধিক উৎসুক। বিদুরকে মেনে নেওয়ার ফলে কিন্তু মহাভারতীয় ইতিকথার কোথাও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না। এ বিষয়ে কবি বুদ্ধদেব বসু যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, সবিনয়ে বলি, সে আশঙ্কা অমূলক। ('মহাভারতের কথা' দ্রঃ)।

যাই হোক, যুধিষ্ঠির জন্মকথার মধ্যেও দেখা গেল কোথাও কোনো অলৌকিক ব্যাপার নেই। আমরা যে অর্থে সকলেই অমৃতস্য পুত্রা, যুধিষ্ঠিরও সেই অর্থেই ঈশ্বর পুত্র। সুতরাং মহাভারত জুড়ে তিনি যতরকম অপকর্ম করেছেন, তা সকলই অপাপবিদ্ধ পবিত্র ঈশ্বরেচ্ছা এই সনাতন প্রত্যয় আমাদের নির্ভাবনায় পরিহার করা উচিত।

দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের জন্ম হয় বায়ুর ঔরসে। বায়ু কোনো বিমানে এসেছিলেন বলে উল্লেখ নেই কালীপ্রসন্ন মহাভারতে। তিনি উপস্থিত হন

'মৃগারোহণে'। দেবতাদের গমনাগমনের সঙ্গে সে যুগে যে অদ্ভুত উড্ডীন যানের কথা সর্বদাই উল্লিখিত হয়ে থাকে এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল। ভীমসেন অপর পাণ্ডবদের মধ্যে নিজেও এক ব্যতিক্রম। তাঁর চেহারা ও স্বভাব, তাঁর আচার ও ব্যবহার এবং তাঁর দৈহিক বল ও বিক্রম অন্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র। বলা ভালো, ভীমসেনের সবটুকুই যেন বিসদৃশ। এজন্য সন্দেহ হয়, ভীম ইন্দ্রাদি দেবগণের সমজাতীয় কোনো দেবতার ঔরসে হয়ত জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর অনার্যসুলভ আচরণ, অতিভোজন, বৃক্ষকাণ্ড উৎপাটিত করে অদ্ভুত রকমের যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা, স্থূলবুদ্ধি অসংযম প্রভৃতি চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ। অমিত বিক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতকার যখনই ভীমপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, দেখা যায়, তখনই কোথায় যেন ভীমের প্রতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গকটাক্ষ (অনুচ্চারিত হলেও) নিঃশব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আর্যশত্রু অনার্য রাক্ষসকন্যা হিড়িম্বার সঙ্গে ভীম স্বয়ং আর্যা কুন্তী ও নীতিবাগীশ যুধিষ্ঠিরের সম্মতিক্রমেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'ন। সহবাস করেন। এই আর্য-অনার্য সহবাসের ফলে পরম বিক্রমশালী রাক্ষস (অনার্য) ঘটোৎকচের জন্ম হয়। মহাভারতে ঘটোৎকচের বিশেষ ভূমিকা আছে। সকল পাণ্ডব এমন কি ধৃতরাষ্ট্রদের তুলনায় ভীমের এই সর্বতরকম স্বাতন্ত্র্য আমাকে ভীম জন্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধ করে তোলে।

প্রশ্ন জাগে, ভীমের পক্ষে অনার্য ঔরসজাত হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ? এ প্রশ্নের কিছু সমাধান খোঁজার ও প্রশ্নটি নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে।

বেদে বায়ু সম্পর্কে সূক্ত আছে। বায়ু অন্তরীক্ষ স্থলের দেবতা। কিন্তু বৈদিক সেই বায়ু দেবতা ও 'মৃগারোহণ পূর্বক' যিনি এসে নিঃশব্দে কুন্তীগর্ভে পুত্রবীজ বপন করে গেছলেন, সেই বায়ুর পক্ষে হরিহর আত্মা না-হওয়াই স্বাভাবিক। যা সবিশেষ লক্ষণীয় তা হ'ল ধর্ম ও বায়ুর কুন্তী সমীপে আগমন ঘটেছে খুবই নিঃশব্দে ! মান্যবর কোনো দেবতা হ'লে তাঁদের আগমনের ঘটাপটাও কিন্তু অন্য রকম হ'ত। ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আগমনের বর্ণনা অনেক বেশি উচ্চকিত। তাঁদের ঔরসে পুত্রের জন্ম সময়ে, বোঝা যায়, বিশেষ সমারোহ হয়েছিল শতশৃঙ্গ পর্বতে। ইন্দ্রের আগমনে তো সমারোহের অন্ত ছিল না। মহাভারত কথক সেই অর্জুন জন্মকথা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও শ্রদ্ধা সহকারে বর্ণনা করেছেন। অশ্বিনীকুমারদের ঔরসে জাত মাদ্রীপুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করলে শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ 'যথাবিধি আশীর্বচন বিধানপূর্বক প্রীতমনে' তাঁদের নামকরণ করলেন। পাণ্ডবদের মধ্যে ইন্দ্রপুত্র ও অশ্বিনীপুত্রদের জন্মকথা বর্ণনায় এই বৈশিষ্ট্য কি বিশেষ কোনো রহস্যময় ইঙ্গিত বহন করছে ? যুধিষ্ঠির ও ভীম জন্ম সম্পর্কে অনুরূপ কোনো সমারোহের উল্লেখ নেই কেন ?

এইসব নানা প্রশ্ন ও রহস্য মহাভারতের শ্লোক শ্লোকান্তরে ছড়িয়ে আছে। সব প্রশ্নর সঠিক জবাব নেই। কিছু কিছুর উত্তর চেষ্টা করলে হয়ত পাওয়া যায়। পাওয়া যায় মহাভারতীয় তথ্যেরই স্তূপ খনন করে। যাই হোক, এখানে অতবড় আয়োজনের অবকাশ নেই।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্ম দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে। ইন্দ্রও সশরীরে শতশৃঙ্গ পর্বতে এসেছিলেন কুন্তীর আমন্ত্রণে। তাঁর সেই 'অত্যুত্তম' আকাশ রথটির উল্লেখ অবশ্য এক্ষেত্রে নেই। তবে সপারিষদ ইন্দ্র উপস্থিত হওয়ায় সেই প্রদেশে যে বেশ কিছু বিমান অবতরণ করেছিল তার উল্লেখ করতে মহাভারতকার ভুল করেন-নি। বলা হয়েছে, ইন্দ্রের সঙ্গে দেবস্তাবক অনেক গণ্যমান্য পুরুষ এসেছিলেন। অর্থাৎ ইন্দ্রের আগমনের ঘটাপটাই ছিল আলাদা। ক্ষমতাবান চামচারাও ছিলেন স্বভাবতই অনেকানেক। ইন্দ্রর মহিমাবৃদ্ধির জন্য মহাভারত রঙের ওপর রসান চড়িয়ে বললেন, "বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভ্যাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণ দেখিতে পাইলেন, অন্যান্য লোকেরা নেত্রগোচর করিতে পারিল না।" (আদি, কালী, ১২৯)।

পবিত্র মহাভারত বললেও ঐসব ধোঁকায় সম্ভবত আর আমরা বিচলিত বোধ করব না। বুঝতে হবে, ইন্দ্রের আগমন ঘটবে জানা থাকায় দেবশিবিরের বিশ্বস্ত মহর্ষিগণ ব্যতীত অপর সাধারণ গাড়োয়ালবাসীদের সেখানে থাকতে দেওয়া হয়নি। দাপটশালী মুনিরা হয়ত সাময়িকভাবে তাদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে-ছিলেন। আজও ভেরি ইম্পর্টাণ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোথাও উপস্থিত হলে বিমানবন্দরে অথবা হেলিপ্যাডে বিশ্বস্ত পদস্থ ব্যক্তিরাই কাছাকাছি থাকার সুযোগ পান। সেই বিশেষ স্থানে চারদিকের প্রবেশ পথ সিপাই সান্ত্রীরা আটক করে বসেন। দেবলোক (হিমালয়স্থ) ভিন্ন অন্যত্র দেবতারা খুবই সাবধানে চলাফেরা করতেন। তাঁরা বহিরাগত বলে অনেক সময় মর্ত্যবাসীর দ্বারা আক্রান্ত হতেন। বাইবেলে অমন আক্রমণের এক কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে।

সদোম-ঘমোরার বিনাশ সংক্রান্ত কাহিনীটি (বাইবেল, আদিপুস্তক, ১৯/১—১১) দুই দেবদূতের প্রাথমিক দুরবস্থার একটি বাস্তবচিত্র চিরকালের জন্য ধরে রেখেছে। সদাপ্রভুর ঐ দুই দেবদূত সদোম নগরে মর্ত্যবাসী লোটের গৃহে এক রাতের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাওয়াদাওয়ার পর দেবদূতেরা যখন শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখন সদোমের লোকেরা লোটের গৃহ ঘিরে ফেলে লোটকে বললেন, "রাত্রে যে দুই ব্যক্তি (লক্ষণীয়, দেবদূতকে ব্যক্তি বলা হয়েছে) তোমার বাটিতে আসিল, তাহারা কোথায় ? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা তাহাদের পরিচয় লইব।" যেন একটি 'রায়টে'র দৃশ্য। দেবদূত

দুজনকে বাঁচাবার জন্য গৃহদ্বার আগলে লোট সমবেত জনতাকে অনেক অনুনয় করলেন দেবদূতদের আক্রমণ না করার জন্য ! এমন কি নিজে পিতা হয়েও দুই কন্যাকে সেই উন্মত্ত জনতার হাতে দেবদূতের পরিবর্তে তুলে দিতে চাইলেন। কিন্তু অমন লোভনীয় উপহারও সঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে সদোমবাসী সরোষে বললেন, "সরিয়া যা।...এ একাকী প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচার কর্তা হইল ; (লোট সদোমে প্রবাস জীবন যাপন করছিলেন) এখন তাহাদের অপেক্ষা তোর (লোটের) প্রতি আরও কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া তাহারা লোটের উপর ভারী চড়াও হইয়া কবাট ভাঙিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি (দেবদূতদ্বয়) হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন ; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন, তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে পরিশ্রান্ত হইল।" (ঐ. ব্রাকেট আমার)।

দেবদূতরা কি কোনো টিয়ার গ্যাস সেল ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ? তাঁদের ক্ষিপ্র তৎপরতায় লোটকে আগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে সদোমবাসীদের 'অন্ধতায় আহত' করার ঘটনায় মনে হয় চোখ ধাঁধানো সেই গ্যাসীয় ধূম থেকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা লোটকে আগেভাগে ঘরের মধ্যে এনে সদোমবাসীর প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই দুই দেবদূতই তারপর লোটকে নিয়ে সদোম ছেড়ে পালিয়ে যান, কেননা সদাপ্রভুর সঙ্গে বিরোধিতা করার জন্য অসীম ক্ষমতাবান সদাপ্রভু সদোম ও ঘোমরাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেন। সে ধ্বংসলীলা ছিল নাগসাকি হিরোসিমা ধ্বংসের মতই ভয়াবহ। সেই ধ্বংসলীলার ব্যাখ্যা করে দানিকেন ধ্বংসকার্যকে আণবিক বিস্ফোরণের সমতুল বলেছেন। তাঁরও আগে রুশ পদার্থবিদ আগ্রেস্ট বাইবেলীয় উপাখ্যানটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন ঃ "The destruction of Sodom and Gomorrah as described in the Bible is remarkably like what today would have been taken for a description of the effects of a nuclear explosion." ম্যাটেস্ট আগ্রেস্ট উপাখ্যানটি বিশ্লেষণও করেছেন। লিখেছেন, "The inhabitants, we find, were warned of the dangers of death (from the air blast), blindness (from the intense flash) and injuri (from penetrating radiation). We learn that a thick layer of earth provided protection from these dangers, that the blast produced the characteristic column of fire, smoke, dust and debries ; we are told of the extent of danger and that the whole area was uninhabitable for some time after the explosion (because of radio-active contamination)."

পুরাতথ্য এভাবেই দেবতাদের (বহিরাগত নভশ্চরদের) সঙ্গে মর্ত্যবাসীর বিবাদ সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল, যা ঘটেছিল য়ুরোপ, ইজিপ্ট, মধ্যপ্রাচ্যে অথবা এশিয়া মাইনরে, ভারতের বুকেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কাহিনী আছে পুরাণে মহাভারতে। বহিরাগত নভশ্চরপ্রধান ইন্দ্রের আগমনে তাই দেবস্তাবকবৃন্দকে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে হয়েছিল। সাময়িকভাবে সরিয়ে দিতে হয়েছিল অবাঞ্ছিত পাহাড়িয়াদের। তাই সিদ্ধ মহর্ষিগণ ব্যতীত ইন্দ্রের সপারিষদ আগমনের ঘটাপটা অপর লোকে দেখার সুযোগ পাননি হয়ত।

অশ্বিনীকুমারদের ওপর বেদে একাধিক সূক্ত আছে এবং পরিমাণেও তা অনেক। তবু এই দেবতাদ্বয়কে আমি খাঁটি বহিরাগত নভশ্চর শ্রেণীতে গণ্য করার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ খুঁজে পাই না। বরং বিপরীত তথ্যের প্রাচুর্য তাঁদের এই গোলকে জাত দেবপুত্র হিসেবেই হাজির করে, ঠিক যেমন সূর্যের ঔরসে জাত কর্ণ। তবে অশ্বিনীকুমাররা দেবশিবিরের অতি ঘনিষ্ঠ আপনজন, তাঁরা দেববৈদ্য ; 'চিকিৎসা সারতন্ত্র' নামক ডাক্তারী গ্রন্থের রচয়িতা, উত্তম সিভিল ও মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার। তাঁরাই হিমালয়ে দেবযান পিতৃযানেব পথগুলি নির্মাণ ও সুগম রাখার কারিগর ছিলেন। সার্জারি ও প্লাস্টিক সার্জারি করে তাঁরা জুড়ে দিয়েছেন যুদ্ধে আহতদের হাত পা, মুছে দিয়েছেন মহর্ষির শরীর থেকে বার্ধক্যের চিহ্ন। এসব কথা আছে বেদে, অর্থববেদে। তাঁদের জন্ম অন্য গ্রহে নয়, উত্তর কুরুবর্ষে, অর্থাৎ হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে। সূর্য ও বিশ্বকর্মাদুহিতা সংজ্ঞার মিলন-সহবাসে এই দুই দেবতার জন্ম হয়।

সুতরাং খুব সঠিকভাবে বলতে গেলে নিখুঁত খাঁটি দেবতা বা বহিরাগত নভশ্চর প্রভুর ঔরসে একমাত্র অর্জুন ও কর্ণের জন্ম। মহাভারতে তাঁরাই প্রধান। তাঁরাই চলমান পুরা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছেন দ্বৈরথ যুদ্ধে।

কুন্তীর অধৈর্য যৌবনবাসনার ফলেই দেবপুত্র কর্ণকে দেববিরোধী ভারতীয় রাজন্যবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। একথা খুবই সত্যি, যদি বলি, বিনা কর্ণ কুরুক্ষেত্রের সর্বধ্বংসী সমরই হয়ত সম্ভব হতনা। কেননা কর্ণের মতো সর্বোত্তম গুণী যোদ্ধাকে পাশে না পেলে দুর্যোধন হয়ত অতবড় দেবশক্তির বিরুদ্ধে সমরায়োজনে সাহসীই হতেন না। ধৃতরাষ্ট্র-শিবির প্রতি মুহূর্তে দূত ও চরমুখে খবর পেয়েছেন, হিমালয়স্থ বহিরাগত দেবশিবির কীভাবে ও কতভাবে পাণ্ডবদের সহায়তা দান করছেন। খবর এসেছে, অর্জুন দেবলোকে গেছেন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে। তবু শঙ্কিত হলেও ধৃতরাষ্ট্র হাল ছেড়ে দেননি। তিনিও ভরসা করেছিলেন কর্ণের অমিত বিক্রমের ওপর। ভরসা অকারণ ছিল না। চাতুর্য, ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় না নিলে, কর্ণকে পরাভূত করা একা পার্থের

সাধকর্ম ছিল না, কৃষ্ণেরও নয়। হয়ত দেবলোক থেকে স্বয়ং ইন্দ্র ও শঙ্করকেই আসতে হত। প্রয়োগ করতে হত আরও শক্তিশালী অস্ত্রাদি। মরুভূমি বানাতে হত হয়ত কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরকে সদোম ঘমোরার মতই। কিন্তু সে বিতর্ক গ্রন্থান্তরে আলোচ্য। এখানে আমরা ব্রহ্মার পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে দেখলাম। বুঝলাম, ব্রহ্মা যেমনটি চেয়েছিলেন, তামাম আর্যাবর্তের শক্তিশালী রাজন্যবর্গকে খতম করার জন্য তাঁর অভীষ্ট অনুসারে সেভাবেই দেবতা ও দেবজনপুত্ররা কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে উদ্ভূত হয়েছেন।

কর্ণ দেবপুত্র হলেও দেবতারা তাঁকে স্বীকৃতি দিতে চাননি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক মুনাফা উত্তোলনের আশায়। তাঁরা চাননি কুন্তীর ভাবমূর্তিকে ম্লান করতে। কুমারী অবস্থায় ব্যক্তিগত লালসার জন্য কুন্তী একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন, এ তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে পাণ্ডবজননী ও পাণ্ডবদের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ত। তাছাড়া দেবতারা জানতেন কর্ণ অনেক বেশি সুসভ্য, সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা অপরিসীম। বুঝতে পেরেছিলেন, কর্ণকে তার জন্মবৃত্তান্ত জানানো হলেও সেই পুরুষ সিংহ কোনো প্রলোভনের বশেই দুর্যোধনকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন না। হতে পারে, ইন্দ্র স্বয়ং চাননি কর্ণ দেবশিবিরে আসুন। কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে এলে ইন্দ্রের ঔরসজ অর্জুনের সকল দীপ্তি ম্লান হয়ে যেত। নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন কর্ণই। যুধিষ্ঠিরের স্থলে সম্রাট হতেন সূর্যপুত্র কর্ণ। অর্থাৎ কুন্তীর অবৈধ সন্তান। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিকভাবে সূর্যের প্রতিপত্তিই প্রতিষ্ঠিত হত। হটে যেতেন ইন্দ্র এবং ধর্ম বা বিদুর। মনে হয়, সে ব্যবস্থায় দেবতা ও ব্রাহ্মণরা রাজি হননি। দেবশিবিরের নির্দেশে সম্ভবত সূর্যকেও সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যেতে হয়েছিল। পুত্রের মহা বিপৎকালেও সূর্য তাই কর্ণের কাছে এসেছিলেন সন্ত্রস্তভাবে এবং ছদ্মবেশে। কর্ণকে নিজের পরিচয় দান করে বলতে পারেননি, দেখ কর্ণ. আমি সূর্য, 'অহং তে জনকস্তাত'! দেবশিবিরের কঠিন নিয়ম ও সামরিক শাসনের শৃঙ্খলে দেবতারাও আবদ্ধ ছিলেন। সূর্যের সাধ্য কি দেবসভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন? ব্রহ্মার পরিকল্পনায় দেবরাজ ইন্দ্রপুত্রই শত্রু উৎসাদনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সূর্য অপেক্ষা সপারিষদ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিপত্তিও দেবশিবিরে অনেক বেশী। সুতরাং সূর্য দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, মহাভারতীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত বিচার করে একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

রাজনৈতিক পটভূমি

পাণ্ডুকেশ্বরে দেবশিবিরের কোলের কাছে রাজা পাণ্ডু ব্রাহ্মণদের রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় ছিলেন। রাজ্য ত্যাগ করে তাঁর এই পার্বত্য প্রবাসের কারণ মহাভারতে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। বলা হয়েছে, ঋষিশাপ থেকে মুক্তির জন্য রাজ্যত্যাগী পাণ্ডু নির্জনে তপস্যা করতেন। কিন্তু তাঁর তপশ্চর্যার বিস্তারিত সংবাদ অনুপস্থিত। ঘটনাদৃষ্টে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি প্রতাপশালী জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে মাসোহারা গ্রহণ করে স্বরাজ্যের দাবি ত্যাগ করে একরকম বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিসেবে ন্যায়ত তাঁর রাজ্যাধিকার ছিল না। কিন্তু মহাভারতে পাণ্ডুর রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে পুরাণকার বেদব্যাস একটি কারণ খাড়া করেছেন। বলেছেন, যেহেতু জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ সেজন্য পাণ্ডুরই সিংহাসন লাভের যোগ্যতা ছিল। বিদুরের রাজ্যে অধিকার না থাকার কারণ, বিদুর ছিলেন দাসীপুত্র। কিন্তু কেবলমাত্র জন্মান্ধতার দরুন ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যাধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে সেই যুক্তিতেই পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরের ওপর অখণ্ড দাবি উত্থাপন করতে পারতেন এবং সেই দাবিতেই একটা কুরুক্ষেত্র ঘটে যেত। রাজকাহিনীতে এই দাবি কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। এ দাবি পুরাণকারেরা ইতস্তত দু-একবার জনান্তিকে উচ্চারণ করেছেন মাত্র। একবার দুর্যোধনের মুখেও এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু তাও যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেনি যেহেতু সেই যুক্তিতে পাণ্ডবরা সমগ্র রাজ্য দাবি করেননি। বিচিত্রবীর্যের বংশধর হিসেবে তাঁরা রাজ্যে শুধুমাত্র সমান অংশের ভাগ চান। এই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বহুভাবে কৃষ্ণসহ পাণ্ডব মিত্রগণ বক্তৃতা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অর্ধরাজ্যের দাবি নিয়েই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। অর্ধরাজ্যের দাবি পূর্ণ সাম্রাজ্য নিয়ে রক্ত-গঙ্গা বহিয়ে দিল তখনই, যখন দুর্যোধন ঘোষণা করলেন, রাজ্যে অনধিকারী পাণ্ডবদের তিনি সূচ্যগ্র ভূমিও বিনাযুদ্ধে প্রদান করবেন না।

এইসব ঘটনার সাক্ষ্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হস্তিনাপুরের ওপর পাণ্ডবদের আইনত দাবি তৎকালীন রাজনীতিতে স্বীকার্য ছিল না। দেবশিবির ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই তাঁদের আপন স্বার্থ পূরণের জন্য পাণ্ডব পঞ্চককে রাজ্যাভিলাষী করেন এবং আর্যাবর্তকে নিঃক্ষত্রিয় করার দেব-অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে অগ্রসর হন। এজন্যই দেখা যায়, যুদ্ধে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন যখনই উত্থাপিত হয়েছে; পাণ্ডবরা জ্ঞাতিশত্রু নিধনের জন্য তখনই বিমর্ষভাবে নিজেদের লোভ ও ভ্রান্তির কথা স্বীকার করে অনুতাপ করেছেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠির বাকি জীবনটা প্রায় প্রায়শ্চিত্ত

করেই কাটিয়েছেন। কিন্তু দুর্যোধন সগর্বে মাথা উঁচু করে যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তেও বলে গেছেন, ভারতবাসী যেন বিশ্বাসঘাতক অন্যায়কারী পাণ্ডবদের কখনও বিশ্বাস না করে। (পর্বানুক্রমিক বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ)।

তাছাড়া আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যে সম্মান সর্বদাই প্রদর্শিত হয়েছে তাতে একথা মনে করা সম্ভব নয় যে, মহাভারতকার ধৃতরাষ্ট্রকে অন্যায়ভাবে সিংহাসনারূঢ় বলতে চেয়েছেন। বরং 'প্রজ্ঞচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র' রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছেন, এইমত শ্রদ্ধাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রতি। পাণ্ডবরা জয়ী হওয়ার পরেও জনমত নিশ্চয় ছিল ধৃতরাষ্ট্রেরই অনুকূল। তাই পাণ্ডবরা সেই বৃদ্ধ রাজাকেই রাষ্ট্রের বৃদ্ধ কর্ণধার হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছেন। কুন্তী ও বিদুর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সেবক সেবিকারূপে তাঁদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছেন লোকলজ্জায়।

এই রাজনৈতিক পশ্চাৎপটটি সামনে রেখে পাণ্ডুর পার্বত্য প্রবাসের রহস্যকথা বিচার করলে মনে হয়, দেব-আশীর্বাদধন্যা কুন্তীর পরামর্শক্রমেই হয়ত পাণ্ডু দেব-শিবিরের কোলে গিয়ে বসবাস করেন দূরপ্রসারী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। নিজ জীবনে রাজ্যের কর্ণধার হওয়ার বাসনা পূর্ণ হয়নি তাঁর। দেবপুত্র লাভ করে দেবতাদের সহায়তায় হয়ত তিনি চেয়েছিলেন পুত্রদের মাধ্যমে হস্তিনাপুরের রাজক্ষমতা করায়ত্ত করতে। কুন্তী ছিলেন কূটচক্রী ও তীব্রভাবে রাজ্যাভিলাষিণী। পাণ্ডু এই প্রথমা মহিষীটির রূপ ও বুদ্ধির দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন।

পাণ্ডবজন্ম ব্রহ্মার পরিকল্পনা। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ব্রহ্মা-রাজনীতির খেলা শুরু। ব্রহ্মাবাদী পুরোহিতরা শতশৃঙ্গ (বা পাণ্ডুকেশ্বরে ?) কুন্তীপুত্র পাণ্ডবদের বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে থাকেন। মহাভারত কাব্যে উপেক্ষিতা পাণ্ডুর দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রী সম্পর্কে এই অধ্যায়ে জানানো হয় যে, মাদ্রী স্বেচ্ছায় পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণে যান কুন্তীকে নিরস্ত করে। প্রশ্ন জাগে, প্রথমা বর্তমানে সতী হওয়ার দায়িত্বটা মাদ্রীর কপালেই বা চাপানো হল কেন ? কুন্তী যখন সহমরণে গেলেন না, মাদ্রীও তখন দুই শিশুপুত্রের জননী হিসেবে সহমরণে না গিয়ে শাস্ত্রমতেই বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু মাদ্রীর ওপর পাণ্ডুর অকালমৃত্যুর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে কুন্তী তাঁকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে পাঠালেন কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে (আদিপর্ব, কালীপ্রসন্ন / পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অ দ্রঃ) ! প্রশ্ন জাগে, কুন্তী কি সপত্নী মাদ্রীকে রাজনৈতিকভাবে সরিয়ে দিলেন ? তিনি দেবতাদের অনুগ্রহভাজন। মাদ্রী পার্বত্য প্রবাসে স্বামীহীন অসহায়। কুন্তীপুত্র তিন পাণ্ডবের

মূক দাসরূপে অতঃপর মাদ্রীপুত্রদের শুধুমাত্র আজ্ঞাপালকের ভূমিকাতেই দেখা যায়। এসবও ভাববার কথা।

ঘটনাবর্ত যে দেবচক্রান্তের পথ ধরে হস্তিনাপুরের দিকে হস্ত প্রসারিত করছিল, পরবর্তী অধ্যায়েই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। পাণ্ডুর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে নিয়ে মন্ত্রণাকারী ব্রাহ্মণরা হস্তিনাপুরে এসে উপনীত হলেন। ছেলেদের পৈতৃক রাজ্যে অংশীদার করার জন্য এই সময় ব্যগ্র কুন্তীর চিত্রটি বিষয়াসক্ত রমণীরই পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। মহাভারতকার লিখেছেন ঃ

"পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে এবং স্বদেশ গমনে নিতান্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত সর্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।"

কুন্তী চরিত্র বস্তুত চমৎকার। স্বামীর মৃত্যুতে যাঁর তখন শোকব্যাকুল অবস্থা হওয়ার কথা তিনি সপত্নী মাদ্রীকে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে পাঠিয়ে নিজে হন্তদন্ত হয়ে শ্বশুরের ভিটেয় প্রত্যাবর্তন করছেন। সঙ্গে ব্রাহ্মণরা বহে নিয়ে চলেছেন পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ। অর্থাৎ মাদ্রী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হননি। তিনি কোনো অজ্ঞাত উপায়ে প্রাণত্যাগ করে মৃত অবস্থায় স্বামীর শবদেহের সঙ্গে হস্তিনাপুরে আনীত হয়েছিলেন। মাদ্রী কী ভাবে মারা গেলেন আমরা জানি না। ব্রাহ্মণরা হস্তিনাপুরে এসে জানালেন, "পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তর প্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শব শরীরদ্বয় লইয়া… তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।" (ঐ)।

সেযুগে মৃতদেহ ময়না তদন্তের রীতি ছিল না। এযুগে এমন ঘটনা ঘটলে মাদ্রীভ্রাতা মহাবীর শল্য নিশ্চয় তদন্তের দাবি করতেন। মাদ্রীর মৃত্যু বস্তুত রহস্যজনক। জানি না, মাদ্রীর মৃত্যুর পেছনে কোনো গোপন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা। তবে দেখতে পাই, মাদ্রীভ্রাতা মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদের নিকটাত্মীয় (মাতুল) হওয়া সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন পক্ষে যোগদান করে কুন্তীপুত্রদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁর এই পক্ষপাতের রাজনৈতিক গুরুত্ব যে সামান্য নয় একথা বুঝেই শল্য সম্পর্কে মহাভারতকারকে একটি অবিশ্বাস্য গল্প খাড়া করতে হয়েছে। বলা হয়েছে, শল্য কর্ণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যই পাণ্ডবদের বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেন। কিন্তু গল্পটি যে কুন্তীর ও পাণ্ডবদের ইমেজ রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই পুরাণকারদের দ্বারা রচিত তা আমি মহাভারতীয় তথ্যের সাহায্যে গ্রন্থান্তরে আলোচনা করেছি (কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির দ্রঃ)।

নেপথ্যে দেবচক্রান্ত যে নিতান্ত ঘোরালো হয়ে উঠছিল তার সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল আরও কিছুকাল পর।

হস্তিনাপুরে পাণ্ডবরা এলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। দুর্যোধনসহ ধার্তরাষ্ট্ররাও খেলার সঙ্গী পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। মহাভারত জানান—

"…পঞ্চপাণ্ডব পৈতৃকভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।·· তাঁহারা দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন।" কিন্তু সংসারের শান্তি কিছুদিন পরেই বিঘ্নিত হতে আরম্ভ করে। কারণ ভীমসেনের দৌরাত্ম্য। ভীম অবাধে অত্যাচার করতেন খুড়তুতো ভ্রাতৃবর্গের ওপর। কুন্তী বা যুধিষ্ঠির, বিদুর বা অপর কেউ ভীমের এই নির্মমতার জন্য তাঁকে তিরস্কার পর্যন্ত করতেন না। স্বভাবতই পারিবারিক কলহের সূত্রপাত এইভাবেই ঘটিয়ে তোলা হয় ধার্তরাষ্ট্রদের তরফে বিনা প্ররোচনাতেই। কলহ যেন পাণ্ডবরাই বাধাতে থাকেন ভীমকে প্রশ্রয় দিয়ে। ক্রমে কলহের ছেলেমি রাজ্যদখলের অনুচ্চারিত অথবা জনান্তিকে উচ্চারিত লড়ায়ে সংঘর্ষে পরিণত হতে থাকল।

এমনি এক সময়ে হস্তিনাপুরে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন পর্বতবাসী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যিনি প্রকৃত অর্থে ধার্তরাষ্ট্র বা কুরু ও পাণ্ডবদের ঠাকুর্দা।

ব্যাসদেব নিভৃতে মাতা সত্যবতীকে বললেন,

> অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিত দারুণাঃ।
> শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গত যৌবনা ॥ (৬)
> বহুমায়াসমাকীর্ণো নানাদোষ সমাকুলঃ।
> লুপ্ত ধর্ম ক্রিয়া চারো ঘোরঃ কালঃ ভবিষ্যতি ॥ (৭)
> কুরুনামনরাচ্চাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি।

(আদি, সিদ্ধান্তবাগীশ)

অর্থাৎ, মা! সময় কাল খারাপ। পৃথিবী সংকট ও সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে চলেছে। ধর্ম কর্ম বিলুপ্তির পথে।

ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'কুরুদিগের দুর্নীতিপ্রযুক্ত রাজ্যশ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই সবংশে কৃতান্ত সদনে গমন করিবে। অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বিনাশ দেখিবার পরিবর্তে বনে গমনপূর্বক যোগানুষ্ঠান করুন।'

তখন সত্যবতী অন্তঃপুরে গিয়ে রাজমাতা অম্বিকাকে বললেন, 'অম্বিকে শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের (দুর্যোধনের) অত্যাচারবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্রশোকার্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি।' (আদি, কালি ১৩৩)।

চমকে উঠি এই বিবরণে। ব্যাপারটা কি? কুরুপাণ্ডব সঙ্ঘর্ষের অংকুরও তো

তখনও দেখা দেয়নি। যুধিষ্ঠির তখন বোধহয় ষোল বছরের তরুণ, ভীম ও দুর্যোধন আরও ছোট, অর্জুনকে কিশোর বললেই চলে। তখনই বেদব্যাস কুরুবংশ ধ্বংসের কল্পনা করেন কী করে? দৈবী অপ্রাকৃত ক্ষমতায়? না, সে ক্ষমতা দেবগণেরও ছিল না। খবর পাঠাতে হলে তাঁদের দূত মারফতেই খবরাখবর পাঠাতে হত। মুহুর্মুহু ভবিষ্যদ্বাণীর যে ছড়াছড়ি পৌরাণিক উপাখ্যানে, এমন কি ক্লাসিকাল কাব্যনাট্যে পাওয়া যায়, তা আসলে কবিরই সৃষ্টি। কবির কাছে তাঁর কাব্যের পরিণতি জানাই আছে, সেজন্য পরের কথা আগে জানিয়ে রাখার অসুবিধে নেই। মহাভারতে আবার পাঁচ হাতের হস্তামর্শন। মায়া সৃষ্টির জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর ঘটাপটা পরবর্তী সংযোজনায়ও রয়েছে। তাই জন্মকথার সঙ্গে জন্মবৃত্তান্তও শুরুতেই জোড়া আছে। (প্রকাণ্ড মহাভারতকে কতদূর সংক্ষিপ্ত করা যায় অনুরূপ অধ্যায় তার চমৎকার নিদর্শন)। তাই ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মহাভারতে অনেক অংশই এইভাবে পরের কথা আগে বসিয়ে চমক সৃষ্টি করা হয়েছে।

বেদব্যাসের কথায় ভবিষ্যদ্বাণী যা আছে তা গণৎকারের গণনা নয়, রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী। বেদব্যাস জানতেন কুরুবংশ ধ্বংসের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে হিমালয়ের দেবশিবিরে। সংকটমুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। তাই হস্তিনাপুর থেকে দ্বৈপায়ন তাঁর মা সত্যবতীকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

কুরুবংশ বিরূপ দেবতাদের দ্বারা ধ্বংস হবে এমন রাজনৈতিক সতর্কীকরণ ইতিপূর্বে আরও একবার শোনা গেছে। শোনা গেছে পাণ্ডব ও কুরুকুমারদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই। ধৃতরাষ্ট্রের সহায় দেবানুচর বিদুর তাঁর ব্রাহ্মণবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়ে রাজাকে পুত্রত্যাগের পরামর্শ দেন। বলেন, দুর্যোধনকে ত্যাগ করে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সাম্রাজ্য দান করা না হলে কুরুবংশ মহা বিনাষ্টির সম্মুখীন হবে। জন্মমাত্রই দুর্যোধনকে পাপিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন ব্রাহ্মণরা এবং দুর্যোধনের জন্মসময় কুলক্ষণাক্রান্ত বলে মানুষের কুসংস্কারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু জন্মমাত্রই মানুষের পাপ পুণ্যের হিসেব হয় না। দুর্যোধনের জন্মসময় যদি কুলক্ষণাক্রান্ত হয়ে থাকে তবে একেই যুক্তিতে বলা যায়, ভীমের জন্মসময়ও ছিল অলক্ষুণে। কারণ ভীম ও দুর্যোধন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। বিদুর বাহিনী কিন্তু সেখানে মহা বিনষ্টির কোনো পূর্বাভাসই দেখতে পান নি। চাপ সৃষ্টি করেছেন দুর্যোধনের জন্মমাত্র নির্বাসনের জন্য। বিদুরের মাধ্যমে প্রকটিত কুটিল দেবরাজনীতির আরও পরিণত রূপ দেখা গেল অতঃপর বেদব্যাসের আচরণে। বিদুর ও বেদব্যাসের এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে দৈবী জ্ঞান অথবা নিপুণ গণৎকারের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী কোনটাই ছিল না। মহাভারতের পর্বানুক্রমিক বিশ্লেষণে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আসলে একগুঁয়ে ধৃতরাষ্ট্রের দোর্দণ্ড প্রতাপকে দেব ও ব্রাহ্মণগোষ্ঠী ভালো চোখে দেখছিলেন না। পাণ্ডুকে বনে পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে বসেছেন। রাজার প্রতাপ বাড়ছে ব্রাহ্মণদের ওপর। তাছাড়া ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণবর্গকে খুব মান্য গণ্য করতেন বলে মনে হয় না। দেবশিবিরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল না, অথবা তিনি তা রাখতেন না। ব্রাহ্মণ ও দেবশিবির ক্রমেই তাই শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র পুরুবংশীয় রাজা উপরিচর বসুর প্রতাপবৃদ্ধিকালে বসুরাজকে একটি বিমান উপহার দিয়ে যে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন তার বিনিময়ে হিমালয়ে দেবশিবির অনাক্রমণ চুক্তির আশ্বাস পেয়েছিলেন। উপরিচর বসু ইন্দ্রের পরামর্শে এবং সম্ভবত সহায়তায় চেদীরাজ্য জয় করে ইন্দ্রদত্ত বিমানে চেপে সুখে বিহার করেছেন (ইনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরবশ রাজা এবং সত্যবতী এঁরই অবৈধ সন্তান। 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। রাজা বসু ইন্দ্রপূজারও প্রচলন করেন। ইন্দ্রের দেবশিবির ও দেবানুগৃহীত ব্রাহ্মণরা তারপর নিশ্চিন্তে ও সুখেই বাস করছিলেন পূজাপ্রণামী আদায় করে। সম্ভবত ধৃতরাষ্ট্রের সময় থেকে তাঁদের সেই নিশ্চিন্ত সুখের দিনে অশান্তির সূত্রপাত ঘটে থাকবে। সেজন্যই বেদব্যাসের উক্তি, ধর্মকর্ম লোপ পেতে বসেছে। 'এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই, দিন দিন পাপ বৃদ্ধি হইতেছে।'

এমন আশঙ্কা সত্যিই অদ্ভুত! আশঙ্কা হয়ত, ধৃতরাষ্ট্রের রাজত্বে আঘাত আসছে দানযজ্ঞভোগী ব্রাহ্মণদের ওপর। দানযজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হলে রাজকোষের বিরাট সহায়তায় তাঁদের নিশ্চিন্ত পরশ্রমভোগী জীবনযাপন আর সম্ভব হবে না। ব্রাহ্মণের সঙ্কট দেবশিবির চান না। তাঁরা বহিরাগত। দেশীয় ব্রাহ্মণদের ওপর তাঁরা নির্ভরশীল। ব্রাহ্মণরা তাঁদেরই শক্তিতে পুষ্টিলাভ করে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের মধ্যে দেবতাদের জন্য ভয়ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়ান। মহাভারতে এই ব্রাহ্মণদেরই সর্বোত্তম চর বা 'স্পাই' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সর্বত্রই এঁদের অবাধ গতি। মানুষের মনে মোহজাল ও দৈবীনির্ভরতার কুসংস্কার তৈরী করতেও এঁদের জুড়ি নেই। দেবতারা তাই এঁদের মাধ্যমে দেবশিবিরের প্রতিষ্ঠা টিকিয়ে রাখার পরিকল্পনা করেছেন। শুধু ভারতেই নয়, বহিরাগতরা যে পুরোহিত সমাজকে দেশীয় শক্তির বিপক্ষে প্রধান মানবিকযন্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন তা মিশরসহ সর্বত্রই ঘটেছে সেই পুরাযুগে। আর পুরোহিত মানেই তো দেবস্তাবক, তাঁরা সেই বহিরাগত আন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তির চর, প্রচারক ও উকিল। তাঁদের ব্যবস্থা না করলে বুদ্ধিমান সেই দেবতাদের মনোমত তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপনা খুবই শক্ত কাজ হতো। কারণ,

তৎকালীন রাজশক্তিও কম ক্ষমতাবান ছিল না। দেবশিবিরকে তাঁরা উদ্‌বাস্তু করে তুলতেন ক্ষণে ক্ষণেই।

দেবতাদের অসুবিধা ছিল হয়ত প্রধানত দুটি, এক তাঁরা প্রচুর লোকবলে (স্বজাতীয়) বলীয়ান ছিলেন না; দুই, পার্বত্য উপত্যকা থেকে সমতলের আবহাওয়ায় তাঁদের পক্ষে প্রাকৃতিক কারণেই থাকা হয়ত সম্ভব হত না। তাই দুনিয়ার যেখানেই দেবতাদের কথা, সেখানেই তাঁদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি পর্বতের ওপর অবস্থিত ছিল বলেও কথিত। বুদ্ধিমান ও অমিত বৈজ্ঞানিক শক্তির অধিকারী হলেও লোকবলের অভাবেই সম্ভবত তাঁদের মর্ত্যজনের সঙ্গে সন্ধিমৈত্রী স্থাপনার প্রয়োজন হয়েছে। এজন্যই হার হয়েছে অসুর দানব রাক্ষসদের হাতে, যারা মানুষই, কিন্তু দেবশত্রু হিসেবে যাঁদের ভয়ঙ্কর নামে দূষিত করেছেন দেবানুগৃহীত পুরোহিত সমাজ। ধৃতরাষ্ট্র এবং কুরুশিবিরের বহু বীরকেও মহাভারত অসুর অর্থাৎ দেববিরোধী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তাই বলছিলাম, সংকট একটা ঘনিয়ে আসছিল। ওদিকে ক্রমেই সমগ্র আর্যাবর্তে কুরুদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের রক্ষক তখন ভীষ্মের মত বীরশ্রেষ্ঠ। তাই অসম্ভব নয়, বুদ্ধিদাতা ব্রহ্মার সভায় দেবব্রাহ্মণদের গোপন চক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রীয় শক্তির পতন ঘটিয়ে আর্যাবর্তে চূড়ান্তভাবে একটি দেবানুগৃহীত শাসন ব্যবস্থা পত্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেইমত কাজও শুরু হয়ে যায়।

দেবতারা অনেক ভুগেছেন। মর্ত্যের মিত্রশক্তি চুক্তিভঙ্গ করে বহুবার সেই বহিরাগতদের উৎখাত করতে চেয়েছে, অস্বীকার করেছে প্রাধান্য। এবার আর একই ভুলের পুনরাবৃত্তি নয়: স্বয়ং দেবপুত্রদের হাতেই তুলে দিতে হবে কুরুরাজ শক্তি। দেবানুচর দুর্বাসার মাধ্যমে তাই খোঁজ শুরু হয়েছিল একটি প্রকৃত দেবদ্বিজে ভক্তিমতী চতুর রাজপুত্রীর। সন্ধান এনেছিলেন দুর্বাসা কুন্তিভোজগৃহে পালিতা রাজপুত্রী কুন্তীর। মেয়েটির নির্বাচন যে অনর্থক হয়নি, মহাভারতে তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বলতে গেলে বিদুরসহ কুন্তী আজীবন পাণ্ডবপক্ষের মূল্যবান কূটনৈতিক ব্রেন বা মস্তিষ্কের কাজ করেছেন।

কুন্তীকে পাণ্ডুপত্নী হিসেবে নির্বাচিত করার প্রশ্নেও সোৎসাহে সম্মতি জানিয়েছিলেন দেবানুরক্ত ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীনেতা বিদুর মহারাজই। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ, আর সেই সুবাদে কুরু সিংহাসনের ওপর দাবিদার খাড়া করা হয়েছিল পাণ্ডুকে। সম্ভবত এই চক্রান্ত মোকাবিলা করার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে পাণ্ডুকে রাজ্য ত্যাগে বাধ্য করেন। হস্তিনাপুরে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয় তখন থেকেই। দেবতা ও তাঁদের স্তাবক ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিদুরের নেতৃত্বে আরম্ভ করে দেন গোপন চক্রান্ত। কুন্তীকে আগেই পাণ্ডুপত্নী বানানো হয়েছে। পাণ্ডুকে

রাজ্যচ্যুত করা হলে ব্রাহ্মণরা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান হিমালয়ে, দেবশিবিরের রক্ষণাবেক্ষণে। তাঁরা হয়ত চেয়েছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-প্রাসাদের কড়া পাহারার বাইরে এনে কুন্তীগর্ভে দেবপুত্র উৎপন্ন করতে ও সময়মত তাঁদের ব্যবহার করতে। সন্দেহ হয়, ঘটনাটা ঘটেছে সেই পরিকল্পনা মাফিক। ধৃতরাষ্ট্র শক্তিমান জবরদস্ত রাজা। আর্যাবর্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজন্যবর্গও দেববিরোধী (কুরুক্ষেত্রে সমবেত রাজশক্তিজোটের মানচিত্রটি চোখের ওপর রাখলে দেখা যায়, তামাম আর্যাবর্ত কুরু শিবিরেই যোগ দেন। বহু বিমুগ্ধ প্রচার সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বন্ধু ছিলেন পাঞ্চালসহ কেবলমাত্র মধ্যদেশীয় কয়েকটি রাজ্য)। এ হেন রাজনৈতিক পরিবেশে দেবব্রাহ্মণদের খুবই সাবধানে অগ্রসর হতে হয়েছিল এবং প্রয়োজন ছিল পাণ্ডবদের পক্ষে জনমত সংহত করা। তাই সময় লেগেছে। বহুকাল ভুগতে হয়েছে পাণ্ডবদের। শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলী খেলিয়ে তোলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেজন্য আর্যাবর্তকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করতে হয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডব পাঞ্চালদের শিখণ্ডী রেখে আর্যাবর্তে দেবব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে এনেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি দেবব্রাহ্মণরা। ভবিষ্যতের নিশ্চিন্তির জন্য যুদ্ধের পরেই দেব-শিবির তাঁদের প্রদত্ত অস্ত্রাদি ফিরিয়ে নিয়েছেন পাণ্ডবদের কাছ থেকে। অস্ত্রহীন অর্জুন তখন সামান্য দস্যুর হাতেও পরাজিত হয়েছেন। অর্থাৎ রাজশক্তিকে পুরোপুরি দেবশিবির ও ব্রাহ্মণ-মুখাপেক্ষী দুর্বল তাঁবেদার শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে।

এই রাজনৈতিক কুটিলাবর্তের প্রেক্ষাপটে বেদব্যাসের কুরুবংশ নাশের ভবিষ্যৎ-বাণী খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি, এ তাঁর কথা নয়। এ সেই কুটিল চক্রান্তেরই পূর্বাভাস।

রাজা হিসেবে যুধিষ্ঠিরের নির্বাচনও যৎপরোনাস্তি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ব্রাহ্মণদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভক্তি আবাল্য। জন্ম, মুনি পরিবৃত শতশৃঙ্গ পর্বতে। প্রাথমিক শিক্ষাও সেখানেই। ওদিকে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের দ্বিজভক্তি আদৌ লোকবিশ্রুত নয়। যুধিষ্ঠির তাই বিদুরের বড় প্রিয়পাত্র। প্রিয় সকল দ্বিজবরের। যুধিষ্ঠির সর্বদা ব্যগ্র থাকতেন ব্রাহ্মণ সেবায়। বনবাসে থাকাকালে হস্তিনাপুর থেকে কেউ খোঁজ খবর নিতে এলে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করতেন, ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি যে নিষ্কর জমিজায়গা ও রাহা খরচের ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, দুর্যোধন সে সব যথাযথ বজায় রেখেছেন তো? অর্থাৎ, দুর্যোধন কি অলস ব্রাহ্মণদের জন্য প্রজাশোষিত রাজকোষের অপব্যয়ে যুধিষ্ঠিরের মতো সোৎসাহী ছিলেন না? তাই কি ব্রাহ্মণ সমাজের প্রচণ্ড রাগ তাঁর ওপর? তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হলেই তাঁরা আক্রোশে ফেটে পড়তেন। পাপিষ্ঠ ও দুরাত্মাই তো ছিল দুর্যোধনের

পরিচয়বোধক বিশেষণ। মহাভারত রায় দিয়েছেন, এ মানুষ কলির অংশে জাত অনাচারী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই, ব্রাহ্মণের আক্রোশ দুর্যোধন শিবিরে যোগদানকারী আর্যাবর্তের কোনো রাজাকেই ছেড়ে কথা বলেনি। জন্মকুলজিতে দেখা যায়, যিনিই দুর্যোধনমিত্র, মহাভারতীয় কবিরা তাঁকেই রাক্ষস ও দানবের অংশে জাত বলে প্রচার করেছেন। অন্যদিকে পাণ্ডব শিবিরের মিত্রপক্ষ নির্বিচারে প্রত্যেকেই মহাত্মা। বিষয়টি সরলভাবেই বুঝিয়ে দেয়, কারুকে দেব বা দানবের অংশজাত অবতার বানানোর পেছনে সেদিন কোন্ কূটনীতি নেপথ্যে সক্রিয় ছিল।

এসব কারণে বহুদিনের সতর্ক প্রস্তুতির পর কুরুক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ ঘটে গেছে, তৎকালীন রাজশক্তি বনাম বহিরাগত দেবশক্তির মধ্যে। দেবতারা রইলেন তাঁদের সুরক্ষিত হিমালয় দুর্গে বসে। সমতলবাসী কৃষ্ণার্জুনসহ পাঞ্চালদের লড়িয়ে দিলেন তাঁরা সে যুদ্ধে। সেই দেবপাণ্ডব শিবিরের চর (স্পাই) ও প্রচারকরূপে পাণ্ডবদের অনুকূলে বুদ্ধিজীবী দালালশ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন তৎকালীন মহর্ষিগণ। এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন ব্যাসদেবও। তাই নিজের মাকে আগে-ভাগেই সরিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি সমস্ত গণ্ডগোলের কেন্দ্রস্থল হস্তিনাপুর থেকে। মহাভারতে বেদব্যাস দুর্বাসা বিদুর প্রমুখের প্রতিষ্ঠা দেবশিবিরের চর হিসেবেই।

এমন এক বেদব্যাসের পরিচয়টি আমাদের মনে রাখা দরকার। কে তিনি ? কেন তাঁর এই শশব্যস্ত আগমন ? মহাভারতের ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁর ভূমিকা কেমন ?

বেদব্যাস বলতে আমরা বেদবিভাগকারী মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেই বুঝি, যিনি মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে একটি নির্জন দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মাবধি দ্বৈপায়ন কোথায় ছিলেন, কী করেছেন তা জানানো হয়নি। আমরা শুধু জানি, ব্যাসদেবের কর্মস্থল ছিল হিমালয়ে। তিনি আসতেন হিমালয় থেকে, ফিরেও যেতেন সেখানেই (বদ্রীকাশ্রমের অদূরে ব্যাসদেবের গুহা আছে)। তাছাড়া আমরা জানি যে, হিমালয়ের বদ্রীনাথ চৌখাম্বা অঞ্চলে ছিল মহাভারতীয় দেবগণের শিবির। হিমালয় জুড়ে তাঁদেরই আধিপত্য তখন। যেসব মুনিরা এই দেবশিবিরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন, সম্ভবত বৈজ্ঞানিকবিদ্যায় উন্নত বুদ্ধিমান সেই দেবতারূপী নভশ্চরগণ তাঁদের দিতেন জ্ঞানচক্ষু ও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক শক্তি। তারই বলে বলীয়ান হয়ে যখন তাঁরা নেমে আসতেন, তখন কেউ দেবর্ষি কেউ মহর্ষি। প্রচণ্ড ক্ষমতা। রাজন্যবর্গের ত্রাসের কারণ। আজ হিমালয়ে বসে হাজার মাথা খুঁড়লেও কিন্তু সে ক্ষমতা লাভ করা যায় না।

দেবশিবিরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী ব্যাসদেব দুর্বাসার মত ত্রাস সৃষ্টি করে কুখ্যাত হননি. জ্ঞানার্জন করে হয়েছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। দেবমানব সম্পর্কিত ইতিকথা তিনিই গ্রন্থনা ও রচনা করেন। সে যুগের বেদবিভাগকারী তাত্ত্বিকরূপেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন মহর্ষি বেদব্যাস। তিনি লাভ করেন, বুদ্ধিমান বহিরাগত দেবতাদের আশীর্বাদ।

মনু ইন্দ্র দেবতা ও সপ্তর্ষিদের মত বেদবিভাগকারী বেদব্যাসগণও ছিলেন বিভিন্ন। পরাশর উক্ত বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণদ্বৈপায়নসহ অষ্টাবিংশ বেদব্যাসের নাম আছে। বৃহস্পতি ছিলেন চতুর্থ, বশিষ্ঠ অষ্টম, ঊনবিংশ বেদব্যাস ভরদ্বাজমুনি, ষড়বিংশ হলেন দ্বৈপায়ন-পিতা পরাশর এবং জাতুকর্ণের পর অষ্টাবিংশতি বেদব্যাস পদের মর্যাদা লাভ করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বলা হয়েছে ঃ

> জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
> অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ॥৩।৩।১৯

অর্থাৎ দেবশিবিরের সঙ্গে বেদব্যাসের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনিই পাণ্ডব জয়গাথা মহাভারত রচনা করেন। উত্তম ঐতিহাসিক এবং উত্তম প্রতিবেদন রচনাকারী হিসবে তো বটেই, ব্রহ্মার পরিকল্পনা রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যও বেদব্যাস পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বয়ং নারায়ণরূপে সম্মানিত হয়েছেন। পরাশর মৈত্রেয়কে বলছেন ঃ

> কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
> কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৩।৩।৫

অর্থাৎ, "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে, নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে ?" ('আর্যশাস্ত্র সং থেকে অনুবাদ অংশ গৃহীত)।

সেকালে দেবপ্রয়োজন সাধন করলেই মহর্ষি দেবর্ষি আখ্যা লাভ করা যেত। দেবস্বার্থ যিনি পূরণ করেন পদোন্নতির সময় তাঁর জাতবিচার করা হত না। ক্ষত্রিয় ভাববাদী বুদ্ধিজীবীও দেবতার প্রসাদে লাভ করতেন ব্রাহ্মণত্ব।

দেবতার ঔরসে ক্ষত্রিয় নারী কুন্তীর গর্ভে জন্মলাভ করেও যেক্ষেত্রে দেবশিবিরের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করায় (পাণ্ডবরা ছিলেন দেবশিবিরভুক্ত) কর্ণ আজীবন সূতপুত্র হিসেবে অভিশপ্ত রহে গেলেন; সেখানে দেবশিবিরের কাছের লোক হওয়ায় মানব পরাশরের ঔরসে ধীবর কন্যা অনূঢ়া মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভজাত হয়েও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিন্তু সম্মানিত হয়েছিলেন প্রভু নারায়ণের সমগোত্রীয় রূপে। দুজনেই কানীন পুত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রতাপদুষ্ট সমাজে দুজনের অধিকার ছিল

দুরকম। এসবই কূট রাজনীতি। এর সঙ্গে ধর্মাধর্মের সম্পর্ক নেই। দেবতারা তাঁদের অনুগতদের সর্বত্রই এইভাবে পয়গম্বর বানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত বাইবেলীয় পয়গম্বর মোজেসের কাহিনী লক্ষ্য করলে একই দেব-রাজনীতির চেহারা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

মোজেস বা মোশি ছিলেন মিশরে প্রবাসী ইস্রায়েলীপুত্র লেবির বংশধর। মোজেসের আমলে প্রবাসী ইস্রায়েলীদের ওপর মিশর রাজ ফরৌণ ছিলেন খড়্গহস্ত। মিশরে প্রবাসী ইস্রায়েলীরা দলে ভারি হয়ে উঠছে দেখে ফরৌণ ইস্রায়েলীদের সমস্ত নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের দাসে পরিণত করেন এবং আদেশ দেন ইস্রায়েলী পুত্র জন্মাবামাত্র তাকে বধ করতে হবে। দাস্য কর্মের জন্য কেবলমাত্র তাদের নারীসন্তানকে জীবিত রাখা হবে। মোজেসের জন্ম হলে মোজেসজননী সুন্দর শিশুপুত্রটিকে রাজকোপ থেকে রক্ষা করার মানসে জলে ভাসিয়ে দেন। সৌভাগ্যত এই শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন স্বয়ং ফরৌণ-কন্যা রাজকুমারী। বড় হয়ে মোজেস ইস্রায়েলীদের ওপর অত্যাচারকারী এক মিশ্রীয় পুরুষকে হত্যা করে মিদিয়ন দেশে পালিয়ে যান। সেখানে এক-মিদিয়নীয় যাজকের কন্যার পাণিগ্রহণ করে শ্বশুরের মেষপাল চরাতেন। এ হেন মোজেসের কোনও সাধনভজন বা আধ্যাত্মিক উত্তরণের কথা বলা হয়নি। ঈশ্বর বা সদাপ্রভু নিজের প্রয়োজনেই মোজেসকে পয়গম্বর বানিয়েছিলেন। মোজেসের ইতিহাস বলে, ঈশ্বর স্বয়ং এসেছিলেন মোজেসের কাছে। সে ঘটনা এই রকম ঃ—

"একদা তিনি (মোজেস) প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষপাল লইয়া…হোরেবে, ঈশ্বরের পর্বতে উপস্থিত হইলেন।"

হ্যাঁ, হিন্দু দেবতাদের মত ইস্রায়েলী লর্ড গড সদাপ্রভুও থাকতেন পর্বতে। সেখানে "ঝোপের মধ্য হইতে অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিলেন ; তখন তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তথাপি ঝোপ বিনষ্ট হইতেছে না।" যাত্রাপুস্তক বাইবেল ৩/৩। ভারি অবাক কথা বটে। তাই কৌতূহলী মোজেস লুকিয়ে লুকিয়ে সব দৃশ্য দেখছেন। দেখছেন আগুনটা কেমন যা দগ্ধ করে না ? মোজেস তো বটেই আমরাও ভাবছি সেকথা। তবে মোজেস যতটা বিস্মিত বোধ করেছিলেন সেকালে. আমাদের তেমন ভাবে হতভম্ব করা বোধহয় ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব নয়। কারণ বাইবেলীয় বিবরণেই জেনেছি সদাপ্রভুর সঙ্গে সর্বদাই তাঁর উড়ন্ত যানটি থাকত যার থেকে অগ্নি ও ধূম উদগীর্ণ হত। সুতরাং আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মোশিদৃষ্ট অগ্নি ছিল ঐ যানেরই আলোকছটা তা অগ্নি নয়। কিন্তু তৎকালীন এক মেষপালক স্বাভাবিকভাবেই সে দৃশ্যে ভীত হয়েছিলেন।

ঝোপের মধ্যে আত্মগোপনকারী বহিরাগত সদাপ্রভু মোশির সন্ত্রস্তভাব লক্ষ্য করে মোশিকে অভয় দিয়ে বললেন, "এ স্থানের নিকটবর্তী হইও না, তোমার পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল, কেননা উহা পবিত্র ভূমি।"

সদাপ্রভু আরও বললেন, "আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।" (৩ / ৬)।

সেকালের দেহধারী দেবতা ঈশ্বররা এমনিই গোষ্ঠীপ্রভু ছিলেন। দুজন তিনজন মানুষকে তাঁরা বাছাই করে নিতেন এবং তাঁদেরই ঈশ্বর হয়ে বসতেন। মোজেসকে দেখা দিয়ে পর্বতবাসী ঐ পুরুষ সমগ্র ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর হয়ে বসলেন ক্রমশ। তিনি চুক্তি করলেন মোজেসের সঙ্গে। বললেন, মোজেসকে তিনি তাঁর 'ভাববাদী' প্রতিনিধি নিযুক্ত করছেন। মোজেস হবেন ইস্রায়েলীদের সংগঠক এবং তিনি সদাপ্রভুর নির্দেশমত মিশর রাজের সেই দাসজাতিকে মুক্ত করবেন। 'প্রজাদের' নেপথ্যে থেকে প্রভু সব রকম সাহায্য করতেন। সদাপ্রভু ইস্রায়েলীদের 'প্রজারূপে' গণ্য করতেন।

সদাপ্রভু বললেন, "তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, সদাপ্রভু, তোমাদের পিতৃপুরুষের ঈশ্বর···আমি মিশরের কষ্ট হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কনানীয়দের, হিত্তীয়দের, ইমোরীয়দের, পরিষীয়দের, হিব্বীয়দের ও যিবুষীয়দের দেশে, দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে, লইয়া যাইব।"

অজ্ঞাত-পরিচয় উন্নত শক্তিধর ঈশ্বরের সেদিন এইভাবে নিঃস্ব রিক্ত এক এক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাঁদের বানিয়েছিলেন ভূসম্পত্তির মালিক এবং তাঁদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা তাঁদের প্রভুত্ব। প্রতিনিধিস্থানীয় 'ভাববাদী' পৃথ্বীপুরুষরা এই ঈশ্বরদের কাছ থেকে অপার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীতে অপ্রচলিত শক্তির অধিকারী হয়ে মানুষের বিস্ময়, ভক্তি ও ভীতি অর্জন করে হয়েছিলেন গোষ্ঠী দেবতার দূত বা পয়গম্বর। আমাদের দেশেও এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছেন দেবর্ষি মহর্ষিরা। এ'দের কার্যসমূহ বিচার করলে দেখা যায় এ'রা ছিলেন সেকালের রাজনৈতিক নেতা। সাধন ভজন নয়, রাজনীতি, জ্ঞানবিদ্যা, বিজ্ঞানচর্চা ও রাজনীতিই ছিল তাঁদের মুখ্য কর্ম। তাঁরাই ধর্ম নামক সামাজিক বিধিনিয়মের প্রবর্তক হয়েছেন। ভারতে তাঁরা ভগবান বা অংশবান রূপে কীর্তিত।

ঈশ্বর মোজেসকে বলেছিলেন, "তুমি মিশর হইতে লোকসমূহকে বাহির করিয়া আনিলে পর তোমরা এই পর্বতে ঈশ্বরের সেবা করিবে।"—এই ভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা।

সদাপ্রভু যে কেবলমাত্র মোশির ধ্যানলব্ধ ঈশ্বর নন, তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব সেদিন সকল ইস্রায়েল সন্তানদের সামনেই প্রকটিত হয়েছিল, যাত্রাপুস্তকে সে বিবরণও

যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে। মিশর থেকে পলায়নপর ইস্রায়েলী দাসদের পিছু ধাওয়া করে ফ্যারাও বা ফরৌণের সেনা বাহিনী। প্রবল পূর্বীয় বায়ু বহিয়ে সদাপ্রভু সমুদ্র শুষ্ক করে দেন ও তাঁর প্রজাদের পালাতে সাহায্য করেন। তিনি সর্বদাই তাঁদের মাথার ওপর রক্ষকের ভূমিকায় তাঁর বিশেষ উড়ন্ত যানে উড্ডীন ছিলেন। সদাপ্রভুর উড়ন্ত যানটিকে সকলেই দেখেছিল। মোশি ছাড়া সেই যান দর্শনে অন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বিবরণটি এই রকম ঃ

"তখন সমস্ত লোক মেঘ গর্জন, বিদ্যুৎ, তুরীধ্বনি ও ধূমময় পর্বত দেখিল ; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহারা মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা বল। আমরা শুনিব ; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না-বলুন, পাছে আমরা মারা পড়ি। মোশি লোকদিগকে বলিলেন, ভয় করিও না ; কেননা তোমাদের পরীক্ষা করণার্থে ...আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুর্গোচর করণার্থে ঈশ্বর আসিয়াছেন।" (যাত্রাপুস্তক / ২০ / ১৮)।

ঈশ্বর দর্শন সম্পর্কে মানুষের এই নির্লিপ্ত অকল্পনীয়। ঈশ্বর যেন তৎকালীন পুরুষদের মধ্যে বিচরণশীল কোনো আগন্তুক। যাঁর দর্শনে মানুষের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে যায়নি। এ ঘটনাটি বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক। বস্তুতপক্ষে পৌরাণিক এই ঈশ্বরকে বহুভাবে তাঁর প্রজাদের কাছে নিজের মহিমা ও শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছে। রক্ষা যেমন করেছেন, তেমনি চোখও রাঙিয়েছেন। কেননা সেই ঈশ্বর বলেন, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর।" (ঐ / ২০ / ৫)।

এমন উদযোগী ঈশ্বরই শুধু গর্জনকারী, ধূম ও অগ্নিপুচ্ছ নির্গমনকারী উড়ন্ত রথে চড়ে আপন অনুগত বাহিনীকে রক্ষা করেন। পরমেশ্বর সকলেরই রক্ষক, তাঁর কোনো প্রজাগোষ্ঠী নেই। তিনি নিজেকে উদ্যোগী ঈশ্বর বলে প্রচারও করেন না। আসলে ঈশ্বর শব্দটির সৃষ্টিও দেহবান দেবতাদের আবির্ভাবের পরেই হয়েছিল।

সদাপ্রভুর যানটিকে বাইবেলে মেঘস্তম্ভ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। যান্ত্রিক উড়ন্ত যান ধূম উদগীরণ করে, সম্ভবত তারই থেকে এই নামকরণ। তাছাড়া সে যান মেঘময় আকাশপথে আসা-যাওয়া করত এবং তার আসা যাওয়ার পথে মেঘ ঘর্ষণের শব্দ শ্রুত হত। সদাপ্রভুর এই যানটিকে ইজেকিয়েল প্রমুখরা দেখেছেন এবং তার বর্ণনা রেখে গেছেন। যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে। এখানে আর একটু উদ্ধার করি।

"মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত সম্মুখাসম্মুখী হইয়া আলাপ করিতেন।" (যাত্রা / ৩৩ / ১১)।

সদাপ্রভু তাঁর উড্ডীন যানে প্রায়ই ইস্রায়েলী তাঁবুর কাছে এসে নামতেন। মোশি যেতেন তখন প্রভুর বিশেষ তাঁবুতে।

"মেঘস্তম্ভ নামিয়া তাম্বুর দ্বারে অবস্থিতি করিত ; এবং [সদাপ্রভু] মোশির সহিত আলাপ করিতেন। সমস্ত লোক তাম্বুর দ্বারে অবস্থিত মেঘস্তম্ভ দেখিত ও সমস্ত লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুর দ্বারে থাকিয়া প্রণিপাত করিত।"

সদাপ্রভুর প্রতাপ দর্শনে ভীত ইস্রায়েলীরা ঈশ্বরের সঙ্গে সদালাপী মোশিকেও সদাপ্রভুর মতই ভয় করতে শিখেছিল, কেননা পর্বতে উঠে মোশি নোতুন নোতুন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ফিরতেন এবং প্রজাগণের মধ্যে প্রভুর আদেশ প্রচার করতেন। লোকেরা জানতেন সেই অমোঘ আদেশ অমান্য করার অর্থ নির্মম শাসক সদাপ্রভুর রোষে মৃত্যু।

এভাবেই মোশি ক্রমশ ভাববাদী পয়গম্বর হয়ে ওঠেন। সদাপ্রভু স্বয়ং ভাববাদী প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। আর ঠিক এভাবেই দেবতাদের প্রচারে নেমেছিলেন ভারতীয় বেদব্যাসগণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আমলে দেবতাদের বিশ্বস্ত ভাববাদী প্রচারক ছিলেম আঠাশ নম্বর বেদব্যাস পরাশরপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কিন্তু তাঁর নিযুক্তির সংবাদ বাইবেলীয় পয়গম্বর মোশির নিযুক্তি সংবাদের মত সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় পুরাণেতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। মহাভারত জুড়ে দ্বৈপায়নের কর্মকীর্তিই এ ক্ষেত্রে কার্যকারণগত প্রমাণ।

সত্যবতীকে হস্তিনাপুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর হিমালয় শিবিরের গোপন রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে বেদব্যাসের পুনরাগমন ঘটে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার পর।

পাণ্ডবরা তখন বনবাসী। বাস করছেন কাম্যক বনে। এমনি সময় একদিন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আগমন ঘটল পাণ্ডবালয়ে। মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে একান্তে ডেকে কিছু রহস্যময় শলাপরামর্শ করে বিদায় নিলেন। মহর্ষি প্রত্যাগমন করলে জনান্তিকে অর্জুনের সঙ্গে কূটমন্ত্রণায় বসলেন প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, যিনি ইতিমধ্যেই দেবব্রাহ্মণের দ্বারা আর্যাবর্তের ভবিষ্যৎ সম্রাট রূপে মনোনীত, পুরোহিত বাহিনীর মুকুটহীন রাজা। যুধিষ্ঠির বললেন, পাণ্ডবদের বনবাসকালের সুযোগে দুর্যোধনশিবির আরও ক্ষমতা সঞ্চয় করতে পারবে। তাই পাণ্ডবদেরও এখন চুপচাপ বসে থাকার অবসর নেই। শক্তি সঞ্চয় তাঁদেরও করতে হবে। জানালেন, মহর্ষি ব্যাসদেবের কাছ থেকে তিনি (যুধিষ্ঠির) যে রহস্যবিদ্যা জেনেছেন তা

জানা থাকলে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি সেই বিদ্যা খুবই গোপনে অর্জুনকে দান করবেন (বন, পৃঃ ৪০-৪১—কালীপ্রসন্ন. সাক্ষরতা প্রকাশন. ১ম সংস্করণ)।

যুধিষ্ঠির যে গোপন রহস্যবিদ্যা অর্জুনকে দান করলেন, তা গূঢ় কুটনীতি মাত্র। বললেন, বেদব্যাস-প্রদত্ত সংবাদ হল, দেবতারা দেবানুগৃহীত রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অর্জুনকে মনোনয়নে উৎসুক। বললেন, তুমি শীঘ্র হিমালয়ে গিয়ে তপস্যার দ্বারা তাঁদের তুষ্ট কর। কিন্তু সাবধান, তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কাক-পক্ষীতেও যেন জানতে না পারে ('কাহাকেও পথ-প্রদান করিও না')। যুধিষ্ঠিরের কাছে যে গোপন বার্তা এসেছিল তাতে এ বিষয়েও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, অর্জুন দেবগণের মনোনয়ন লাভ করলে কী পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য পেতে পারেন। তাই যুধিষ্ঠির আরও খোলসা করে বললেন, "পূর্বে দেবগণ বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্ররূপ সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি একস্থানস্থ (একই জায়গায়) সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন কর, তিনিই তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিবেন।"

যুধিষ্ঠির খুবই ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ধূর্ততা সরলতার আবরণে আবৃত থাকত। তিনি খবর পাওয়ামাত্র আর এক তিল দেরি করা পছন্দ করলেন না। কেননা, তিনি জানতেন, হিমালয়ে শত্রুপক্ষের চরও যাতায়াত করেন (হিমালয়ে যা ঘটেছিল পরে চরমুখে ধৃতরাষ্ট্র সে সংবাদ পেয়েছিলেন)।

যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাত এই রহস্যবিদ্যা তৎকালীন ক্ষমতাসীন ঋষি ও দেবানুগৃহীত রাজন্যবর্গের শক্তির গোপন উৎস ছিল।

আকাশচারী দেবতারা নিজেরাই গোপনীয়তা পছন্দ করতেন। তাঁদের স্তাবক পুরোহিতরাও মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা তৎকালীন বিজ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত ম্যাজিক করে রেখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানহীন মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম তো ম্যাজিকই। পি, সি, সরকারের অনেক বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক বিজ্ঞানের ছাত্ররাও চট করে ধরতে পারতেন না। বিজ্ঞান নিয়ে ম্যাজিকের বই পড়লে চমৎকার সব খেলা নজরে আসে।

যাইহোক, যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের নির্দেশানুসারে অর্জুনকে রহস্যবিদ্যা প্রদান করে বলেছিলেন, তুমি আজই ইন্দ্র সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়। দেরি করা ঠিক হবে না। এবং বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, খুব সাবধান, কেউ যেন তাঁর উদ্দেশ্য জানতে না পারে। [বনপর্ব, পৃঃ ৪০-৪১ দ্রষ্টব্য]।

এই ঘটনা আমাদের কী অবস্থার কথা জানায় ? বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কি একটি লৌকিক যুদ্ধ প্রস্তুতির ছবি ? বিতাড়িত পাণ্ডবরা যাচ্ছেন এক আন্তর্নাক্ষত্রিক

শক্তির কাছে অস্ত্র সংগ্রহ করতে। যে শক্তি এই অস্ত্রাদি দান করবেন, তাঁদের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ আগেই হয়ে গেছে। মধ্যস্থতা করছেন স্বয়ং ব্যাসদেব। হিমালয়ে গিয়ে ইনি দেবতাদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করে বনবাসী পাণ্ডবদের মধ্যে ফিরে আসেন। দেবতাদের যে আসন্ন ভারতযুদ্ধে অংশ গ্রহণে আপত্তি নেই, তাঁরা যে অস্ত্র সাহায্য ও যুদ্ধে আরও আনুসঙ্গিক সাহায্য দান করতে প্রস্তুত, তা যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে যান। সেই মত যুধিষ্ঠির চৌখস ভাইটিকে সমস্ত যুদ্ধবিদ্যা শিখে হিমালয়ের দেবশিবির থেকে বাছাই করা অস্ত্রাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসতে বলেন।

মোজেস দেব-আদেশে এবং দেবতা সদাপ্রভুর সহায়তায় পরাক্রান্ত ফ্যারাওয়ের দাসতাকর্ম থেকে উদ্ধার করে ইস্রায়েলীদের মহান সদাপ্রভুর প্রজাবৃন্দে পরিণত করেন। বেদব্যাস হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডবদের বার করে এনে দেবতাদের মিত্র-শক্তিতে পরিণত করেন। পুরাকালে রাজ্যহীনকে রাজ্য পাইয়ে দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে দেবতা তাঁর স্তাবক ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন এইভাবেই।

দেবশিবিরে অর্জুন

মহাভারতে হিমালয় বা হিমাচল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিশাল কাব্যের মহান ব্যাপ্তি জুড়ে বারবার বর্ণিত হয়েছে হিমালয় শীর্ষগুলি। বর্ণনা আছে গিরিশীর্ষে পৌঁছানোর বিভিন্ন যাত্রাপথের। তৎকালীন মহর্ষিরা তো বটেই, পাণ্ডবরাও হিমালয়ে গেছেন একাধিকবার। অর্জুন ও যুধিষ্ঠির মহাকাশ স্বর্গে গেছেন হিমালয়ের গিরিশীর্ষ থেকেই। হিমালয়-স্বর্গ থেকে অর্জুনের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় পাণ্ডবরা বদ্রীনাথের পথে অর্জুনকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। পরশুরাম ভূভাগ ত্যাগ করে অবস্থান করতেন মহেন্দ্র পর্বতে। মহেন্দ্র, মতান্তরে, মন্দার পর্বতের অপর নাম, ইন্দ্রকীল পর্বত।

হিমালয়েই দেবতাদের ধর্মকর্ম জন্ম বিবাহ সভা সমিতি উৎসব ও যুদ্ধবিগ্রহের হাজার কাহিনী ছড়িয়ে আছে। স্মৃতি হয়ে তা জড়িয়ে আছে হিমালয়ের পথে পথে পার্বত্য অধিবাসীদের লোকশ্রুতিতে আর লিখিত আকারে থেকে গেছে বহু বিবরণ বিভিন্ন প্রাচীন পুরাণে। এইসব কথা কাহিনীর মাঝে রাজনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতার নিদর্শনই মুখ্যত পরিস্ফুট। কেউ সেখানে ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ খুঁজতে গেলে হতাশ হবেন। পাহাড়-প্রমাণ পুরাণগুলি নিয়ে পাঠাগারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকুন দিনের পর দিন, দেখবেন, ঈশ্বরানুসন্ধান নয়, ঈশ্বর বানানোর জন্য পুরাণকারগণ একবার এক প্রভুকে ফেলেন আরবার অন্য প্রভুকে তোলেন। সেই নামানো বসানোর জন্যই নানা গল্পকথা। কেউ ব্রহ্মা, কেউ বিষ্ণু কেউ মহেশ্বরের গুণকীর্তি তুলে ধরার জন্য অন্যকে কীটানুকীটে পরিণত করেন। সব মিলিয়ে হিমালয় হয়ে ওঠে এক দারুন গোলমেলে ও শশব্যস্ত কর্মশালা, যেখানে দেবতারা নিত্যই আপনাপন প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মশীল ও মন্ত্রণাকারী।

মহাভারতে দেবতাদের আপন ঘরের লড়াই অবশ্য সবিস্তারে বিবৃত হয়নি। সেখানে তাঁরা আর্যাবর্তে দেব-দখলদারি কায়েম করার জন্য একজোটে কাজ করেছেন। বেশ একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মপদ্ধতি মেনে চলা হয়েছে, যার প্রধান নির্দেশক পদে ব্রহ্মাকে বরণ করে নিতে ইন্দ্র, সূর্য, বিষ্ণু ও মহেশের মধ্যে অন্তত সোচ্চার প্রতিবাদ দেখা দেয়নি।

এমনি এক দেবস্থানে প্রেরিত হলেন অর্জুন। উদ্দেশ্য, দেবতাদের কাছ থেকে সামরিক সহায়তা লাভ!

অক্লান্ত যাত্রার পর বহু গিরিনদী পার হয়ে অর্জুন হিমালয়ে পৌঁছে গেলেন

মাত্র দুই অহোরাত্রের মধ্যেই। এতো শীঘ্র অর্জুন সেখানে পৌঁছালেন কী উপায়ে ? বলা হয়েছে, অর্জুন একাকী পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে দেবতাদের সন্ধান করছেন। কোনো যান অথবা সারথির উল্লেখ নেই। রহস্য ও অলৌকিকতা এইখানেই। অর্জুন কি উড়ে এলেন ? পিঠে লাগানো দুটি ডানা মেলে ?

অর্জুনের বাহনটিকে জানা গেল না। আমাদের অজ্ঞাতেই দেবতারা খবর পেয়ে গেলেন, অর্জুন আসছেন হিমালয়ে। কে দিল তাঁদের এই সংবাদ ? নিশ্চয় বেদব্যাস ফিরে গিয়ে তাঁর দৌত্যকার্যের সাফল্যের কথা নিবেদন করেছিলেন তথাকথিত দেবতাদের কাছে। দুঃখের বিষয়, সে প্রসঙ্গেও মহাভারতকার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে যাননি। কিন্তু বেদব্যাস যদি সশরীরে সে খবর পৌঁছে দিয়ে থাকেন, তবে বুঝতে হবে তিনিও ব্যবহার করেছিলেন বিশেষ দ্রুতগামী যান অথবা কোনো দূরভাষ যন্ত্র। অর্জুনের হিমালয়ে উপস্থিতিকালে আমাদের সামনে বেদব্যাস কিন্তু আবির্ভূত হননি। তাই এমনও হতে পারে, তিনি আর্যাবর্ত থেকেই করো মারফৎ অথবা কোনো দূরভাষ যন্ত্রের সাহায্যে দেবশিবিরে বার্তা প্রেরণ করেন। বিমান এবং আকাশযান যেযুগে দেব-মানুষের বাহন, সে যুগে দূরভাষ যন্ত্র ও লাউড স্পীকার থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। দানিকেন দৈববাণীকে লাউড স্পীকারের ব্যবহার বলেই অনুমান করেছেন।

হিমালয়ে উপস্থিত হ'য়ে একাকী অর্জুন যখন বিহ্বলভাবে ইতস্ততঃ নেত্রপাত করছেন, তখন 'অন্তরীক্ষ' থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'তিষ্ঠ'। বাতাসে কণ্ঠস্বর। দৈববাণী ? অর্জুনের সঙ্গে আমরাও চমৎকৃত হই। মুখ তুলে তাকাই আকাশে। কিন্তু না, কণ্ঠস্বরের মালিক তো আকাশ থেকে নেমে আসেন না, তাঁর দর্শন মেলে নিকটস্থ এক পার্বত্য বৃক্ষের তলায়। যিনি এতো কাছে, তাঁর কণ্ঠস্বর অত বড় আকারে বাতাসে ভাসে কেন ? দানিকেন বলবেন, বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষকে চমৎকৃত করার ক্ষেত্রে এও এক বৈজ্ঞানিক-বিদ্যায়-পারদর্শী মানুষের কৌশল। লাউড স্পীকারের লেখা। এবং ভেবে দেখলে, এই ধরনের ব্যাখ্যাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

কণ্ঠস্বর অনুসরণে আমরা দেখতে পেলাম এক ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন, পিঙ্গল বর্ণ, জটাজুটধারী কৃষ্ণকায় পুরুষকে। নিছক মানুষ। এই মানবই অর্জুনকে নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমি দেবরাজ ইন্দ্র !' এই অদ্ভুত কথা বলে। হ'তে পারেন ইনিও বস্তুতই এক ইন্দ্র, অর্থাৎ হিমালয়ে বসবাসকারী এক ডিভিসন দেব সৈন্যের রক্ষক হিসেবে 'ইন্দ্র' পদাধিপ্রাপ্ত। কিন্তু ইনি যে আসল ইন্দ্র নন, তা আমরা কিছু পরেই দেখতে পাব। যে ইন্দ্র মহাকাশে ঘুড়ে বেড়ান, যিনি হিমালয়ে অর্জুনের জন্য মহাকাশ-রথ পাঠান, অবশ্যই ইনি সেই একই 'ইন্দ্র' নন। ইন্দ্রের

গায়ের রঙ নীল, তিনি কৃষ্ণবর্ণও নন। তাছাড়া 'ইন্দ্র' কোনো ব্যক্তি নন, পদবিমাত্র! এখানে যে ইন্দ্রকে পেলাম, তাঁকে বিশেষ ক্ষমতাবান বলে বোধ হচ্ছে না। অর্জুনকে অস্ত্র সাহায্যের কোনো প্রতিশ্রুতি ইনি দিতে পারলেন না। বলে গেলেন, দেব-আশীর্বাদের জন্য পার্থকে মহাদেবের তপস্যা করতে হবে। তিনিই দেবাধিনায়ক। তাঁর মনোনয়ন পেলে অর্জুন অভীষ্ট লাভ করতে পারেন। সুতরাং এরপর অর্জুন শুরু করেন কঠোর তপস্যা ইন্দ্রকীল বা মহেন্দ্র অথবা মন্দার নামক হিমালয়ের একটি পর্বতে, যার ভৌগোলিক অস্তিত্ব বর্তমান।

পাক্কা চারমাস ধরে চলল অর্জুনের কৃচ্ছ্র সাধনা। তারপর পর্বতবাসী মহর্ষিগণ মহাদেবের কানে খবর পৌঁছে দিলেন ঃ জানানো হ'ল, কঠোর তপস্যার দ্বারা তাঁর আনুগত্য প্রমাণ করেছেন অর্জুন। সন্তুষ্ট মহাদেব বললেন, (সাক্ষাৎ কথোপকথন), 'হে তপোধনগণ! তোমরা অর্জুনের নিমিত্ত বিষণ্ণ হইও না, সত্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। স্বর্গ আয়ুঃ বা ঐশ্বর্য লাভে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই! আমি অদ্যই তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব।' (বন, কালীপ্রসন্ন, ৪৩)। কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, মহাদেবও দূত মুখেই খবর পান এবং প্রতীক্ষায় রেখে অর্জুনকে তিনি পরীক্ষা করে নেন। বস্তুত অর্জুনের ধৈর্য ও কার্যসাধনের জন্য মানসিক দৃঢ়তা কতদূর, এ ছিল তারই পরীক্ষা।

মহাভারতের মহাদেব এক সামরিক অধিকর্তা। তিনি খুশি হয়েছেন অর্জুনের ওপর নিতান্ত জাগতিক কারণে। অর্জুন যে স্বর্গ বা মোক্ষলাভেচ্ছু নন, বরং তাঁর উদ্দেশ্য অস্ত্রলাভ ও যুদ্ধশিক্ষা, মহাদেবের প্রীতির কারণ সেটাই।

বলা বাহুল্য, আমাদের আরাধ্য মহেশ্বরকে আমরা এমন যুদ্ধোন্মাদ সামরিক অধিকর্তারূপে কষ্টকল্পনাও করতে পারি না। আমরা ভাবতে পারি না, আর্যাবর্তের যে রাজপরিবারে পাঁচটি মাত্র গ্রাম দখলের জন্য একটা জ্ঞাতিযুদ্ধের সম্ভাবনা পরিপক্কতা লাভ করছে, সর্বজীবের রক্ষক ভগবান মহেশ্বর আসবেন সেই সামান্যতম সম্পত্তির লড়ায়ে অন্যতম অংশ-গ্রহণকারী হিসেবে। হিন্দুধর্ম ভগবানকে অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত শক্তিরূপে কল্পনা করে। তাঁর অনন্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে আমাদের এই ভূমণ্ডলই যে কত ক্ষুদ্র এক গোলক, এখনো আমরা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও সেটাই সম্যক জেনে উঠতে পারিনি। এমনি যখন অবস্থা, তখন যদি কেউ বলেন, সেই অসীম অনন্তের একমাত্র অধীশ্বর আকাশ থেকে উজ্জ্বল রথে চেপে ছুটে আসছেন অর্জুনকে সামরিক কাজে নিয়োগ করতে, তবে সেই বাতুলকে উন্মাদ ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে?

দেব-প্রতিষ্ঠা এভাবে অসম্ভব বুঝে বুদ্ধিমান যদি কেউ বলেন, আসলে

দেবতার অংশটি প্রক্ষিপ্ত। অর্জুনকে মস্ত হিরো বানানোর জন্যই এ সব করা হয়েছিল ; তাহলে আমার উত্তর, রামায়ণ মহাভারতের যুগে দেব দেবতা নিয়ে অমন দুঃসাহসিক কাব্য করার প্রকৃত অবসর ছিল কি ? যখন ধর্মের প্রাধান্য জীবনচর্যার সকল দিককেই নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন ধর্ম ও দেবতা নিয়ে বল্‌গাহীন কল্পনা এবং সামান্য মানুষের (রাজন্যবর্গও সে যুগে ধর্মীয় নেতাদের তুলনায় সামান্য মানুষ) প্রতিষ্ঠার জন্য দেবতাকে ছোট করায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়াই তো ছিল বরং স্বাভাবিক।

সুতরাং মহাভারতে কথিত দেবতাদের দেবতারূপে মানতেই ও মানাতেই হবে শুধু এই আত্মতুষ্টির জন্য একটা অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

ঈশ্বর সর্বকালে আমাদেরই কল্পনার সৃষ্টি। প্রাচীন প্রপিতামহগণ উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী একদল আকাশচারী বৈজ্ঞানিককে বুঝতে না পেরে কেবল মাত্র বিভ্রান্তির বসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেবতার আসনে। আকাশচারী নভশ্চরদের কতিপয় প্রধানকে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রক রূপে। আকাশচারী বুদ্ধিমানরা শিখিয়ে গেছেন, ধর্মকে যতদিন ম্যাজিক করে রাখা যায়, ধর্মের দাপটও ততকালই স্থায়ী ; না হলেই পয়গম্বরের পূজা বিজ্ঞানীর পায়ে গিয়ে পড়ে। ধর্মীয় মন্ত্রগুপ্তি আর কার্যকর থাকে না।

বিজ্ঞানকে সেদিন কতিপয়ের মতলব হাসিলের হাতিয়ার করা না হলে পুরাণ যুগেই আমরা পেতে পারতাম বৈজ্ঞানিক কলকারখানা। মানুষকে অপেক্ষা করতে হ'ত না যুগ যুগ ধরে। কিন্তু দেবতারা বোধ হয় তা চান নি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তাঁরা দ্বিতীয় কোনো ভুবনের গ্রন্থাগারে জমা করে দিতে আদৌ উৎসুক ছিলেন না। কে আর নিজের অস্ত্র অপরের হাতে দিয়ে প্রভুত্ব হারাতে চায়। তবু কিছু তাঁদের দিতে হয়েছিল নিজেদেরই স্বার্থে। সেই কিছুর মধ্যে কিছু কিছু হ'ল বৈজ্ঞানিক অস্ত্র। এ জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহাদেব যেকালে অর্জুনকে তেজোক্রিয় অস্ত্র দান করে যাচ্ছেন, সেকালে ভারতের সভ্যতা মুখ্যত কৃষিজীবী। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কোনো খবরই নেই, অথচ বিমানের কথা আছে। মনে রাখতে হবে, বিমানগুলি দেবদত্ত। রাবণ তাঁর পুষ্পক রথ আনেন কুবেরের কাছ থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রচলন ছিল না, অথচ ময়দানব যুধিষ্ঠিরের আশ্চর্য সভাগৃহ নির্মাণ করেছেন। যুদ্ধে ও মহাকাশ যাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন ধাতু। বিজ্ঞানের এক এক শাখায় আশ্চর্য উন্নতি অথচ সাধারণের জীবন অন্ধকারে আবৃত। এই বৈষম্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে সম্ভব নয়। কিন্তু সভ্যতার সংস্পর্শহীন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে অজ্ঞ বন্য মানুষদের অবাক করে আমরা যদি

বাজিয়ে আনি টেপ রেকর্ড, রেডিও; চালিয়ে আনি যে কোনও আধুনিক যানবাহন, বন্যরা তাতে বন্যই থাকে, অথচ ব্যাটারিচালিত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তাদের সামনে ম্যাজিকের মত ব্যবহার করে নিজেদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রমাণ করে আসতে বৈজ্ঞানিক মানুষের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। তখন যদি টেপ রেকর্ডকে তারা দৈববাণী ভাবে, রেডিও-সঙ্গীতকে মনে করে, স্বর্বেশ্যার স্বরলহরী, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাদের বুদ্ধিমান কয়েকজনের হাতে কিছু ডিনামাইট দিয়ে দেওয়া যায় যদি, আর তাই নিয়ে তারা পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানিয়ে বন্য দেশবাসীকে যদি বলে, তপস্যার দ্বারা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করে তারা যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, এ হ'ল তারই প্রকাশ, ইচ্ছে করলেই তারা সৃষ্টি ধ্বংস করে দিতে পারে; তবে সেই বন্য পয়গম্বরের পায়ে ওদের গোষ্ঠীপতি কি মাথা নুইয়ে দিতে বাধ্য হবে না ?

পুরাযুগে পৃথিবীর পয়গম্বররা তপস্যালব্ধ শক্তি সংগ্রহ করে আনতেন পর্বত শিখর বা নির্জন প্রদেশ থেকে, আজ যা সম্ভব হয় না। ভিনগ্রহের বুদ্ধিমানরা প্রধানত পর্বতেই শিবির গাড়তেন। আমাদের মুনিরা তো বটেই, মোজেসও পর্বতে গিয়ে দেবতার বাণী শুনে এসেছেন। ইজেকিয়েলের দেবদর্শন ঘটেছে কোবর নদীর তীরে।

তবে ভারতীয় দর্শন ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের মধ্যে পার্থক্য আছে। ওল্ড টেস্টা-মেণ্ট আকাশচারী দেবতাদের যেমন ভাবে দেখেছেন, যেমন নির্দেশ পেয়েছেন তাঁদের কাছে, যথাযথ তারই প্রতিবেদন রেখে গেছেন। তার ওপর সর্বত্রই কোনো কাব্য ও দর্শন চাপান নি। কিন্তু আর্যরা দর্শনের কারবার করছেন বহু বছর। তাই ভিনগ্রহের বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছেন দর্শনের তত্ত্বের সঙ্গে নভশ্চরদের একাকার করে নিয়ে। সে জন্যই কি ঐতরেয় উপনিষদের দেহধারী দেবতারা কাল্পনিক প্রকৃতি-দেবতাদের স্থানে অভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ? ওল্ড টেস্টামেণ্টে দার্শনিকতা কম, তথ্য বেশি। হিন্দুদর্শন অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকেও দার্শনিক কাব্যের বিষয়বস্তু করেছে।

কথায় কথায় অনেকদূর এসে পড়েছি আমরা। ফিরে যাওয়া যাক পুরোনো প্রসঙ্গে।

স্বর্গ বা মোক্ষ তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়, অর্জুন যুদ্ধার্থী, এই সংবাদে প্রীত মহাদেব হিমালয়ে এসে অবতরণ করেছেন। একটি উন্নত সামরিক শিবিরের দায়িত্বশীল অধিকর্তার মতই মহাদেবের সুচতুর পূর্বাপর আচরণ। নেপথ্যে থেকে ইতিপূর্বে তিনি পরীক্ষা নিয়েছেন অর্জুনের ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, সাহস, মনোবল ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার। এই পরীক্ষার মেয়াদ ছিল সুদীর্ঘ চার মাস কাল। তারপর দূত-

মুখে যখন শুনেছেন, অর্জুনের একাগ্রতা অতুলনীয়, সে রণে ভঙ্গ দেওয়ার মত সাধারণ প্রাণী নয়, সামরিক সাহায্য লাভের জন্য একাকী সব রকম কঠিন সাধনায় প্রস্তুত, তখনই মহাদেব আসছেন নিজে। অর্জুনের সাক্ষাৎ সম্মুখে।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, প্রথম বেদব্যাস, পরে দেব শিবিরের অনুগত তপোধনগণ মহাদেবের কাছে সংবাদ আদান প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে কোথাও কোনো অলৌকিকতা নেই। এখানে শুধু দুটি তথ্যগত উল্লম্ফন আছে। অর্থাৎ তথ্যগত সূত্রহীনতা কাব্যিক অলৌকিকতা সৃষ্টি করেছে। এক, মহাদেব তখন হিমালয়ের কোন জায়গায় অবস্থান করছেন, তা আমাদের বলা হয় নি। দুই, 'তপোধনগণ' সেখানে কেমন করে উপস্থিত হলেন, কবি সে খবরও বেমালুম চেপে গেছেন।

যেখানেই থাকুন, মহাদেব যথাশীঘ্র ইন্দ্রকীল পর্বতে এসেছেন। এসেছেন সস্ত্রীক। উমা দেবী-সহ। মহাদেব জানেন, সামরিক ঘটাপটা হ'লেও তিনি তাঁর নিজস্ব শিবিরেই সুরক্ষিত আছেন। আসছেন তাঁরই শিবিরে একজন বৈদেশিক মানব রাজপুত্রকে সামরিক শিক্ষার্থী হিসেবে নিয়োগ করতে। উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা পরীক্ষার পর এবার দ্বিতীয় স্তর, অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা নেওয়া। সামরিক কাজে চাটুকার নিয়োগ করলে চলে না, প্রার্থীকে সব রকম ভাবে বাজিয়ে নিতে হয়। তাই উন্নত সামরিক জ্ঞান-সম্পন্ন দেবাধিপতিকে সামান্য এক কিরাতের ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করতে আসতে হল।

বেচারী অর্জুন। এসবের কিছুই তাঁর জানা নেই। অন্ধের মতো ইন্দ্রকীল পর্বতে সাহায্যকারী শিবিরাধ্যক্ষের জন্য তিনি শুধু উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় ছিলেন।

সমরকুশলী মহাদেব হিমালয়ে অবতরণ করলেন বিশেষভাবে সশস্ত্র হয়ে।[১] 'তিনি পিনাক শরাসন ও আশীবিষদৃশ শরসমূহ গ্রহণ পূর্বক দেহবান দহনের ন্যায় মহাবেগে অর্জুনের তপোবনে গমন করিলেন।' (বন কালীপ্রসন্ন, ৪৩)। তাঁর এই আগমনের পেছনেও আছে একটি চমৎকার সামরিক পরিকল্পনা।

আগেই বলেছি, অর্জুনের ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, সাহস ও তিতিক্ষার কঠোর পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তিনি আসছেন পার্থের শক্তি পরীক্ষা করতে। পাছে তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে অর্জুন যুদ্ধ না করে আভূমি প্রণাম জানিয়ে আত্মসমর্পণ করেন, তাই চতুর সামরিক অধিকর্তা এলেন ভারতীয় আদি উপজাতি এক কিরাতের ছদ্মবেশে এবং নিজের বিমানটিকেও রেখে এলেন দূরবর্তী কোনো স্থানে। প্রতারিত অর্জুন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই দ্বৈরথ যুদ্ধে নেমেছিলেন। দু'পক্ষে

১) লোকশ্রুতি বলে, কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধস্থল উত্তরকাশী। উত্তরকাশী উত্তর প্রদেশের উত্তরতম জেলা, টিহরি গাঢ়োবাল জেলার বাওয়াই তহশিলের বর্তমান উন্নত রূপান্তর।

যুদ্ধ বেশ জমে উঠল। কিন্তু কাবু করা গেল না কিরাতকে। কিরাতরূপী মহাদেবের উন্নত ধরনের বর্ম ভেদ করতে পারল না পৃথ্বীপুত্র অর্জুনের বাছা এবং শক্তিশালী শরসমূদয়ও। পারবে কী করে, বিজ্ঞানী দেবাধিনায়কদের উন্নতমানের কবচ বাঁধতেন যে স্বয়ং ইন্দ্র।

পরাস্ত অর্জুন তখন মনে মনে ভাবলেন, 'শুনিয়াছি, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে।' অর্থাৎ দেবতারা হিমালয়ে আসা যাওয়া করেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। আরও ভাবলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

'…পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র শরনিকর সহ্য করিতে আর কাহার ক্ষমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা কিম্বা যক্ষ হয়েন, আমি অবশ্য ইহাকে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শমন সদনে প্রেরণ করিব।' (ঐ, পৃঃ ৪৪) কী সাংঘাতিক কথা ! মহাভারত যে দেবতাদের ঈশ্বরের মর্যাদা দেন, সামান্য অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে তাঁরাও কি প্রেরিত হ'তে পারেন শমন সদনে, মৃতুলোকে ! হায়, ঈশ্বর !

প্রশ্ন, ঈশ্বর এক সামান্য উত্তরপ্রদেশী রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন সর্বাঙ্গে বর্ম এ'টে ও সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে,—যিনি ভক্ত, তিনি কি তাঁর মহেশ্বরকে এতো ক্ষুদ্র রূপে কল্পনা করতে ও মেনে নিতে রাজি হবেন ? কিন্তু মহাভারতকার স্বয়ং তাঁকে অন্য কোনো রূপে হাজির করাতে পারেন নি। এমন কি মহাদেব-ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যেও কোনো আলৌকিকতা নেই। বলা হয়নি, মহাদেব এলেন 'আশীবিষে' সজ্জিত হয়ে, বলা হ'ল, তাঁর অস্ত্র ছিল 'আশীবিষ-দৃশ' সুতরাং আমাদের পরিচিত নাগভূষণে সজ্জিত মহাদেবের সঙ্গেও মহাভারতের এই পিনাকপাণির সাদৃশ্য কল্পনা করা গেল না। আমরা সংবাদ পেলাম সমর-কুশলী বুদ্ধিমান এই দেহধারী মহাদেব এসেছেন আশীবিষসদৃশ অর্থাৎ সাপের মত আকৃতির বিশেষ অস্ত্রে সুরক্ষিত হ'য়ে। এমন সর্পসদৃশ অস্ত্রের কথা অন্যত্রও আছে। পৌরাণিক উপাখ্যানে নাগপাশে বেঁধে রেখে যাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগেরা বন্দীকে ছোবল মারে না। তারা কি কোনো বৈদ্যুতিক পাশ ?

দেবতাদের মহাকাশযানে (ইন্দ্ররথে) অর্জুন দেখেছিলেন, 'মহাকায় জ্বলিতানন অতি ভীষণাকার নাগগণকে' ; একটি মহাকাশযানে বৈদ্যুতিক তারের কুণ্ডলী ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে উপযুক্ত উপমার অভাবে ঐভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, দানিকেনতত্ত্বের আলোকে এখন আমরা এমন ব্যাখ্যা করতে পারি। কেন না দেবযান যদি একটি যান্ত্রিক বস্তু হয়, তবে 'জ্বলিতানন ভীষণাকার নাগগণ'-কে অন্য কিছু ভাবা যায় না। তা ছাড়া 'নাগ' শব্দটি শুধুই যে সর্পাদিকে বোঝায় এমনও নয়, 'নাগ' একটি প্রাচীন জাতিও বটে।

'নাগ' একটি উপজাতীয় 'টোটেম'। স্যার হার্বাট রিসলি পরিচালিত Ethnographic Survey ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে জাতীয় প্রতীক হিসেবে পূজিত বিভিন্ন 'টোটেমের' তালিকা রেখে গেছে। ওড়িশায় সম্প্রতি আলোকপ্রাপ্ত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে চলে আসছে 'নাগ' ও 'শৃগালের' টোটেম। বৈদিক ও রামায়ণ মহাভারতীয় আমলেও টোটেমের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন শ্রীসি, ডি, চ্যাটার্জি (১৬শ তম) বিজ্ঞান কংগ্রেসে পঠিত বক্তৃতামালায়। তিনি লিখেছেন, 'It now appears to be a certainty that same influence of totemism can be traced in the Rigveda...The influence becomes all the more marked in the later Vedic works as well as in the epics Ramayana and Mahabharata though none of them has preserved the name of a single totemic clan.' (Races and Cultures of India – D. N. Majumdar দ্রঃ)। সুতরাং জ্বলিতানন ভীষণকায় নাগগণকে আর কি ভাবে ভাবা যেতে পারে? এ শব্দের একাধিক অর্থ। যান্ত্রিকযানে এ শব্দ সম্ভবত কুণ্ডলীকৃত বিজলী তারকেই বোঝাচ্ছে। পরিচালনা নির্দেশক বিজলী বাতিগুলিকে নাগদের 'জ্বলিতানন' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকতে পারে।

অর্জুনের প্রশ্ন, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। কিন্তু এই কিরাত কে? ইনি শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা হ'লে কি অর্জুনের শরপ্রহারে নিশ্চয় নিহত হতেন না?—প্রশ্নটি আমাদের চমৎকৃত করল। এক, হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। অর্থাৎ হিমালয় দেবগণের একটি দেবযান অবতরণ ক্ষেত্র; তাকে দেবস্থানরূপে আবহমানকাল পূজনীয় প্রদেশ করে রাখা হলেও বস্তুত অর্জুনের বক্তব্য বিপরীত তথ্যেরই সন্ধান দেয়। জানায়, হিমালয়ে দেবতারা আসা যাওয়া করতেন। অর্থাৎ আবার সেই দানিকেন।

দানিকেন বলেছেন ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে, গ্রহান্তরবাসী বুদ্ধিমানরা পার্বত্য উপত্যকায় তাঁদের মহাকাশযান অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। নেমেছিলেন তাঁরা নির্জন দ্বীপ ও নির্জন স্থানে। বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি। গ্রহান্তরবাসীরা আসতেন যান্ত্রিক যানে নক্ষত্রলোক থেকে। স্বভাবতই তাঁদের লোকবল ও অস্ত্রবল অফুরন্ত থাকার কথা নয়। তাছাড়া নেমেছেন তাঁরা ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্রই। এ জন্য অল্প রসদ ও লোকবল নিয়ে এঁরা লোকলয়ে অবতীর্ণ হতে সাহসী হতেন না হয়ত। চন্দ্রপৃষ্ঠে আমরা দু'জন নভশ্চরকে পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা কি পারতেন, চান্দ্রীয় জীব বর্তমান থাকলে তাদের মধ্যে গিয়ে সরাসরি অবতরণ করতে? পারতেন না। চান্দ্রীয় জীবরা আদিমতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণী

হলেও সেই ঝুঁকি নভশ্চরদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। বাইবেলে সদাপ্রভুর পর্বতশীর্ষে অবস্থানের কাহিনী আছে। তিনি পয়গম্বরকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যেন সাধারণে তাঁর সেই পার্বত্য অবস্থানের কাছাকাছি না হয়। হ'লে, হুমকি দেওয়া হয়েছিল, ধ্বংস করা হবে তাদের।

দেবতারা উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও পৃথিবীর মানুষকে একেবারে অবহেলা করতে পারতেন না। কারণ প্রাচীনগণও খুবই দুর্বল ছিলেন, পুরাণ কথায় এমন ইঙ্গিত নেই। মিশরের 'ফারোণকে' নিজের আদেশ মান্য করাতে 'সদাপ্রভুকে' কম বেগ পেতে হয়নি। 'মোশির' (মোজেশ) মাধ্যমে 'সদাপ্রভু' কয়েকটি ভীতিপ্রদ ভেল্কি দেখিয়েছিলেন 'ফারোণ' বা ফারাওকে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কেন না প্রাচীন মিশ্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও নিজেদের শক্তিতে একই রকম ভেল্কি দেখালে সদাপ্রভুকে বারবার নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করে মিশ্রীয়দের জব্দ করতে হয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল পাক্কা দশটি আঘাত হানার। ঈশ্বর সেখানে কেবলমাত্র ইস্রায়েলীদেরই ঈশ্বর, সর্বেশ্বর নন। তিনি নিজে ইস্রায়েলীদের ঊর্ধ্বতম সামরিক অধিকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (এক্সোডাস বা যাত্রাপুস্তক)। মহাভারতে মহাদেব এসেছেন অর্জুনের ও পাণ্ডবদের দেবতা এবং রক্ষক হিসেবে দেবশিবিরের সাহায্য দান করতে। মিশ্রীয়রা ইস্রায়েলীদের তিনশ বছর দাসত্বের কারাগারে নিগৃহীত করেছিল। 'সদাপ্রভু' তাঁদের উদ্ধার করেন। পাণ্ডবরা রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন, দেবগণ তাঁদের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সামরিক সহায়তা দান করেন। দুয়েরই উদ্দেশ্য দেবপ্রতিষ্ঠা।

অর্জুনের অপর প্রশ্ন, শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা কি তাঁর শরপ্রহার সহ্য করতে পারতেন ? না, তা হলে অর্জুন অবশ্যই সে দেবতাকে শমন সদনে প্রেরণ করতেন। এ প্রশ্নটি আমাদের বস্তুত অবাক করে দেয়। যে দেবতারা সর্বশক্তিমান হিসেবে আমাদের পূজা দাবি করে এসেছেন, তাঁরা শুধু মানুষের কাছে পরাজিতই হন না, তাঁরাও মরণশীল, অর্জুনের হাতে তাঁদের মৃত্যুও হতে পারে। দেবতারা যে রক্তমাংসের জীব, অর্জুনের এই চিন্তা তার আর একটি অবিসম্বাদী সাক্ষ্য। আগেই ঐতরেয় উপনিষদের কথা বলেছি। সেখানে দেবতারা ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন সংসার-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত 'লোকপাল' মাত্র। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাদের রক্ষকরূপে এই লোকপালদেরও সৃষ্টি করেছিলেন, ঐতরেয় একথাই জানিয়েছেন আমাদের। আগের আলোচনায় আমার তর্ক ছিল, ইচ্ছাকৃত ভাবে অথবা বিভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত বৈদিক দেবতাদের নাম পর্যন্ত গায়েব করে পরবর্তী ঋষিরাই সম্ভবতঃ এই দেহধারী বুদ্ধিমানদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমান আলোচনার আলোকে আমার

ঐ যুক্তি কি আরও বেশি আলোকিত হয় না ? বেদ অপেক্ষা উপনিষদ পরবর্তী ; প্রায় ভারতযুদ্ধের সমসাময়িক। এই সময় দেবদাপট সরাসরি আর্যাবর্তে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রদর্শন শুরু করেছে। তাঁদের ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ তাঁদের অনুগত ঋষিরা যদি ঐসব সদাপ্রভুদের, কল্পিত দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন, তবে তৎকালীন অবস্থায় তা অস্বাভাবিক কিছু হয়নি।

দেবানুগতরা তথাকথিত দেবগণকে অলৌকিক ঈশ্বর বানিয়েছিলেন নিজেদেরই গোষ্ঠীস্বার্থে। রক্ষককে দেবতা বানালে সেই সেই দেবতার শিষ্য সামন্ত, অনুগত রাজন্যবর্গ ও চামচাগণ চমৎকৃত মানুষের মধ্যে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। আজও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি এইভাবে ব্যক্তিপূজার আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। সেদিনও সে খেলাই হয়েছিল, এমন সন্দেহ করার কারণ কিছু কম নেই।

যা বেদানুমোদিত নয়, সেই দেহবান দেবতাদেরই পূজা প্রচলিত হ'ল কেন পরবর্তী কালে ? বদলে গেল কেন দেবকল্পনা ? এবিষয়ে ঐতিহাসিক ডঃ এইচ-সি. রায়চৌধুরীর কাছেও কিছু শোনা যাক। ডঃ রায়চৌধুরী মহাভারতীয় দেবকল্পনায় সাধিত পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'The religion which the Mahabbarata inculcates has a twofold basis, the truth and the Vedas , but its religious ideas are not a mere replica of those prevailing in the Vedic period. Great changes had taken place in the conception of the gods and the problems of life. The old Vedic gods had lost much of their pristine splendour and the presiding deities of nature became quite human in dress, talk and action.' (The Cultural Heritage of India, Vol II).

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এমন হল ? কবি বললেন, মহাভারতকে সর্বজনবোধ্য করা হয়েছে। তা সর্ব বেদের সমষ্টি। অথচ মহাভারতেই প্রাকৃতিক বৈদিক দেবতাদের বিদায় দিয়ে নিয়ে আসা হ'ল দেহধারী দেবতাদের। এ তো বেদবিরোধী আচরণ। তাই ঐতিহাসিক বলতে বাধ্য হলেন, আশ্চর্য কথা, মহাভারতের দেবতা সম্পর্কে আদি ধারণা আমূল পাল্টে গেল। কল্পিত দেবতারা হাজির হলেন মানুষের মত, পরিধান করে এলেন মানুষী পোষাক, কথা বললেন মনুষ্যকণ্ঠে এবং আচার আচরণেও খাঁটি মানুষ হয়ে উঠলেন তাঁরা। কেন ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব ঐতিহাসিকের কাছে ছিল না। সে জবাব মহাকাশ বিজ্ঞানের আলোকে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মহাভারতীয় যুগে অবতার তৈরী করতে লাগলেন ব্রাহ্মণরা। তবু হয়ত

তখনই মূর্তিপূজার প্রচলন হয়নি। মন্দিরে আরাধনারও খবর নেই। আছে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা। মূর্তিপূজা প্রচলিত হতে আরো ঢের সময় লেগেছিল। ডঃ পি. সি ঘোষ 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে' লিখেছেন, প্রতিমা পূজা শুরু হয় দুইশত খৃঃ পূর্বাব্দে। মানে ভারতযুদ্ধের পরেও মনু ছিলেন প্রতিমাপূজা বিরোধী। পতঞ্জলির (২০০ খৃঃ পূঃ) লেখায় প্রতিমা বিক্রীর খবর আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৯৪৪ সাল) বক্তৃতামালায় শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'প্রতিমা অবলম্বনে আরাধনা ও উপাসনা, প্রতিমাতে আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা অজ্ঞ ও হীনমতি ব্যক্তিবর্গেরই উপযুক্ত বলিয়া প্রাচীনপন্থীরা বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মণ সাগ্নিক হইবেন এবং মন্দিরে দেবার্চনা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, এইরকম ব্যবস্থা স্বয়ং মনু বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ব্যতীত শিব ও বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত করা নিষিদ্ধ ছিল।...বেদের সূক্তে মন্দির বা বিগ্রহের উল্লেখ নাই।' (দেবয়াতন ও ভারতসভ্যতা)।

'সর্ববেদের সমষ্টিরূপ' বলে প্রচার করা হলেও সুতরাং বৈদিক ধর্মাচরণকে মহাভারত পাল্টে দিতে শুরু করেছেন দৈবীপ্রভাব সৃষ্টি করে এবং সকলই সেই হিমালয়স্থ শরীরধারী দেব-ইচ্ছা এবং দৈবের বশ বলে গাওনা গেয়ে। এই উদ্দেশ্যমূলক সংযোজনা ধরা পড়ে, যখন দেখি দুর্যোধনের মুখেও কবি বসিয়ে দিয়েছেন ঐ দৈবনির্ভর হতাশার গাওনা। ধৃতরাষ্ট্র, মামা শকুনি, কর্ণ, যখন যেমন সুবিধে সেই ভাবে তাঁদের মুখেও দৈবই সব, মানুষ দৈবের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, এইসব কথা বসানো হয়েছে। দুর্যোধনকে যতদূর জানা যায়, এসব কথা তাঁর মুখে খুবই আকস্মিক ও স্বীয় চরিত্রবিরোধী। দৈবে অবিশ্বাসী বলেই তো চার্বাককে তাঁর বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

মূর্তি পূজা না থাক, 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বচনপ্রসিদ্ধ গীতায় সরাসরি (গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ) অবতারের উল্লেখও না থাক, মহাভারত অবতার সৃষ্টিতে কোমর বেঁধেছিল। লক্ষণীয়, প্রত্যেক রাজা রাজড়াকেই কোনো না কোনো দেবাসুরের অবতার করা হয়েছে। দেবতা যেমন হিমালয়স্থ বিজ্ঞানীশক্তি শিবির, সমতলের রাজন্যবর্গও তেমনি এক একটি জনশক্তি শিবির। সে যুগের ব্রাহ্মণরা তাই শক্তিমান পুরুষের মধ্যেই দেবতা ও দেবাবতার সন্ধান করেছেন। সাধারণের বিষয়ে তাঁদের কিঞ্চিন্মাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

সে যুগে সাধারণ মানুষের দেবতা নেই। দেবতা হয় কোনো রাজশক্তির রক্ষক, নয়ত হন্তারক। দরিদ্রের নারায়ণরূপে তাঁর কোনো পরিচয়ই মহাভারতে পাওয়া যায় না। সে দেবতারা যুদ্ধবাজ এবং ফন্দিবাজ। প্রাচীন পুরোহিত ও রাজাদের জন্য যেমন, জনগণের কথা ভাববার তেমন সময় কোথায় তাঁদের? নিজেদের

অস্তিত্ব রক্ষায় সর্বদা ব্যস্ত ও ষড়যন্ত্রকারী। এই দেবতারা কাজে কাজেই ঈশ্বরের শক্তিরূপী দেবতা নন, দেবতারূপী জোচ্চোর। মহাভারতীয় তথ্য থেকেও পাওয়া যায়, জোচ্চোররা এসেছিলেন আকাশ থেকে বিমানে চেপে আর একদিন তাঁদের প্রত্যাবর্তনও ঘটে বিমানারূঢ় মূর্তিতেই। সঙ্গে নিয়ে যান সুবোধ অনুরক্ত এক বুদ্ধিমান মানুষের নমুনা (স্পেসিমেন), তিনি যুধিষ্ঠির। তিনি সর্বঘটে বকধার্মিক সেজে বহু কীর্তি রেখে গেছেন। জ্ঞানী হয়েও তাঁর অমন অদ্ভুত নির্বোধের অভিনয়ে দক্ষতা সর্বকালের দক্ষতম অভিনেতারও ঈর্ষার কারণ। দেবতারা বুদ্ধিমান, নমুনা হিসেবে তাই সেরা জিনিস যুধিষ্ঠিরকেই তাঁরা বেছে ছিলেন। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভাতের কথা' গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসায় মুখর। ক্ষমা করবেন, আমার মত অধম ব্যক্তি এই যুধিষ্ঠিরকে শুধু রাজ্যলোভী বকধার্মিক হিসেবেই দেখতে পায়। যুধিষ্ঠিরের যে দার্শনিকতায় বুদ্ধদেববাবু মুগ্ধ, তার কতক প্রত্যক্ষ ন্যাকামি বাকি দার্শনিকতা সম্ভবত দেব-ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠাভিলাষী কবিদের দ্বারা তাঁর চরিত্রে আরোপিত গুণাবলী। ইনি যত্রতত্র পরশ্রমভোগী একটি শ্রেণীর গুণগান শুনতে ব্যস্ত। ইনি ততক্ষণই ধার্মিকতার দোহাই পেড়ে কালহরণ করেন, যতক্ষণ না রাজনৈতিক বাতাবর্ত তাঁর জয়লাভের অনুকূল হয়। ছদ্মবেশী ধর্ম ও ধর্মব্যাখ্যা যেমন ব্রাহ্মণদের মুখে মুখে, পায়ে পায়ে, তেমনি তা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গেও হাঁটে। মহাদেবের কাছে অর্জুনকে পাঠিয়েছিলেন তিনি জয়াকাঙ্ক্ষায়। জানতেন, মহাদেবও রক্তমাংসের জীব! কিন্তু আজীবন তিনি দেবশিবিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু দৈব দৈব গাওনা গেয়ে গেছেন। মস্ত দার্শনিক কি মস্ত নির্বোধ ছিলেন? বরং ইজেকিয়েল সদাপ্রভুর রথটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ)।

যুধিষ্ঠির-ব্রাহ্মণের-দেবতা, জনৈক সমরাধিনায়ক নভশ্চর অর্জুনকে বোকা-ভুলিয়ে ভূতভাবন ভগবান শঙ্কররূপে ইন্দ্রকীল পর্বতে আবির্ভূত হয়েছিলেন নিজের যান্ত্রিক বিমান অর্জুনের দৃষ্টির আড়ালে রেখে। এসেছিলেন তিনি ছদ্মবেশে। আসার উদ্দেশ্য অর্জুনকে চূড়ান্ত পরীক্ষার পর দেবকার্যে নিয়োগ। অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে তিনি দেবশিবিরের মেজর জেনেরাল। মিত্র পক্ষীয় বীর নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা তাঁরই ওপর নভশ্চর শিবির ন্যস্ত করেছে। তিনিই ওয়ান ম্যান ইণ্টারভ্যু বোর্ড।

অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাদেবের মালুম হয়েছে, অর্জুন বেশ জবরদস্ত পালোয়ান। অস্ত্রশস্ত্র খোওয়া গেলেও সহজে দমবার পাত্র নয়। সে মল্লযুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়। হ্যাঁ, সেই নিভৃত পার্বত্য প্রদেশে বেশ কিছুক্ষণ নভশ্চর-দেবতার সঙ্গে

অর্জুনের মল্লযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কুস্তীর সময় অর্জুন রক্তমাংসের দেবতার পেশীসকল স্পর্শ করে বিমূঢ় চমকিত এবং পুলকিত বোধ করেছেন। পণ্ডিতরা বলেন, দেবতারা ছিলেন নির্লোম। তাঁদের চোখে পলক নেই। নির্লোম পুরুষের গাত্র স্পর্শে রোমশ অর্জুন স্বাভাবিক ভাবেই পুলকিত হয়েছিলেন। তাঁর পুলকের অন্য কারণ, মহাদেব তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত করেছেন। দৈবাস্ত্রের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অতএব মা ভৈঃ। কর্ণসহ ভীষ্মাদিকে নিপাতিত করতে আর বেগ পেতে হবে না। কেননা বহিরাগত শক্তিশিবিরের হাতে বাছা বাছা অস্ত্র আছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, যুদ্ধের আগে অর্জুনের বিষাদ এসব কারণেই অবাস্তব। তাঁর সর্ব ক্ষণের ধ্যানজ্ঞান ছিল কৌরবকুল ধ্বংস করে রাজ্য লাভ। যুদ্ধের প্রাক্কালে তাই তাঁর পক্ষে সুবৃহৎ গীতোক্ত ধর্মবাণী শোনার মানসিকতা ছিল না। প্রকৃতি তাঁর অ-নিষ্ঠুর নয়। একলব্যকে অতর্কিতে দ্রোণসহ ঘিরে ফেলে তরুণ বয়সে হাসতে হাসতে সেই বীরের আঙুল কেটে এনেছিলেন ঐ অর্জুন। ধর্মকথা শোনার অবসর কোথায় তাঁর? বহু পণ্ডিতই অনুমান করেন, 'গীতা' স্বতন্ত্র গ্রন্থ। সমস্ত উপনিষদরূপ গাভী দোহন করে তার সৃষ্টি। এ জিনিস যুদ্ধক্ষেত্রে কথিত হওয়ারও বিষয় নয়। গীতাকে ঐখানে ঠেসে দেওয়া হয়েছে।

এমন ঠাসাঠাসিতেই মহাভারত, মহাভারত। মহাদেবকেও দেবতারূপে ঠাসা হয়েছে। কস্মিন কালেও মহাদেব কিন্তু আর্য দেবতা ছিলেন না। আর্যাবর্তে যখন আর্যসমাজের ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়ালড়ি চলছে, মহাদেব তখন দেবতা হিসাবে হাজির হবেন কী করে? মহাভারতে তাঁর নাম শঙ্কর। তিনি নভশ্চর শিবিরের সমরাধিনায়ক মাত্র।

ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি শিব-উমাকে দ্রাবিড়ীয় দেবতার শ্রেণীতে গণ্য করে বলেছেন, "**Siva and Uma are in all likelyhood fundamentally of Dravidian origin**…"। বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে অনার্য দেবতাদের আর্যিকরণের সময় শিব (মহাদেব) আর্য দেবায়তনে জায়গা করে নেন। রুদ্র ও শিব হ'ন এক। একাধারে শান্ত ও রুদ্র, শান্তি ও ধ্বংস।

শিব-পশুপতি বা রুদ্রকে পাওয়া যায় মহেঞ্জোদড়র ধ্বংসাবশেষ থেকে। আবিষ্কার করেন জন মার্শাল। বেদের রুদ্র ভীতি-উদ্রেককারী প্রতিহিংসা-পরায়ণ বলে কথিত। তাঁকে ভয় করা যায়, পূজা করা যায় না।

প্রাচীন আর্যরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অগ্নিতে আহুতি দিতেন। অগ্নির মাধ্যমে ঈশ্বর গ্রহণ করেন, এই ছিল ধারণা। কিন্তু একমাত্র রুদ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্যই রেখে আসা হ'ত পথের ধারে অথবা নিষিদ্ধ জায়গায়।

সেই শঙ্কর যখন বর্ম এ'টে যোদ্ধৃবেশে উপস্থিত হলেন তখন যদি তাঁকে আর্যদেবতা মহাদেব বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে বুঝতে হবে ঘটনাটির মধ্যে জোচ্চুরি আছে।

এইসব বেদবেদান্ত তত্ত্বকথা না ঘাঁটলেও শুধু তাঁর আবির্ভাব ও কার্যাবলী দিয়েই সমরাধিনায়ক শঙ্কর প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি দেবতা নন, উড্ডীন যানে ভ্রমণকারী সমরকুশলী একজন নভশ্চর মাত্র।

তিন প্রধান

শুধু কাব্যেই নয়, কাকতালীয় ঘটনা ঘটে ইতিহাসেও। ইন্দ্রকীল পর্বতে এমনিই এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। সেদিন মানে, হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে। তিন শিবিরের তিন প্রধান মেতে উঠেছিলেন সম্মুখ সমরে। আর্য (অর্জুন), অনার্য দানব (বরাহমূক) এবং দেবতা (শঙ্কর)। তাঁদের সম্মিলিত হুঙ্কারে সচকিত হয়েছে প্রশান্ত গিরিবরাগ্রগণ্য হিমাচল। দেবকার্যে অর্জুনের নিযুক্তির প্রাক্কালে ঘটিত এই যুদ্ধ পরিবেশটি বাস্তবিকই চমৎকার।

মহাভারত শুধু ভারত-যুদ্ধের ইতিবৃত্ত নয়, আর্য অনার্য সংঘর্ষ এবং সংমিশ্রণের বহু বার্তা আছে এই মহাকাব্যে। তাই বললাম, চমৎকার সূচনা। মানব দেবতার উপস্থিতিতে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখা গেল দেবতারা অনুগত আর্যদের পক্ষ নিয়ে অনার্য অসুর দানব হত্যা করায় কত নির্বিচারী ছিলেন।

মিত্রপক্ষীয় অর্জুন মূক দানব কর্তৃক আক্রান্ত, এটুকু বোঝামাত্রই কিরাতরূপী মহাদেব শরপ্রহার করলেন মূক দানবের ওপর। অর্জুনের অহঙ্কার তাতে আহত হয়েছিল ঠিকই, কারণ তিনি চেয়েছিলেন একাই মূক দানবের মহড়া নিতে। মহাদেব কিন্তু এক নজরেই বুঝেছিলেন, একা পার্থের সাধ্য নেই দানব দমন। ছদ্মবেশী দেবপ্রধান তাই অর্জুনের সোচ্চার আপত্তি সত্ত্বেও প্রয়োগ করেন তাঁর বৈদ্যুতিক অস্ত্র ? পিনাক বা ত্রিশূল। বরাহ বাঁচেনি। তার পক্ষে রশ্মিময় অস্ত্রের ধাক্কা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সে ভারতের এক আদিম জাতির দলপতি। দৈহিক শক্তিতে প্রবল প্রতাপান্বিত। অস্ত্র শস্ত্রেও কিছু কম গরীয়ান্ নয়। কিন্তু অগ্নিতুল্য প্রতাপ সহ্য করার ক্ষমতা তারও ছিল না।

আর্য আগমনের আগে থেকেই পূর্ব ভারতে অসুর, দক্ষিণ ভারতে দানব এবং পশ্চিম ভারতে নাগজাতি বাস করতেন। এ ছাড়াও অন্যান্য অনার্য জাতির বসবাস ছিল। বিজয়ী আর্যরা এই অনার্য আদি বাসিন্দাদের ভালো চোখে দেখেন নি কোনদিন। এমন কি তাঁদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও আপত্তি ছিল আর্যদের। অনার্যদের তাই আমরা দৈত্য দানব রাক্ষস অসুর হিসেবেই জেনে এসেছি। আর্যদের দ্বারা এঁরা সব সময়ই বিকটাকার ভয়ঙ্কর জীব রূপে চিত্রিত। ভাষা-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা এ নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন ও যুক্তিযুক্ত রায় দিয়েছেন এঁদেরকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গণ্য করে। মহাভারত মন্থন করে এঁদের কিন্তু কখনো মনুষ্যরূপী কখনও বা অতিমানব

ভয়ঙ্কর প্রাণীরূপেই আমরা পেতে পারি। তাতে ধোঁয়াশার আবরণ পাতলা না হয়ে পরতে পরতে স্ফীতিলাভই করে। পণ্ডিতদের আলোচনায় দেখা যায়, সেদিন যারাই আর্য-আধিপত্য ও তথাকথিত দেবতাদের পূজা প্রণামে বাধা সৃষ্টি করেছিল, বৈদিক ব্রাহ্মণরা তাদেরই দানব-রাক্ষস বলে মনুষ্যজগত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

ডঃ এ, ডি, পুশলকারের ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'এরিয়ান সেটেলমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' থেকে এমন কয়েকটি ভারতীয় আদি উপজাতির কথা আমরা জেনে নিতে পারি: রীতিমত সম্পদশালী পানিরা ছিলেন আর্যদের শত্রু। পুরুত বামুন ও তাঁদের পূজ্য দেবতাদের কিছুমাত্র পাত্তা দিতেন না পানিরা। তাই পানি গোষ্ঠীপিতা 'বল'কে দু' টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কিরাত, কিকত, চণ্ডাল, পর্জক, সিম্যুরা বিজয়ী আর্যদের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে দাসে পরিণত হন। এঁরা আর্যসম্প্রসারণে সব সময় বাধার সৃষ্টি করেছেন। 'অসুর' জাতির পরিচয় নিয়ে প্রচুর মতভেদ। ভাণ্ডারকার ও ব্যানার্জি শাস্ত্রী মনে করেন, আসিরিয়া থেকে এদের আগমন ঘটে। আবার কেউবা বলেছেন, অসুর ছিল অতি-মানব। বেদ পরবর্তী যুগে পিশাচরাও উপজাতি হিসেবে উল্লিখিত। 'রাক্ষস' শব্দটি আর্যদের শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হ'ত। এঁদের মনুষ্যেতর বা অতিমানব বলে ধারণা করার তাই কোনো কারণ নেই। বরাহরূপী মূক দানবকেও মানুষ ভাবতে আপত্তি কোথায়? মহাভারত তাকে 'বরাহরূপী' বলেছে, স্বয়ং 'বরাহ' বলে তো উল্লেখ করেনি। রামায়ণে সুসভ্য বিক্রমশালী লাঙ্গুল চিহ্নশোভিত কিষ্কিন্ধাবাসীরা বানর জাতি হিসেবে খ্যাত। এই ভাবে কুকুর ভাল্লুক প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

'অদ্ভুতদর্শন' মূক দানবের 'বরাহরূপ' ধারণ করা খুব স্বাভাবিকভাবেই আদিমজাতির ভয়ঙ্কর রূপসজ্জার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এনসাইক্লোপীডিয়ার পাতা ওল্টালে অথবা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার আদিমজাতি-সম্পর্কিত চলচ্চিত্র দেখলে বিচিত্রিত অদ্ভুতদর্শন মানুষের দেখা পাওয়া যায়। অবশ্যই তাঁরা বিকটাকার, ভীতিপ্রদ। আবার অপর একটি সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হয়, তা হ'ল, আদিম জাতির 'টোটেম'-প্রীতি। আদিম জাতির মধ্যে বিভিন্ন জীবজন্তুর 'টোটেম' প্রচলিত ছিল ও আছে। জাতীয় 'টোটেম' অনুসারে বিশেষ জীবের মুখোশ ও আকৃতিবোধক রূপসজ্জা করে মূক দানব অর্জুনকে একা পেয়ে আক্রমণ করে থাকতে পারে। আগেই বলেছি, মহাভারতীয় যুগেও টোটেমী জাতির অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন সি, ডি, চ্যাটার্জি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পঠিত তাঁর বক্তৃতামালায়।

তবু এতো কথার পরেও কথা আছে। যে যুগটা নিয়ে আলোচনা সে যুগে আমাদের গবেষকদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। ভাষাগত গবেষণার সূত্র অনুমাননির্ভর। কিছু বিশেষ 'শব্দ' ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমানে সহায়তা করেছে। আনুমানিক সূত্র আছে বিভিন্ন। আজ যদি নোতুনতর অনুমানের ধারণা পুরোনো অনুমানকে দুহাতে সরিয়ে জায়গা করে নিতে পারে, তাহলে কিছু অদ্ভুতও হয়ত স্বীকৃতি পাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের মেনে নিতে হবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে জন্তুমানব এবং তাদের উন্নতমানের সভ্যতা থাকাও বিচিত্র নয়। ইজিপ্টের আকাশ থেকে নেমে আসা দেবতাদের বিচিত্র জন্তু-মানবসংকর আকৃতি, য়ুরোপীয় পুরাণে ঘোটকমানব পক্ষীমানব নৃসিংহ প্রভৃতি আজকের চিন্তাবিদদের নতুন করে ভাবাচ্ছে। মহাভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সময় এদের দেখা আবার পাব। আলোচনাও আবার হবে। আপাতত বরাহকে আমরা অনার্য দলপতি হিসেবেই গ্রহণ করলাম। বুঝতে পারলাম, শক্তিশালী এই অনার্যদের উৎখাত করার ব্যাপারে যে দেব-আর্যের একটা সমঝোতা হয়েছিল, চলছিল বহু যুগ যাবৎ লড়াই, ইন্দ্রকীলে কাকতালীয়ভাবে সে লড়ায়েরই একটি খণ্ডচিত্র দেখা গেল। অর্জুনের মনোনয়নের প্রাক্কালে সূচনা হিসেবে চিত্রটি যেন ভূমিকার কাজ করেছে।

আন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তিশিবিরের মেজর জেনেরাল শঙ্কর নিজের বিমানটি দূরে রেখে ছদ্মবেশে অর্জুনের সমীপবর্তী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, পরিচয় গোপন করে পার্থের সঙ্গে একহাত নকল লড়াই লড়ে তার শক্তি পরীক্ষা করে নেওয়া। চতুর সামরিক অধিকর্তা আপন পরিচয় জানাতে চাননি। পরিচয় পেলে অর্জুন লড়তেন না। তাঁর বিক্রম পরীক্ষার সুযোগ তা হলে পেতেন না দেবাধিনায়ক। কিন্তু অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটা খাঁটি লড়াই লড়তে হ'ল মূক দানবের সঙ্গে। এই লড়ায়ে আমরা তাঁকে অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে দেখলাম। মহাদেবের দেহে জড়ানো ছিল 'আশীবিষ সদৃশ' অস্ত্রাদি। অর্থাৎ আশীবিষ মানে সাপ হলেও বলা হয়েছে সেসব আসল সাপ নয়, সাপের মতই সর্পিল অস্ত্র। মজা এই, অর্জুনেরও ছিল 'আশীবিষ সদৃশ' অস্ত্র। তবু শুধু মহাদেবের মূর্তি ও ছবিতেই দেখি সাপ জড়ানো চেহারা! একি উপমাবিভ্রাট?

মহাভারতের উপমা অদ্ভুত গোলমেলে। হয়ত মূক দানবের বিশাল বপুটি বর্ণনায় প্রয়োজন, কবির উপমা দরকার; অমনি তিনি মুঠোর মধ্যে গোটা ইন্দ্রকীল পর্বতটা ভরে নিয়ে বরাহমূকের ওপর আক্রমণ করলেন। ফলে মূক দানব হয়ে যাবে 'ইন্দ্রকীল পর্বতসদৃশ'। হুঙ্কার বোঝাতে হলে বজ্রনিপাত করতে হবে। কবির আদরণীয় রাজপুরুষের শৌর্য বর্ণনায় সর্বত্র একটিই মাত্র তুলনা, ইন্দ্র। ফলত

বিবদমান দুই রাজপুরুষই হয়ে যান ইন্দ্রতুল্য বীর। আমাদের বোঝার উপায় থাকে না কাকে রেখে কার দিকে তাকাব।

এইসব বিভ্রান্তি সত্ত্বেও মহাদেবের অস্ত্রগুলিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে মহাকবি আমাদের অশেষ উপকার করে গেছেন। মহাদেবের পিনাক বা ত্রিশূল একটি ত্রিমুখী শলাকা মাত্র, তা থেকে আগুন ছোটে। বজ্র ও অগ্নি বর্ষিত হয় দেবাধিনায়কের শরসমুদয় থেকেও। মহাভারতে আছে, 'কিরাত (মহাদেব) সেই বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় ও অগ্নিশিখাতুল্য এক বান নিক্ষেপ করিলেন।'

যে মহানায়ক মহাকাশযানে আসেন, খুবই স্বাভাবিক, তাঁর কাছে লেসার রশ্মিক্ষেপক অস্ত্রও থাকবে। এই গোলকের বিজ্ঞানীরা ষাটের দশকে লেসার তত্ত্বকে আয়ত্ত করলেও অসম্ভব কি সেদিনের বুদ্ধিমানরা সে যুগেই লেসাবের ব্যবহার জেনে ফেলেছিলেন। জানাই তো স্বাভাবিক। মহাকাশযাত্রীর ক্ষেত্রে লেসারের সাহায্য যাত্রাকে সহজসাধ্য করে। মহাকাশে মহাকাশযাত্রীকে পথনির্দেশ করা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করা, মহাকাশের বিস্তৃত পরিমাপ ও পৃথিবী পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে কম শক্তিসম্পন্ন সঙ্কেতকে প্রবর্ধিত আকারে প্রেরণ করা লেসার রশ্মির দ্বারাই সম্ভব। লেসার রশ্মিই পারে চোখের পলকে নাশকতামূলক কাজ করতে। তাই মহাদেবের পক্ষে চোখের পলকে শত্রুনিধন এবং দেবানুগ্রহপুষ্ট মুনিবরের পক্ষে কথায় কথায় ভস্ম করা (ত্রাসসৃষ্টিকারী মুনি দুর্বাসার ক্রিয়াকলাপ স্মরণীয়) সম্ভব। লেসারই পারে আন্তর্নাক্ষত্রিক যোগাযোগ সৃষ্টি করতে : '...most exciting possible use for the laser is as a means of communicating over long distances, perhaps one day even with intelligent beings on the planets of other stars, if indeed life does exist beyond the Earth.' (Children's Britannica, vol. 10). সেদিন যদি ঝাঁকে ঝাঁকে আন্তর্নাক্ষত্রিক বুদ্ধিমানেরা পৃথিবীতে এসে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তাঁরা জানতেন লেসার রশ্মির ব্যবহার। লেসারের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের (দিব্য ক্রিয়াকাণ্ড ?) কথা মনে রেখে মহাভারত পাঠ করলে কত দিব্য ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা মিলে যায়। এমন কি বিশ্বরূপ দর্শনেরও বুঝি আভাস পাই আমরা লেসারের কল্যাণেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি :

'শিকাগো শহরে ১৯৬৭ সালে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দর্শকবৃন্দ দেখলেন, গৃহছাদ ও মেঝের কার্পেটের মধ্যে শূন্যে একটা সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক ঝুলছে। দর্শকরা ওটা ছুঁতে গিয়ে বিফল হলেন, কারণ ঐ ট্যাঙ্ক ছিল একটি (আলোক) চিত্রমাত্র।' (শ্রীশৈলেন দত্ত অনূদিত ক্রীড্রিশ লোরেঞ্জের 'রহস্যময় রশ্মিলোক' দ্র:)। শূন্যে একটি বিশাল ট্যাঙ্কের দিব্যদর্শন ঘটানোও লেসার রশ্মির পক্ষে সম্ভব। শঙ্করের

পক্ষেও তাই অসম্ভব ছিল না লেসর রশ্মিক্ষেপকের সাহায্যে বরাহকে চোখের পলকে খতম করে ফেলা। লেসর সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করেছি।

তিন প্রধানের এই যুদ্ধে দেখা গেল শঙ্কর তাঁর ত্রিশূলাস্ত্রের প্রয়োগে বরাহকে যখন খতম করছেন। বলা হয়েছে, তখন তাঁর ত্রিশূল থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হয়েছে। অর্থাৎ শঙ্কর প্রয়োগ করেছিলেন বৈদ্যুতিক অস্ত্র।

আগেই বলেছি, এমনি কোনও অস্ত্রের অধিকার লাভ করেছিলেন হয়ত দুর্বাসা দেবতাদের কাছ থেকে। তাই তিনি ও তাঁর সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণ-বাহিনীকে ভয় করতেন রাজা প্রজা নির্বিশেষে তৎকালীন আর্যাবর্তবাসী।

প্রথম আবির্ভাবেই শঙ্কর তাঁর বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য প্রদর্শন করে মুগ্ধ করলেন অর্জুনকে। অর্জুন বিশ্বাসী হলেন দৈবী শক্তিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলেন বহিরাগত শক্তিশিবিরের পায়ে।

মহাদেবের প্রত্যাবর্তন

কিরাতের ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্জুনের শক্তি পরীক্ষায় আসার সময় তাঁর বিমানটি দূরে রেখে এসেছিলেন শঙ্কর মহাদেব। অতঃপর অর্জুনের কাছে স্বরূপ প্রকাশিত হলে আর লুকোছাপার দরকার হল না, অর্জুনকে সঙ্গে নিয়েই দেবশিবিরের সামরিক প্রধান তাঁর রেখে-আসা বিমানটির উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন।

লুকিয়ে রেখে আসা বিমানটির উদ্দেশ্যে পাহাড় ভেঙে চলেছেন সর্বাধিনায়ক। সঙ্গে আছেন পত্নী উমা দেবী। ইন্দ্রকীলের চুড়ো থেকে কোথায় উড়ে যাবেন তাঁরা? কৈলাসে? মস্ত শিবলিঙ্গের মতো যার চেহারা? যে বরফ-ঢাকা চূড়াটি মানসের উচ্ছ্বসিত পবিত্র জলে পাদপ্রক্ষালন করে? জানি না। মহাভারতকার এই মুহূর্তে সে সম্পর্কে কোনই আভাস ইঙ্গিত রাখেন নি।

শুধু একটি প্রাণবন্ত ছবি। প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব মহাদেবকে অনুসরণ করছেন পৃথাপুত্র ধনঞ্জয়। বড় ম্লান আর ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে সেই বলদৃপ্ত তরুণকে। হরষে রোমাঞ্চে কৃতজ্ঞতায় সে যেন এখন একটি কাদার পুতুল। বিনয়াবনত দাসানুদাসহেন কৃতাঞ্জলিপুটে (হাত কচলাতে ?) চলেছেন সেই নায়ক মহানায়ককে আকাশ-রথে তুলে দিতে। আর মনে মনে ভাবছেন, অহো, কী সৌভাগ্য! মল্লযুদ্ধকালে আমি আজ শঙ্করের গাত্র স্পর্শ করলাম। তিনি খুশি, অতএব আমি নির্ভয়। তাঁর প্রসাদে, দেবশিবিরের সাহায্যে আমি এখন অজেয়। দিব্যাস্ত্রের তোপের মুখে দুর্যোধনরা আর টিকবে না। অবশ্যই নির্বংশ করব আমি ওদের।

যুদ্ধ আসন্ন হ'লে বড় শক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রিত ছোটো শিবিরের অধিনায়ক এই ভাবেই তো পুলকিত হন। যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত অর্জুনের 'মিশন' সফল। সামরিক চুক্তি স্বয়ং মহাদেব সই করে গেলেন। অতঃপর অর্জুন যাবেন দেবশিবিরে। শিখবেন উন্নতমানের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রাদি ব্যবহার! যখন ফিরে আসবেন, নয়া অস্ত্রের অধিকারী অর্জুনের পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবী তখন থর থর প্রকম্পিত হবে।

সস্ত্রীক মহাদেব বিমানে উঠে বসলে সগর্জনে বিমানটি উড়ে গেল আকাশমার্গে। ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে রইলেন অর্জুন। দেখতে দেখতে বিমানটি তাঁর চোখের নাগাল ছাড়িয়ে অদৃশ্য হ'ল। আবার মহাশূন্যতায় স্তব্ধ পার্বত্য পরিবেশ লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁ'র ডাকে ঝিমিয়ে পড়ল। একাকী পার্থ সেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে অপেক্ষায় রইলেন। আসবে স্বর্গের রথ। নিয়ে যাবে তাঁকে মহাকাশে। যুদ্ধ চিন্তায় ডুবে গেলেন যুদ্ধবাজ অর্জুন।

মহাদেবের বিমানটি নিয়ে অর্জুনের মাথাব্যাথা নেই। এই পৌরাণিক সমরপ্রেমিক রাজতনয়ের চরিত্রটিই যে অদ্ভুত। অতি শৈশবকাল থেকে তিনি বড় একনিষ্ঠ। পাখীর চোখ বাণবিদ্ধ করতে হ'লে চোখ ছাড়া আর কিছুই তাঁর নজরে আসে না। শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে ইতিহাসে সোনার জলে নাম লিখতে চান তিনি।

অর্জুন তাই শঙ্করের বিমানটি লক্ষ্যও করেননি। শুধু দেখেছেন, ধীরে ধীরে সেটি তাঁর চোখের ওপর অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিমান সম্পর্কে অর্জুনের এই নির্লিপ্ত আমাদের একটু ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্ন জাগে, অর্জুনের চোখে আকাশ যান কি তবে সেই মাত্র প্রথম-দৃষ্ট নয়? তিনি কি আগেও অনেক বিমান দেখেছেন? যদি না দেখে থাকেন, তবে যতই যুদ্ধোন্মাদ হন না কেন বিমানটি তাঁকে নিশ্চয় চমৎকৃত করত। ইজেকিয়েলের মত তিনিও ভাবতেন, তাঁর চোখের সামনে 'স্বর্গ খুলিয়া গেল'। তাই মনে হয়, ইতিপূর্বে নিশ্চয় বিমান দেখেছিলেন অর্জুন। কৌতূহল সেজন্যই তাঁর ক্ষেত্রে তেমন দানা বাঁধেনি।

সে সময় হিমালয়ের ওপর একাধিক বিমানের গতায়াত ছিল। দেবতারা পার্বত্য উপত্যকায় বিমানে চড়ে ওঠানামা করতেন। তাই শিশুকালেই অর্জুনের পক্ষে উড়ন্ত বিমান দর্শন অথবা বিমান সম্পর্কে পর্বতচারী মুনিদের কাছে গল্প শোনা সম্ভব।

আগেই দেখেছি, শতশৃঙ্গ পর্বতে কুন্তীগর্ভে পাণ্ডবদের জন্ম হয়েছিল এবং দেবতারা কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হতে এসেছিলেন দেববিমানেই। তাছাড়া যে মুনিরা একদিন পাণ্ডুর সুমুখ দিয়ে ব্রহ্মলোকে যাচ্ছিলেন, তাঁরা পাণ্ডুকে বলেছেন, ব্রহ্মলোকে বিমানপোত দৃষ্ট হয়। বিমান তখন ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে অপরিচিত বস্তু ছিল না।

কিন্তু আকাশযানে দেবসমাগম লক্ষ্য করেও অর্জুন যে ইজেকিয়েল বা এনকের মত বিস্মিত হননি, তার বাস্তব কারণ হয়ত এই যে, প্রাচীন ভারত আকাশযান সম্পর্কে তখন আদৌ অনভিজ্ঞ নয়। মহাভারতপূর্ব যুগে রাম রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, হনুমান আকাশপথে যাতায়ত করেছেন। রাবণের ছিল পুষ্পক, পরশুরামের ছিল শক্তিশালী জেট বিমান (?)। পরশুরামের বিমান অবতণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে রামায়ণে। সে বিমানাবতরণ শক্তিশালী জেট বিমানকেও স্মরণে আনে।

পরশুরামের আকাশযান অবতরণ করেছিল এইভাবে : "প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল ; সূর্য অন্ধকারাবৃত হইলেন ; সকলেরই দিকভ্রম হইল। ১—১৪। তখন দশরথের সমস্ত সৈনিক-পুরুষও ভস্মাবৃত হওত অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া পড়িল। তৎকালে বশিষ্ঠ, অন্যান্য

ঋষি ও সপুত্র রাজা দশরথ, ইঁহারাই সজ্ঞান ছিলেন। অপর সকলেই অচেতন হইয়াছিল। অধিক কি, সেই ঘোরতর অন্ধকারের সময়ে রাজা দশরথের সেই সৈন্য ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। অনন্তর রাজা দশরথ, কৈলাসের ন্যায় দুর্ধর্ষণীয়, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান, সামান্যজনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডলধারী ও ভয়ঙ্কারাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু ও হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ (লেসর রশ্মিপ্রাস-সমান কোন অস্ত্র কি ?) একটি ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরান্তকর শঙ্করের ন্যায় অভিমুখে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। ১৫—১৯।" পরশুরামের এই অগ্নিবর্ষী সচীৎকার আগমনের প্রাকমুহূর্তে "চারিদিক হইতে পক্ষীসকল ঘোরতর শব্দ" করেছে। বাল্মীকি সবই বলেছেন, কিন্তু তিনিও পরশুরামের উড্ডীন যানটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। সেকালে এমন বহু আকাশযানের সঙ্গেই মুনি ঋষিরা হয়ত সম্যক পরিচিত ছিলেন। আজ একটি হেলিকপটার বা প্লেন অবতরণ করতে দেখে আমরা তাকে বর্ণনা করে অনভিজ্ঞ পাঠককে বস্তুটি যেমন জানাতে যাই না রামায়ণ মহাভারতের কবিরাও তেমনি তার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি।

মহাকাশচারীরা ব্যবহার করতেন যে মহাকাশযান তা অবশ্য কোনো ভারতীয় রাজা রাজড়ার ছিল না। নারদ একটি আধুনিক ক্যাপ্‌সুলসদৃশ রকেটের অনুরূপ আকৃতির ঢেঁকি নামক যান ব্যবহার করতেন। তবে নারদও তো দেবতা, তিনি দেবর্ষি। ঘুরতেন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। পরশুরামের যানটির বর্ণনা না থাকলেও তার আগমনের প্রতিক্রিয়া, তার ভয়াল অগ্নিনিঃসরণের কথা ও তার প্রচণ্ড গতির উল্লেখ আছে। গতি সম্পর্কে রামায়ণের বর্ণনা ঃ রামের কাছে পরাজিত হয়ে পরশুরাম তাঁর সকল অস্ত্র সমর্পণ করলেন কিন্তু প্রার্থনা করলেন, "হে কাকুৎস্থ ! যখন আমি কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলাম, তখন আমার গুরু সেই কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার রাজ্যে বাস করিও না।' হে কাকুৎস্থ !......তদবধি তাঁহার বাক্যানুসারে কখন এই পৃথিবীতে রজনী অতিবাহন করি না ; সুতরাং আমাকে মনের ন্যায় দ্রুতগমনে মহেন্দ্র পর্বতে যাইতে হইবে, অতএব আমার গতিশক্তি (আকাশযানটি) বিনাশ করিবেন না। ৯—১৫।" (বন্ধনী আমার)।

বিজয়ী রামচন্দ্র যখন লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত হলেন তখন তিনি বিভীষণকে পুষ্পক রথ (বিমান) তৈরী করার আদেশ দেন। বিমানটি ছিল বহু যাত্রী বহনে সক্ষম রীতিমত একটি এয়ার বাসের মত। কেন না বিমানটিতে রামের সঙ্গে বিভীষণ সুগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরগণসহ বানর জাতীয় সুন্দরী রমণীরাও অযোধ্যায় গেছলেন। রামায়ণের বর্ণনা ঃ "......ধনপতির

(বিমানটি রাবণ হিমালয়বাসী দেব-খাজাঞ্চী কুবেরের কাছ থেকে জয় করে নেন) সেই বিমান রঘুনন্দনের অনুমত্যানুসারে আকাশে উৎপাতিত হইল। তৎকালে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত হংসযুক্ত (সম্ভবত হংস-প্রতীক চিহ্নিত অথবা হংসাকার মডেলে নির্মিত) বিমানে আরূঢ় হইয়া নভোমণ্ডলে আহরণ করত রামচন্দ্র সাতিশয় পুলকিত ও হৃষ্ট হইলেন।" (চতুর্বিংশত্যধিক শততম সর্গ / বঙ্গবাসী প্রকাশন / ২১—২৭—কোটেশনের মাঝের ব্রাকেট আমার)। আরও বলা হয়েছে, সেই বিমানটি "মহাশব্দে উত্থিত হইল"। (ঐ, পরবর্তী সর্গ / ১)।

হংস-চালিত কোন দৈবযান হলে মহাশব্দের কথা লেখা হত না। এই সঙ্গে আকাশযানের গবাক্ষ পথ দিয়ে সীতাকে রামচন্দ্র অপসৃয়মান সমুদ্র, সেতুবন্ধ, কিষ্কিন্ধ্যা নগরী, সুগ্রীবপুরী, ঋষ্যমূক পর্বত, পম্পাসরসী, রমণীয়া গোদাবরী, অগস্ত্যাশ্রম, চিত্রকূট পর্বত, ভরদ্বাজ আশ্রম প্রভৃতি দেখাতে দেখাতে অনতিবিলম্বে অযোধ্যার মাথায় এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, "অয়ি জনকনন্দিনি! ঐ আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যা নগরী দৃষ্ট হইতেছে। সীতে, অযোধ্যায় পুনরায় আসিয়াছ, উহাকে প্রণাম কর।' তখন রাক্ষস বিভীষণও হৃষ্টচিত্তে বারংবার উৎপাতিত হইয়া (উঠে গবাক্ষের কাছে গিয়ে) দূর হইতে সেই অযোধ্যা নগরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া তাহারা দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায়, সেই সুধাধবলিত অট্টালিকা-পরিশোভিত…সুবিস্তীর্ণ রাজপথ-শোভিত অযোধ্যা নগরীকে একাগ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।" (ঐ / ৫১-৫৪ / ব্রাকেট আমার)।

যাঁরা আকাশ পথে ভ্রমণ করেছেন, উড়োজাহাজ থেকে নিচের দৃশ্য তাঁরা এভাবেই দেখে থাকেন ও দৃশ্যমান সমতলকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে দেখেন। বর্ণনাটি এতো নিখুঁত যে, আকাশ ভ্রমণের বাস্তবতা আপনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন বিমানে দেবগণ

দেববিমান সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনে কোথাও এতটুকু যত্নের ত্রুটি রেখে যান নি মহাভারতকার। তাঁর বর্ণনা উত্তর পুরুষকে বলতে চেয়েছে, আমি যা বলছি, সব সত্যি, সবটুকুই বাস্তব, অবিশ্বাস কোরো না।

নক্ষত্রলোকে মহাদেবের প্রত্যাবর্তনকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কবি লিখে-ছিলেন, আকাশ মার্গে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি 'অর্জুনের সমক্ষেই'; অর্থাৎ এই প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অর্জুন। অর্জুন আর্যাবর্তের এক রাজকুমার, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং অকুতোভয়। তিনি যা দেখেছিলেন তার সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। মহাদেবকে তিনি অলৌকিক উপায়ে উবে যেতে দেখেননি, দেখেছিলেন, "অস্তাচল গমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় (তিনি) দেখিতে দেখিতেই অর্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন" (বন, কালী)।

কবির আয়ত্তে উপমার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তবু বর্ণনাটিকে বাস্তব করার জন্যই তিনি বিমানের আলোটিকে অস্তাচলগামী সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাতে চেয়েছেন সেই আলোকের দীপ্তি সূর্যের মত প্রখর তীব্র ও জ্বালাময়ী নয়, সেই আলোকদীপ্তি ছিল অস্তগামী সূর্যের মতই লালাভ, নিরুত্তাপ এবং দর্শক সেই দীপ্ত আলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে পেরেছিলেন। সে আলোক যদি সূর্যের সমান হ'ত, অর্জুন চোখ তুলে মহাদেবের প্রস্থানপর্ব লক্ষ্য করতে পারতেন না। অকারণে কবি নিশ্চয় এতো পরিশ্রম করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাটি শ্রোতার মনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

ঠিক একই রকম প্রযত্ন নিয়েছিলেন তিনি অন্যান্য দেববিমান বর্ণনার ক্ষেত্রেও। মহাদেবের মহাকাশ যাত্রার কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্রকীলের পার্বত্য উপত্যকায় এসে নামতে শুরু করলেন অন্যান্য দেবতারা। তাঁদের বিমানগুলির সঙ্গেও সূর্য-সংকাশ রহস্যময় রশ্মির কথা আছে। আকাশ থেকে সেগুলি নেমে এসেছিল চতুর্দিক আলোকোদ্ভাসিত করে। লক্ষণীয়, এই এতোগুলি বিমানাবতরণের প্রসঙ্গে কিন্তু কোথাও শব্দ বা গর্জনের উল্লেখ নেই। গর্জনের উল্লেখ না থাকায় মনে হওয়া স্বাভাবিক, ঐ দেববিমানগুলি ছিল নিঃশব্দ। নিঃশব্দ বিমানের অস্তিত্ব তখন এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপারও নয়। আগেই বলেছি, ভরদ্বাজ পুঁথি তৎকালীন বিমানের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা যে কোনো অত্যাধুনিক বিমান অপেক্ষা উন্নততর ছিল। বলা হয়েছে ঃ

"পৃথিব্যপ্স্বন্তরীক্ষেষু খগবদ্বেগতসৃস্বয়ম্
যঃসমর্থো ভবেদ্বন্তং স বিমান ইতি স্মৃতঃ ॥"

যে যন্ত্র আপন শক্তির সাহায্যে পক্ষীর ন্যায় জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারে তাহাকেই বিমান বলা হয়।" ('নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন', দানিকেন। অনুবাদ : অজিত দত্ত, লোকায়ত প্রকাশন)।

একটি অত্যাধুনিক বিমানও স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, সী প্লেন জলেও ভাসে। পুরাকালে তেমন মহাকাশযানও ছিল। ভরদ্বাজ পুঁথি তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানায় : "দেশদ্দেশান্তরং তদ্দ্বীপদ্বীপান্তরং তথা। লোকাল্লোকান্তরং চাপি যোঽম্বরে গন্তুমর্হতি। স বিমান ইতি প্রাক্তো খেটশাস্ত্রবিদাং বরৈঃ॥" "যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এক দেশ হইতে অন্য দেশে এবং এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে গমন করিতে পারে, বিমান বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে বিমান বলেন।" (ঐ)। এবং সে বিমান অভঙ্গুর, অদাহ্য, তাকে না যায় বিভক্ত করা, না পারা যায় ধ্বংস করতে। সুতারাং এমন উন্নত মানের 'কলম্বিয়া'র যুগে (বিমান এবং রকেটে আকৃতিগত প্রভেদও আজ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে) বিমান যে নিঃশব্দে গমনাগমন করতে পারত এতে আর সন্দেহ কি।

খৃষ্টীয় শতকেও নিঃশব্দ 'অউব' বা 'অজানা উড়ন্ত বস্তুর' খবর পাওয়া গেছে য়ুরোপ, আমেরিকা থেকে। এ ধরনের বেশ কিছু 'অউব' ছিল শব্দহীন। 'অউব' সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করেছেন ও পশ্চিমী দেশগুলি সেই সব আজানা উড়ন্ত বস্তু বা 'অউব' সম্পর্কে বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিশন বসাতেও বাধ্য হয়েছেন। ফলাফল অবশ্য বিশ্ববাসীকে জানানো হয় নি। আমেরিকা ও রাশিয়া মহাকাশ গবেষণা স্তরে এ সব প্রশ্নকে একান্ত 'টপ সিক্রেট' করে ফেলছে। এ জন্য বিদেশী পত্র-পত্রিকায় আলোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ 'অউব' ব্যাপারটা, যাকে আমরা উড়ন্ত চাকি বলে জানি, এমন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের পর্যায়ে আজ রয়েছে যার থেকে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, উড়ন্ত অজানা বস্তু কোনো লোকরটনা নয়, তার কিছু না কিছু বাস্তব অস্তিত্বকে বিজ্ঞানীরা অবশ্যই স্বকৃতি দিয়েছেন। এবং সে জন্যই আজ গ্রহান্তর সম্পর্কে সহস্র প্রশ্ন ও শতাধিক পুস্তক চারদিক ছেয়ে ফেলছে। তাই বলছিলাম, আজও যদি, কোনো নিঃশব্দ 'অউব' পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে একাধিকবার আনাগোনা করে থাকে আর তাদের বেশ কিছুই যদি শব্দহীন হয় তবে সেদিনের সেই শব্দহীন বিমানের সম্ভাব্যতায় অবিশ্বাস রাখার আর কোনো সুযোগ থাকে না। কেননা আমরা বুঝতে পারছি, সেদিন যারা এসেছিলেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিদ্যা অত্যাধুনিক আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না। এ সব কারণে আমার মনে হয়, দেবগণের বিমানগুলি সম্পর্কে রশ্মির কথা উল্লেখ করলেও মহাভারতকার যে শব্দের প্রসঙ্গে উচ্চবাচ্য করেন নি, তার কারণ সেগুলি সম্ভবত নিঃশব্দ ছিল।

নাহলে গর্জনের কথাও থাকত। মহাকবি পরিশ্রমী। ডিটেল বর্ণনায় তাঁর আলস্য থাকার কথা নয়। শব্দ সম্পর্কে সুতরাং তিনি চুপ করে থাকবেন কেন?

দেবতারা ইন্দ্রকীলে অবতরণের পর নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করে বললেন, "হে পার্থ! দেখ, আমরা সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি।" (লোকপাল সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী আলোচনা পাঠককে আবার স্মরণ করতে বলি)।

লোকপালের মধ্যে প্রথম যিনি বিমান থেকে অবতরণ করলেন, মহাকবি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন বরুণদেব বলে। তাঁর পরে এসেছিলেন অদ্ভুতদর্শন কুবের। তিনি এলেন "আকাশমার্গ সমুদ্দ্যোতিত করিয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্বক।" এলেন অতঃপর ধর্মরাজ যম "বিমানালোকে···সমুদয় লোক আলোকময় করিয়া"। সবশেষে নামলেন দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে তাঁর মহেন্দ্রাণী। ইন্দ্রের মধ্যে আরও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর মাথায় ছিল 'পাণ্ডুবর্ণ ছত্র'। ছত্রটি কিন্তু ছাতা অথবা মহারাজের মুকুট নয়। ছত্রটি যেন 'তারকারাজ চন্দ্রমা শ্বেতবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন'। [বন, কালীপ্রসন্ন সিংহ]।

এমন বর্ণনায় একটু থামতে হয়। ভাবতে হয়, বস্তুটি কেমন? কোথাও কি এ জিনিস দেখেছি আমরা? তখন চোখের সামনে কিছু মিশরীয় দেবতা ও ফ্যারাওয়ের মূর্তি ভেসে ওঠে। মাথায় তাঁদের ট্রানজিসটার রেডিওর এরিয়ালের মতো তিন বা ততোধিক ধাতুনির্মিত বস্তু। এমন জিনিস সাদা বরফ চুড়োওয়ালা পর্বতের প্রেক্ষাপটে নিশ্চয় ঝকমক করবে। আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হবে তার থেকে। আর দানিকেনকে প্রশ্ন করলে আমরা কি জবাব পাব? তিনি কি বলবেন, ইন্দ্রের মাথার ঐ অপার্থিব ছত্রটি বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী আণ্টেনা? মহাকাশচারীর মাথায় এমন আণ্টেনা থাকতেই পারে। পুরাযুগের ছবিতে, পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ উড়ন্ত মানুষের মাথায় ও পৌরাণিক দেবতাদের মাথায় সর্বত্রই দানিকেন এই রকম আণ্টেনা আবিষ্কার করেছেন।

মহাভারতের এক নম্বর ইন্দ্রের সঙ্গে পার্থের দেখা হয়েছিল ইন্দ্রকীল পর্বতে আসা মাত্রই। ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন সে ইন্দ্রের চেহারা কৃশকায়। তাঁকে যথেষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষ বলে মনে হয়নি। সেজন্য আমার তর্ক ছিল, চকিতে দেখা সেই ইন্দ্র দেব সেনার অধ্যক্ষ হতে পারেন। কিন্তু তিনি দেবরাজ নন। ইন্দ্র দেবসেনাধিনায়কের পদবিমাত্র। কার্তিকেয় ইন্দ্রপদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাই ইন্দ্র এক নন, বহু।

যিনি বিমানে চেপে ইন্দ্রকীলে নামলেন ও অর্জুনকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, দেবরাজ হিসেবে তিনিই মান্য। তাঁর অণ্টেনাযুক্ত শিরস্ত্রাণ ও মর্যাদা এবং আকাশ থেকে মহেন্দ্রাণীসহ অবতরণ, ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। এক নম্বর

ইন্দ্র হলে তাঁকে আকাশ থেকে নামতে হ'ত না। জটাজুটধারী সেই এক নম্বরকে পর্বতবাসী মনুষ্য হিসেবে আমরা দেখেছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্রে কিন্তু ব্রহ্মশ্রী অথবা জটাজুটধারী সাধুর খোঁজ করলে হতাশই হতে হয়। যুদ্ধবাজ এই দেবতাটি লম্পট, চোর, হিংস্র, আবার দাতা ও শক্তিমান, যদিও পরাজিত হলেই তাঁকে সর্বাধিনায়কের কাছে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এ'র প্রধান কাজ ছিল অসুর নিধন। তাই বেদের যে ইন্দ্র ছিলেন বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা, যাঁর কাজ ছিল অন্ধকার খরা দূরীকরণ, মহাভারতীয় যুগে সেই ইন্দ্রের নাম গ্রহণ করে মহাকাশচারীদের সেনাধ্যক্ষ ইন্দ্র হলেন অসুর নিধনকারী যুদ্ধের দেবতা।

ডঃ আর্থার এ ম্যাকডোনেল তাঁর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে ইন্দ্র সম্পর্কে বলেন, ইন্দ্র became the god of battle and is more frequently invoked than any other deity as a helper in conflicts with earthly enemies. In the words of one poet, he protects the Aryan colour (Varna) and subjects the black skin, while another extols him for having dispersed 50.000 of the black race..."

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক নম্বর ইন্দ্রের সঙ্গে দু'নম্বরকে মেলানো যায় যায় না। আর আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা, ঈশ্বর ইন্দ্র কালা আদমি নিধন করার জন্যই একদিন হিমগিরি শীর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বহু মনুর মত বহু ইন্দ্রের কথাও আছে। আছে মহাভারতেও। রামায়ণের যুগে ইন্দ্র পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন রাবণ পুত্রের হাতে। তাই রাবণ পুত্রের নাম ইন্দ্রজিৎ।

সফল মিশন

লোকপাল যম 'মেঘ গম্ভীর স্বরে অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পার্থ !... কেবল ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে মর্তকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছ (তুমি)। তুমি বসুসম্ভূত মহাবীর্যসম্পন্ন পরমধর্মাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে, দ্রোণরক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ তোমার শরানলে দগ্ধ হইবে ! যে সমস্ত মহাবীর্যসম্পন্ন দানবদল মনুষ্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারা ও নিবাত কবচ প্রভৃতি অন্যান্য দানবগণ তোমার হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।...মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তোমারই বধ্য।'

যমের উক্তি তাঁকে তাঁর শমন সদনের অধিকর্তার পদ থেকে কোথায় টেনে নামিয়েছে ভেবে দেখুন। আমরা তো জানি, যমমহাপ্রভু মৃত আত্মার মহান বিচারক। চিত্রগুপ্ত তাঁরই সভায় মস্ত খেরো খাতা খুলে বসে থাকেন শ্মশান ঘাটের ছাড়পত্রদানকারী বৃদ্ধ কেরানীটির মত। কিন্তু হায়, এ যম সে যম নয়। মহাভারতের যম খোঁজ খবর রাখেন আর্যাবর্তে কোন্ দুই ক্ষত্রিয় শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। তিনি চিন্তিত অর্জুন তথা পাণ্ডবদের জয় সম্পর্কে। তিনি জানেন, দেবপক্ষ অর্জুনকে নিয়োগ করেছেন ! অর্জুনের মতো দেবতাদেরও প্রয়োজন কর্ণসহ ভীষ্মদ্রোণাদির নিধন। কেননা তাঁরা দুর্যোধন শিবিরের রক্ষক। আর দুর্বিনীত দুর্যোধন ভারতে কোনো বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করেন না। আন্তর্নাক্ষত্রিক প্রভুদের পরোয়া করেন না কুরু যুবরাজ। এ ছেলে তার এই দুর্বিনয়কে উত্তাধিকার হিসেবে পেয়েছে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে। অন্ধ হলেও ভারি শক্ত ছিলেন সে মানুষ ! দেবানুচর বিদুর শত উপদেশেও বৃদ্ধের মন টলাতে পারেন নি। ভীতি প্রদর্শনেও না। ইজিপ্টের ফারোণেব মতো মহাকাশচারী ভিন্‌দেশীয়দের শক্তিমত্তার খবর পেয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। সে সব সংবাদ তাঁকে শঙ্কাতুর ও বিমূঢ় করেছে ! তবু বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হননি তিনি। দেবতারা তাই জোট বেঁধেছেন ধৃতরাষ্ট্র তথা দুর্যোধনকে সিংহাসনচ্যুত করে মনোমত একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র কয়েম করার জন্য।

পরিকল্পনাটি যে অর্জুনজন্মের আগেই হয়েছিল, যমরাজ সে কথাও জানিয়ে দিলেন। বললেন, স্বয়ং ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে দেবপুত্র অর্জুনের জন্ম। পাণ্ডবরা দেবতার সৃষ্টি। দেবপক্ষের নেপথ্য শাসনের হাল ধরবেন দেব-ঔরসজাত পাণ্ডবরাই। এজন্য সমস্ত দেবশক্তি অর্থাৎ আন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তি প্রস্তুতি চালিয়ে আসছেন বহুদিন। বাছাই করেছেন তাঁরা আর্যাবর্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ

কুরুকুলকে। একমাত্র কুরুকুলই পারত সেদিন খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে বাঁধতে তার বলবীর্য জ্ঞানমেধা ও বাহুবল দিয়ে। বুদ্ধিমান মহাকাশচারীরা এসব খবর রাখতেন। চতুর গণৎকারের মত আগেভাগে সংগৃহীত খবরগুলি এমনভাবে সময়মত প্রকাশ করতেন যা তাঁদেরকে অপরের চোখে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিত।

যমরাজ যা বললেন তার মধ্যে ঈশ্বরীয় অলৌকিকতা ছিলনা। ছিল আস্থা ও বিশ্বাস। অর্জুনকে নানা আন্তর্নাক্ষত্রীয় অস্ত্র দান করার সময় তথাকথিত দেবতারা তাঁকে বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। যমবাণী তারই একটি নিদর্শন। পার্থকে বলা হল, জন্মের আগেই তিনি দেবপক্ষভুক্ত হিসেবে মনোনীত হয়ে আছেন ; মনোনীত করেছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মা দেবগণের বুদ্ধিদাতা। ইনি লড়াই করেন না, সভা করেন। সভা বসে হিমালয় পর্বতেরই এক রমণীয় উপত্যকায়। মনে আছে হয়ত, আগের আলোচনায় ব্রহ্মলোকের হদিস আমরা পেয়ে গেছি। ব্রহ্মারই পরামর্শে কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম। বৈজ্ঞানিক দেবতারা এক এক করে অবতীর্ণ হয়ে কুন্তীর সঙ্গে দীর্ঘ সংলাপে ও রতিক্রীড়ায় মেতেছিলেন।

যম আরও বলেছেন, দেবতারা তুষ্ট অর্জুনের ওপর। কারণ তিনি 'সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন' করেছেন।

অতএব যমের কাছ থেকে পৃথাপুত্র লাভ করলেন 'অপ্রতিবারণীয় দণ্ড।' শিখে নিলেন সে অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রতিসংহারের কৌশল।

বরুণ দিলেন বারুণ পাশ। সে অস্ত্র ত্যাগ ও প্রতিসংহার করার উপায়ও তখনই শিখিয়ে দেওয়া হ'ল পার্থকে। বরুণ বললেন, 'আমি তারকাসুর সংগ্রামে এই পাশদ্বারা সহস্র সহস্র মহাবলপরাক্রান্ত দানবকে বদ্ধ করিয়াছিলাম।' মিথ্যে আত্মশ্লাঘা নয় ; বরুণদেবও ছিলেন এককালে ইন্দ্র অপেক্ষা পরাক্রান্ত পুরুষ। ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে তাঁর সে মর্যাদা ক্রমশ ম্লান হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে তৎপর খোঁজখবর নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা, ডঃ আর্থার এ ম্যাকডোনেল সাহেব লিখেছেন যে, ইন্দো-ইরানীয়ান যুগে বরুণের মর্যাদা ছিল ইন্দ্রেরও ওপরে। পরবর্তী বৈদিক যুগে মর্যাদা হানি ঘটেছে তাঁর। আর ইন্দ্র যে কীভাবে ভারতীয় আদিবাসিন্দা 'অসুর'দের অপসারিত ও নিধন করতেন সেকথা তো আগেই বলা হয়েছে।

এইসব একদেশদর্শী আন্তর্নাক্ষত্রিক সেনাপতিদের আর যাই বলা যাক, ঈশ্বর বা তাঁরই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ হিসেবে মেনে নিয়ে এ'দের পায়ে পুজো নিবেদনের চিন্তা কখনোই করা যায় না। জানিনা, এজন্যই আমাদের পূজা

দেবতার তালিকা থেকে এ'রা বাদ পড়ে গেছেন কিনা। অবশ্য সম্পূর্ণ বাদ পড়েননি। এখনও পুজোপাটে এ'দের নামেও পূজা চড়ানো হয়, শ্লোক স্তব পাঠ করা হয়। তবে জনপ্রিয় দেবতার আসর থেকে উৎখাত হয়েছেন এ'রা।

কুবের দিলেন, প্রস্থাপন অস্ত্র ? অস্ত্রটি তার লক্ষ্যবস্তুকে দগ্ধ করে ! কুবের বললেন, "এই অস্ত্রের দ্বারা মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য দুর্জয় যোদ্ধাকেও পরাজয় করিতে পারিবে এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে।' বললেন, "আমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মহাসুরগণকে দগ্ধ করিয়াছিলাম।"

একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রই পর্বতশীর্ষে পার্থকে কোনো অস্ত্র দেননি। আদেশ দিয়েছিলেন উন্নত শক্তি শিবিরের অন্যতম প্রধান হিসেবে।

বলেছেন, অতঃপর পার্থের নিয়োগ সম্পূর্ণ। দেবশিবিরের মিত্রপক্ষ হিসেবে তিনি সিদ্ধিলাভপূর্বক 'দেবত্ব প্রাপ্ত' হয়েছেন। তারপর নির্দেশ ঃ "তোমাকে দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিতে হইবে ; অতএব সজ্জীভূত হও। মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া ভূতলে আগমন করিবে। তুমি সেই রথে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলে তথায় আমি তোমাকে দিব্যাস্ত্রসমুদয় প্রদান করিব।"

এখানে বলে রাখি, ভৌম স্বর্গ বদ্রীনাথ অঞ্চলে নামানোর আগে পার্থকে মহাকাশে ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল। মাতলির রথে চেপেই পার্থ মহাকাশে বেড়িয়ে এসেছেন [পরে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি] এখানে লক্ষণীয়, মহাকাশ-যাত্রার আগে অর্জুনকে বিশেষ প্রস্তুতি [সাজ পোষাক] গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্র বলেছেন, 'সজ্জীভূত হও !' খুব সঙ্গত উপদেশ, মহাকাশে তো এমনি যাওয়া যায় না।

দেবতারা সকলেই যোদ্ধা। প্রত্যেকে একই শিবিরের এক একজন সমরাধি-নায়ক। লড়েছেন ভারতের আদি বাসিন্দা অসুর দানবদের উৎখাত করে দেব-শিবিরের অস্তিত্বকে নিরাপদ করার জন্য। অর্জুনকে অস্ত্র দান ও সমরশিক্ষা প্রদানের পেছনেও তাঁহাদের সেই একই লক্ষ্য কাজ করেছে। দেশীয় এক বীরকে দেবশিবিরের মিত্রপক্ষে তালিকাভুক্ত করে চতুর দেবতারা চেয়েছিলেন, মর্ত্য-বাসীর সাহায্যেই মর্ত্যবাসীকে উৎখাত করতে। পাণ্ডবদের কোনো পুণ্য ফল নয় ; 'দেবাশিস লাভ' বলে পুরাণ কথায় যা রটনা করা হয়েছে, তা তো নিছক সামরিক চুক্তি। কোনো ঈশ্বর নন, কোনো ঐশ্বরিক ব্যাপার নয় ; এই ক্রিয়াকাণ্ড স্পষ্টতই বহিরাগতদের দ্বারা আর্যাবর্তে একটি উপনিবেশ স্থাপনার কাহিনী।

ভারতের, বিশেষ, আর্যাবর্তের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীতে হিমালয়ের গোপন প্রদেশে এভাবেই একটি যুদ্ধপ্রস্তুতির চক্রান্ত দানা বেঁধে

উঠেছিল ! তাই সফল হল পাণ্ডব প্রতিনিধি অর্জুনের হিমালয় মিশন। কুরুক্ষেত্রে বহির্নাক্ষত্রিক দেবতাদের অনুরাগী পক্ষ বা আশ্রিতদের সঙ্গে দেববিরোধী পক্ষের যুদ্ধ হয়ে উঠল অনিবার্য। দেব-পাণ্ডব শিবিরের মধ্যে সাক্ষরিত হল চূড়ান্ত সামরিক চুক্তি ঃ অর্জুনকে দেবপক্ষ সামরিক সহায়তা দান করবেন, বিনিময়ে ক্ষমতা পেলে পাণ্ডবরা আর্যাবর্তে করবেন দেবানুশাসনের প্রতিষ্ঠা. সেটাই হবে তাঁদের দ্বারা 'দেবকার্য-সাধন' ! দেব-বিরোধী দুর্যোধন-শিবিরকে যেমন পর্যুদস্ত করতে হবে, তেমনিই নিশ্চিহ্ন অথবা সম্পূর্ণ নিঃশক্তি করতে হবে আদিম অধিবাসী অনার্য অসুর দানব রাক্ষসদের, কারণ, তারাও চায়না তাদের ভারতভূমি বহির্নাক্ষত্রিক প্রভুদের উপনিবেশে পরিণত হোক। তাই তো সুযোগ পেলেই দেবতা ও দেবানুগৃহীত মুনিদের আখড়া আক্রমণ করে ওরা। সেজন্যই তো দেবপক্ষ তাঁদের বলেন, দুরাত্মা, কদাচারী, রাক্ষস !

দেবতারা সর্বজ্ঞ, মুনিরা ধ্যানে জানেন ও বিচরণ করেন সূক্ষ্মশরীরে ঃ বোধহয়, মহাভারত চোখ মেলে পড়লে, সজাগ সপ্রশ্ন মনে বুঝবার চেষ্টা করলে, দেবতা ও মুনিদের এই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের আবহমানের ধারণার ভিত নড়ে উঠবে। যাকে ভবিষ্যদ্বাণী মনে করে এতোকাল বিস্মিত হয়েছি সবাই, ঘটনা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, তা নিছক ভবিষ্যদ্-ব্যাপারে কারও ধ্যানলব্ধ উক্তি নয়। তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির অধিকারী, রাষ্ট্রনীতির বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী আজও করতে পারেন, বিশ্লেষণ ছাড়াও অনেকে শুধুমাত্র সহজাত রাজনৈতিক ইনট্যুইশন থেকেও যা ঘটবে বা ঘটতে পারে আগেই সে সম্পর্কে মন্তব্য রাখতে পারেন। বিরোধী শিবিরের পারস্পরিক শক্তি গণনা করে বলে দেওয়া যায় কার অনুকূলে আশীর্বাদী মালা নিয়ে অপেক্ষা করছেন বিজয়লক্ষ্মী ! দেবতারাও সেভাবেই বিচার করেছেন, পাণ্ডবদের জয় অনিবার্য : ধৃতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও আগেই জানতে পেরেছিল, কৌরবদের জয়ের আশা কম। এ সবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

হিমালয় স্বর্গের দেবতা

দেবরাজ ইন্দ্র বলে গেলেন, রথ আসবে। সেই রথে স্বর্গে যাবেন অর্জুন।

ব্রহ্মলোকের মত স্বর্গে যাওয়াও তখন খুবই সহজ। আর এসব জায়গায় কেবলমাত্র রাজা ও ঋষিরাই যেতে পারেন। অর্জুন যে স্বর্গে যাচ্ছেন, সেখানে পার্বত্য গুহাবাসী মুনিরা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে ঘুরে আসতে পারতেন। মহাভারতীয় বর্ণনা পড়লে অন্তত তেমনই মনে হয়। যেমন, "কোন সময়ে মহর্ষি লোমশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রদর্শনে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন।" স্বয়ং ইন্দ্রের বক্তব্যেও বোঝা যায়, মুনিদের পক্ষে পদব্রজে স্বর্গে উপস্থিত হওয়া অত অনায়াসসাধ্য ব্যাপার হয়েছিল কেমন করে।

লোমশ মুনিকে ইন্দ্র বলেছিলেন, "মহাত্মা দেব ও ঋষিগণ যাহা দর্শন করিতে অসমর্থ ও সিদ্ধাচারগণ-সেবিত গঙ্গা যে স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত বদরি নামক আশ্রমপদ বিষ্ণু ও এই জিষ্ণুর নিবাসস্থান। এই দুই মহাবীর্য আমার নিয়গানুসারে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন : ইহারা ভূমির ভারাবতরণ করিবেন।" (বন. ৫১)।

বদরিকাশ্রমে শুধু বিষ্ণুই নন, বসবাস করেছেন শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রমুখ দেবাধিনায়করা। স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণু খণ্ডে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা যখন আপন কন্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন তখন কামপরায়ণ ব্রহ্মার ব্রহ্মকপাল ছেদন করেন শিব। স্কন্দের প্রশ্নের জবাবে শিব বলেছেন, ঐ ঘটনার পর তিনি বদ্রীতীর্থে এসে বসবাস করেন।

বেদব্যাসের ঘন ঘন গতায়াত ছিল বদ্রীনাথে। ব্রাহ্মণ অগ্নিকে [অগ্নি দেবতার স্বরূপ আলোচনা করেছি, 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' গ্রন্থে] বেদব্যাস বদরিকাস্থানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। বেদব্যাসের দ্বারা পথ-প্রদর্শিত হয়ে অগ্নি উত্তর দিকে গন্ধমাদন পর্বতে যান এবং ক্রমে বদ্রীনাথে উপনীত হয়ে গঙ্গাজলে স্নান করে নারায়ণাশ্রমে গিয়ে বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করেন। স্কন্দ পুরাণ বলছেন :

উত্তরাভিমুখো বহ্নির্গন্ধমাদনমাযযৌ ॥

ততো বদরিকাং প্রাপ্য স্নাত্বা গঙ্গম্ভসি স্বয়ম্।

এই বদরিকাশ্রম যে পার্থিব স্বর্গ [আগেই বলেছি ভৌম স্বর্গের কথা] তাতে আর সন্দেহ থাকে না। সে সন্দেহ মহাভারতকারও রাখতে চাননি। ইন্দ্রের উপরি উদ্ধৃত বচনে এটাই শুধু বোঝা যায় যে, এই দেব-রক্ষিত ভৌম স্বর্গে সেদিন সাধারণের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। দেবতাদের সংরক্ষিত অঞ্চলে

কেবলমাত্র দেবতুষ্টি বিধানে সিদ্ধ দেবানুগতরাই 'অনুমত্যানুসারে' প্রবেশ করতে পারতেন।

কিন্তু মহাভারত পড়তে পড়তে বাস্তবিক বোধবুদ্ধি গোলমাল হয়ে যায়। এতো ছেলেভুলানো কথা এতোকাল নাবোঝা রহে গেছেই বা কেমন করে! শুধুই বলা হ'ল, গঙ্গাসেবিত বদ্রীস্থানে বিষ্ণুর বসবাস। বদ্রীনাথে এখন বাসে চেপেই যাওয়া যায়। তখন তা ছিল নভশ্চর শিবিরের সংরক্ষিত অঞ্চল। সবার যাওয়ার সুযোগ ছিল না। একমাত্র দেবানুমোদিতরাই পারতেন সেই দেবস্থানের আতিথ্য লাভ করতে। তা হোক। জায়গাটা কেবলমাত্র পার্থিবই নয়, আর্যাবর্তের মাথায় উত্তরাখণ্ডের ওপরে। তা, সেই নিবাসস্থান থেকে বিষ্ণু ও জিষ্ণু ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করবেন কী করে? বদ্রীস্থান পৃথিবীর তো নয়ই, ভারত মানচিত্রেরও তা বহির্ভূত নয়। বদ্রী ও আর্যাবর্তকে গুণগত ও অবস্থানগত-ভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর বহির্ভূত অঞ্চল বললেই কি একটা স্বর্গ, অপরটা মর্ত্য হয়ে যায়? এবং যে লোমশ মুনি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে ইন্দ্রের শিবিরে এসে পা ধুয়ে জলযোগ সেরে গল্প শুনছেন, তিনিই বা নীরবে ব্যাপারটা হজম করে গেলেন কী করে? রহস্যটা কী? মুনিবরের সাফা মস্তিষ্ক সম্বন্ধে স্কুলপাঠ্য ভূগোল-পাঠক ছাত্রটিও কি সন্দিহান হ'য়ে উঠবে না? 'জিওগ্রাফি'! 'জিওগ্রাফি'! বলে চীৎকার করবে না কি সে-ও? কিন্তু অতশত কৈফিয়তের ধার ধারেন না ইন্দ্র। মুনিদের বুদ্ধির দৌড় তিনি বুঝে নিয়েছেন।

বদ্রীনাথের পার্বত্য উপত্যকায় এই তো সেদিন সপরিবারে ঘুরে এলাম। ইন্দ্র যাকে গঙ্গা বলেছেন, বদ্রীনারায়ণ মন্দিরের পাদদেশ বিধৌত করে সেই তীব্রস্রোতা পার্বত্য নদী দৌড়ে নেমে চলেছে রুদ্র-প্রয়াগের অলকা-মন্দাকিনী মহাসঙ্গমের দুর্নিবার আকর্ষণে। অলকানন্দার দুই তীরে প্রশস্ত পার্বত্য উপত্যকা। একদিকে নারায়ণ পর্বত, সেদিকেই মন্দির। অপর তীরে নরপর্বত অথবা মর্ত্যলোক। মর্ত্যলোক থেকে অলকানন্দা ব্রীজ পার হয়ে নারায়ণ পর্বত তথা মন্দিরে উপস্থিত হলেই যাত্রী শুদ্ধ। পাণ্ডারা বলেন, নারায়ণ পর্বতের সানুদেশেই থাকতেন দেবতারা, সেটাই দেবভূমি, তাই স্বর্গ। অর্জুন সেদিন মাতলির রথে চেপে ঐ স্বর্গে গেছেন।

ট্যুরিষ্ট লজ থেকে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে সেই স্বর্গে ঘুরে এসেছি আমরাও। গড়ে উঠেছে সেখানে চমৎকার আধুনিক হোটেল। আজ দেবতারা নেই। তাই নরপর্বতে আটক থাকতে হয়নি। পাকা ব্রিজ দিয়ে পায়ে পায়ে দিব্যি স্বর্গে যেতে পেরেছি।

মুনি হলেই যে তাঁকে বুদ্ধিমান হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। যা ইন্দ্রোবাচ তা তর্কাতীত, লোমশের মনে এমন একটা মীমাংসা সব সমস্যার ফয়শালা করে দিয়ে থাকতে পারে। অথবা তৎকালে হয়ত দেবায়তন হিমালয়কে 'স্বর্গ' বলেই অভিহিত করা হ'ত। পরবর্তীকালে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গগমনের পর হিমালয়ের ভৌম স্বর্গ মহাকাশের অনন্ত মার্গে কল্পিত হয়েছে। তাই লোমশ মুনি ঘাড় নামক বস্তুটির ওপর মাথা নামক সমর্পিত যন্ত্রটি নেড়ে ভারি নিশ্চিন্তে প্রভু ইন্দ্রের বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। তারপর অর্জুনের স্বর্গাবস্থানের সংবাদটি উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গকে জ্ঞাপন করার মহান কার্যভার নিয়ে নেমে এসেছেন পার্বত্য পথে। স্বর্গ থেকে পদব্রজেই বিদায় গ্রহণ করেছেন! আর ভারাক্রান্ত পৃথিবীর ভারমুক্তকারী দেবতাদের দৈবী প্রতাপের কথাও হয়ত লোমশ রাষ্ট্র করেছেন সমতলে নেমে। কিন্তু কার ভারে ভারতবর্ষ তখন ভারাক্রান্ত? কোন্ ভূভার হরণের দায়িত্ব নিয়ে দেবরাজ অমন শশব্যস্ত? সে ভার হ'ল, অনার্য দাপটের ভার, দেববিরোধীদের পরাক্রান্ত অস্তিত্বের ভার। নিবাতকবচ দৈত্য পরাক্রান্ত, তার ভার। দুর্যোধন দৈত্য পরাক্রমশালী হয়ে উঠছে, সেই ভার। মুনিরা প্রচার করেছেন, অর্জুন দেবঅবতার, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ স্বয়ং দেবতা।

জটাচীরধারী যদৃচ্ছাব্যবহারকারী মুনিরা এভাবেই পাণ্ডবদের ও বাসুদেব কৃষ্ণের ভাবমূর্তি তৈরী করেছিলেন সেদিন।

কিন্তু লোমশরা যে ভুল বিভ্রান্তি ও বিপদের সৃষ্টি করেছিলেন, আমাদের তার থেকে সতর্ক হতে হবে। আনুপূর্বিক দেখতে হবে, ব্যাপারটা কী। ইন্দ্রের এমন দুর্বোধ্য বাক্যেও কেউ রা কাড়েন না কেন? তবে কি স্বর্গ বলতে আজ যা বুঝি, মহাভারতের ঠিক সেই সমকালে তেমনটি বোঝা হ'ত না? স্বর্গ ছিল শুধু সেই নভশ্চর ওবকে দেবতার বাসভূমির নাম? পৃথিবী বলতে বোঝাতো শুধু আর্যাবর্তের চৌহদ্দিটুকু? স্বর্গ থেকে নেমে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অর্থ বিশেষ দেবতাকর্তৃক তাঁর ঔরসে মানবপুত্রীর গর্ভোৎপাদন ঘটিয়ে যাওয়া? যে যে দেবতা ভারতের যে যে রাজ পরিবারে (কেন, শুধু রাজ পরিবারে কেন, কোনো পর্ণকুটিরে নয় কেন?) জন্মগ্রহণ করেছেন ব্রহ্মার পরামর্শ ও ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে, তাঁদের আবার ইন্দ্রলোকেও উপস্থিত দেখা যায়। অথচ সেই রাজন্যচরিত্র তখন হয়ত দেবতাদের পক্ষে বিপক্ষে ভূভার লাঘব ও বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত। এমন দেহধারী দেবতা স্বর্গে মর্ত্যে একই সময় উপস্থিত থাকেন কি করে?

দেবতারা যেভাবে মানুষকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' 'মহাত্মন্' প্রভৃতি সম্মান-সূচক সম্বোধন করেন এবং দেবলোকে যেমন গৃহস্থের মত মানব অতিথির যত্নআত্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, প্রাথমিকভাবে তাতেই তো মনে হয়, দেবতারা বস্তুতই এক

ধরনের অপার্থিব জীব, অপার্থিব শক্তির অধিকারী মাত্র। মানুষ তাঁদের নাম দিয়েছিল দেবতা।

সেকালে দেব-ঔরসে জাত মানব পুত্রপুত্রীর সংখ্যা পরিমাণে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে অচেনা অনিন্দ্যসুন্দর মানুষ মানুষী দেখলে অপরে তাদের দেবপুত্র দেবপুত্রী বলে সন্দেহ করত। দময়ন্তী যখন স্বামী-বিরহে পাগলিনী হয়ে পথে পথে ঘুরছেন, তখন চেদিরাজমাতা তাঁর রূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে দময়ন্তীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। দময়ন্তী বলেছিলেন, 'আমি মানুষী।' অর্থাৎ মনুষ্য শরীর-ধারিণী হলেই মানুষী হতে হবে এমন কথা নেই, তিনি সাক্ষাৎ দেবী অপ্সরা অথবা দেবপুত্রীও হ'তে পারতেন। দেবীরাও দুর্লভ ছিলেন না। গঙ্গা শান্তনুর শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন বহুদিন। তিনি ভীষ্মের জননী। এমনি বাস্তব শরীরধারী দেবতা দুনিয়ার সর্বত্রই সেদিন বিমুগ্ধ মানুষের ভয় ভীতি ও শ্রদ্ধা কুড়িয়ে বেড়িয়েছেন, তাই মনে হয়, দেবতা শব্দ বস্তুতই এক জাতের অপার্থিব অথচ মানুষরূপী শরীরধারী জীবের প্রতিই প্রযুক্ত হ'ত।

এ'রা লোকপাল হলেও ঈশ্বরের বলে বিশেষত বলীয়ান ছিলেন না। দেবতা ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, একথা উঠেছিল হয়ত এই কারণে যে, বিজ্ঞানী সেই বহিরাগতদের কাছে ছিল বৈজ্ঞানিক প্রাযুক্তিক জ্ঞান। সে যুগে এক অর্থে যথার্থ-ভাবেই তাঁদের ঈশ্বরের দূত বলে গণনা করা হয়েছে। ভাবতে গেলে, বৈজ্ঞানিকই তো মানুষের বস্তুত চাক্ষুষকরা দেবতা। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ছিল প্রকৃতিপালিত। তাই প্রাকৃতিক লীলাকেই তারা বিশ্বস্রষ্টার বিভিন্ন শক্তির রূপময় প্রকাশ হিসেবে পূজো করেছে। তারপর যে প্রথম এসে প্রকৃতির ওপর আপন নিয়ন্ত্রক শক্তির পরিচয় দিয়েছে, অপরিপক্ক বিজ্ঞানবুদ্ধির জন্য বিস্মিত মানুষ তারই পায়ে দিয়েছে পুষ্পাঞ্জলি। ভেবেছে, সেই বিজ্ঞানীই ঈশ্বর-প্রেরিত দেবতা।

তাই তো দেখি দুনিয়ার সব ধর্মে ঈশ্বর মূলত এক হ'লেও দেবতা বহু। দেবতারা ঈশ্বর নন, ঈশ্বর প্রেরিত দূতও নন, নেহাতই বিজ্ঞানী। সে যুগে সেই উন্নত বিজ্ঞান ভিনগ্রহ থেকে রকেটে চেপে আসাই সম্ভব। তাঁদের আগমনে মানুষী জ্ঞান প্রবর্ধিত হয়েছিল।

মহাভারত থেকে দেবতাকে এভাবেই জানা যায়।

স্বর্গীয় রকেট

মহাভারত বললেন, ইন্দ্রপ্রেরিত মাতলির রথে চেপে অর্জুন যাবেন স্বর্গে উন্নতমানের যুদ্ধকৌশল শিখতে ও কিছু ভিনগ্রহের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আনতে। বোঝা গেল, সে স্বর্গ শান্তির তপোবন নয়, হিংসার পীঠস্থান। অর্জুনের স্বর্গে অপেক্ষা করে ছিল উর্বশীর উষ্ণ আশ্লেষ, মদ্য, মাংস, নৃত্যগীত, এবং যুদ্ধ!

"অর্জুন দেবরাজ রথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি (ইন্দ্র বিমানের চালক) রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।" [বনপর্ব, কালী, পৃঃ ৪৭]।

সেকালে অশ্ব চালিত রথও রথ, আবার বিমান ও মহাকাশযানের মতো উড্ডীন বস্তুও রথ। মাতলির রথ প্রচণ্ড বেগে ওড়ে। আর "বায়ু বেগগতি দশসহস্র তুরঙ্গম (দশ হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন এঞ্জিন ?) সেই দৃষ্টি বিলোভন মায়াময় রথ বহন করিতেছে।"

কৃতজ্ঞ এবং ভক্তিমান অর্জুনের চোখে এ সময় সব কিছু মায়া বলেই তো মনে হবে। আমাদেরও হয়। কোনো ব্যাপারে কৃতকার্য হলে ভাবি, সকলি 'তাঁহার ইচ্ছা'। গুরু কৃপাহি কেবলম। অর্জুনও সব কিছুকেই মায়াভ্রম করবেন আনন্দ-প্রাবল্যে, এতে আর সন্দেহ কী। ভালোভাবে স্বার্থ সিদ্ধি হলে মানুষের অন্তর মাঝে মাঝে মহান হয়। এই মহান হওয়াটাই তো মস্ত মায়া।

ইতিপূর্বে বিমানে চেপে দেবতারা নেমেছিলেন, কিন্তু তার গর্জন ও প্রচণ্ডতা এমন ছিল না। ইন্দ্ররথ নামছে,—"বেগে জলদমালা (মেঘ) ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্মল হইল এবং ঘনঘটার গভীর গর্জনসদৃশ নির্ঘোষে দিক সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।"

ঐ প্রায় একই রকম বেগবান ও সগর্জন আকাশ রথের কথা আছে রামায়ণেও। রথটির মালিক ছিলেন অপার্থিব দর্শন পরশুরাম। সে রথ প্রলয় ঘটিয়ে কেমনভাবে নামত সে কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। মনে রাখতে হবে, পরশুরাম মানুষটাও ছিলেন অদ্ভুতদর্শন অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং তাঁরও নিবাস ছিল তথাকথিত স্বর্গের দুয়ার মন্দার বা মহেন্দ্র পর্বতে। আরও বলেছি, পুরাকালে পর্বত এক সাংঘাতিক জায়গা। পার্বত্য উপত্যকাতেই তথাকথিত দেবগণ তাঁদের বিশেষ বিমানে ওঠা নামা করতেন। হিন্দুদের দেব-ভূমি ছিল হিমালয়, চৈনিকদের কুণ্ডলুঙ, রেড ইণ্ডিয়দের সাস্তা পর্বত আর

হিব্রুদের সদাপ্রভু থাকতেন সিনয় পর্বতে। এমন পার্বত্য উপত্যকায় যে পরশুরামের দুর্গ, নিশ্চয় তাও ছিল অসাধারণ।

মহাভারতের যুদ্ধ ১৪শ বা হাজার খৃঃ পূর্বাব্দে ঘটেছে। কিন্তু মহাভারত গ্রন্থনা হয় পাঁচশত খৃঃ পূর্ব সময়ে। পাঁচশ বিরেনব্বই খৃঃ পূর্বাব্দে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে আর একটি মহাকাশ রথ অবতরণের কথা আছে বাইবেলে। বাইবেলীয় পয়গম্বর ইজেকিয়েল দেখেছিলেন সেই মহাকাশযানটিকে। একবার নয়, একাধিকবার। বাইবেলে তার চমৎকার বাস্তব প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ আছে।

বাইবেলীয় পয়গম্বর ইজেকিয়েল [যিহিষ্কেল] একদিন নির্জন নদীতটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঠিক এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ইজেকিয়েলের চর্মচক্ষের সামনে অবতীর্ণ হলেন এক পুরুষ। নেমে আসলেন তিনি এক অবিশ্বাস্য অগ্নি উদ্গিরণকারী, মহাশব্দ-সৃষ্টিশীল উড়ন্ত যান থেকে, আর ইজেকিয়েলের সম্মুখে 'তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল', তিনি 'ঈশ্বরীয় দর্শন প্রাপ্ত' হইলেন। অর্থাৎ এক মহাকশচারীকে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হতে দেখে বিস্মিত ইজেকিয়েল মনে করলেন, তাঁর সামনে যেন স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি সভয়ে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে সেই মহাকাশচারীর [বাইবেলীয় সদাপ্রভুর] কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলেন ঃ

"আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, উত্তর দিক হইতে ঘূর্ণ্যবায়ু, হঠাৎ মেঘ ও জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি আসিল, এবং তাহার চারিদিকে তেজ ও তাহার মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা ছিল। আর তাহার মধ্য হইতে চারি প্রাণীব মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। তাহাদের আকৃতি এই, তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যেকের চারি চারি মুখ ও চারি চরি পক্ষ। তাহাদের চরণ সোজা, পদতল গোবৎসের পদতলের ন্যায় এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিত্তলের তেজের ন্যায় চাক্‌চিক্যশালী।...এই আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীদের আভা প্রজ্বলিত অঙ্গার ও মশালের আভার সদৃশ।...সেই অগ্নি তেজোময়, ও সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত। আর ঐ প্রাণিগণের দ্রুত যাতায়াত বিদ্যুল্লতার আভার সদৃশ।" [যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক / বাইবেল]

সদাপ্রভুর আকাশরথের চারটি চক্রযুক্ত পায়াকে তৎকালীন এক বুদ্ধিমান পৃথ্বীপুত্র বিদ্যুতে গড়া প্রাণীরূপে কল্পনা করেছিলেন। প্রখ্যাত রকেট যন্ত্রবিৎ য়োসেফ এফ্ ব্লুমরিশ এই বাইবেলীয় প্রতিবেদনটি বিচার করে, তার প্রযুক্তিসম্ভব নক্সা এঁকে প্রমাণ করেছেন যে সেকালে ইজেকিয়েল যা দেখেছিলেন, তা ছিল একটি বস্তুত প্রয়োগসম্ভব আকাশভেলা। [ব্লুমরিশ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, অজিত দত্ত অনূদিত 'তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল' দ্রঃ]।

ইজেকিয়েল এই দৃশ্য দেখে অভিভূত এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়লেন, কেননা তিনি বুঝেছিলেন, ঐ অদ্ভুত বস্তুটি ছিল, "সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্তির আভা।"

তখন তিনি সদাপ্রভুর সেই 'প্রতাপে'র (আকাশভেলার) অভ্যন্তর থেকে 'বাক্যবাদী এক ব্যক্তির রব শুনিতে' পাইলেন।

ইজেকিয়েল লিখে গেছেন ঃ "তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য সন্তান ! তুমি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও ; আমি তোমার সহিত আলাপ করিব।"

ইজেকিয়েল-প্রতিবেদনে লিখিত সদাপ্রভুর উক্তি এক ক্ষমতালোভী ব্যক্তির চিত্রই পরিস্ফুট করেছে।

সদপ্রভু বললেন, 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে। বিদ্রোহী জাতিগণের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি : তাহারা আমার বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা ও তাহাদের পিতৃপুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করিয়া আসিতেছে, অদ্যকার দিন পর্যন্তও করিতেছে। সেই সন্তানগণ দৃঢ়মুখ কঠিনচিত্ত (অপ্রিয় বক্তা ও অনমনীয় ?), আমি তাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি." [ঐ/২/১-৪]।

মোজেসকে নির্জন স্থানে দেখা দিয়ে সদাপ্রভু ঠিক একইভাবে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তিনি আবার এক মনুষ্য সন্তানের সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন। এবার ইজেকিয়েলকে তাঁর ভাববাদী নিযুক্ত করছেন। উদ্দেশ্য 'বিদ্রোহী' ইস্রায়েল সন্তানদের স্ববশে আনয়ন করা।

হায় ! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পৃথিবীর বিশেষ ভূখণ্ডে এইভাবে এতো পরিশ্রম করে ছেটোছুটি করতে হচ্ছে কেন ? তাঁর প্রভাব ও বিক্রমের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা এইসব কাহিনী-ই কি খণ্ডন করছে না ? পুরাকথায় সর্বত্রই দেবতা নামক ঈশ্বররা [দেহধারী] এইভাবে তাঁদের নিজস্ব প্রজা সৃষ্টি করেছেন। এক একজন নিয়েছেন এক একটি ভূখণ্ডের অধিকার। আর তাই নিয়ে বিভিন্ন দেবতার মধ্যে সংঘর্ষও উপস্থিত হয়েছে।

এই সদাপ্রভু ইজেকিয়েলকে একটি পুঁথি দিয়ে তা আত্মস্থ করতে বলেন। পুঁথিটিতে ছিল যাবতীয় আদেশ নির্দেশ ও জ্ঞান। সেই জ্ঞানার্জন করে ইজেকিয়েল হয়েছেন সদাপ্রভুর ভাবাবাদী প্রতিনিধি। সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে ইস্রায়েল-কুলের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলাম ; তুমি আমার মুখে কথা শুনিবে, এবং আমার নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবে।"

ঈশ্বর এইভাবে সর্বত্র তাঁর সামরিক বাহিনী গঠন করে প্রভাব বিস্তার করেছেন।

সদাপ্রভু ইজেকিয়েলকে তাঁর উড্ডীন যানে তুলে গোপন স্থানে নিয়ে যান। যে যাত্রার বর্ণনাও যান্ত্রিক উড়ন্ত যানে ভ্রমণের বর্ণনা। ইজেকিয়েল বলছেন ঃ

"পরে আত্মা আমাকে তুলিয়া লাইলেন, এবং আমি আমার পশ্চাৎ দিকে এই বাক্য মহানির্ঘোষের শব্দের ন্যায় তাঁহার স্থান হইতে শুনিলাম, 'ধন্য সদাপ্রভুর প্রতাপ'। [শব্দটি কি লাউড স্পীকারে জয়ধ্বনি ?] আর ঐ প্রাণীদের পরস্পরের পক্ষসমাঘাতের শব্দ, তাহাদের পাশে চক্রের শব্দ, এই মহানির্ঘোষের শব্দ শুনিলাম। আর আত্মা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখিত হইয়া গমন করিলাম ; আর সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে বলবৎ ছিল।" [ঐ / ২ / ১২-১৪]।

পয়গম্বররা যে সিদ্ধিলাভ করে ঈশ্বর দর্শন করতেন না, এই বর্ণনা তার অবিসম্বাদী সাক্ষ্য। ঈশ্বর তাঁর নিজের তাগিদেই ছুটে আসতেন। এহেন ঈশ্বরের তাগিদ ছিল উপনিবেশ কায়েম করার। পরবর্তীকালে ভাববাদী পয়গম্বররা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ঈশ্বরীয় মর্যদা লাভ করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রতিবেদন জানায়, কোনো পয়গম্বরই তথাকথিত মহাকাশচারী দেবতার খপ্পরে পড়ে নিজেকে নিরাপদ বোধ করতেন না। দেবতার উড়ন্ত যানে উঠে তাঁরা প্রত্যেকেই মনস্তাপে ভুগেছেন কেউ চাননি ঈশ্বরের সঙ্গে এইভাবে 'গমনাগমন' করতে। ঈশ্বর লাভের বসনা তাঁদের পুলকিত করেনি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিরুপায়, কেননা 'সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে বলবৎ ছিল'। অর্থাৎ নভশ্চর দেবতার হাতে তাঁরা বন্দী হয়ে পড়েছেন, বাধ্য হয়েছেন তাঁর আদেশ পালন করতে। ইজেকিয়েলের এই বর্ণনা একটি ঘোর শব্দ-সৃষ্টিকারী উড়ন্ত যানের বিশ্বস্ত খবর রেখে গেছে।

ইজেকিয়েল-দেখা সেই সদাপ্রভুর মহাকাশযানটির সঙ্গে এবার মাতলির রথটিকে একটু মিলিয়ে নেওয়া যাক।

ইজেকিয়েলদৃষ্ট মহাকাশযানটি বস্তুতই একটি প্রয়োগসম্ভব মহাকাশযান ছিল, অনেক বিচার বিবেচনা করে প্রখ্যাত রকেট বিজ্ঞানী ব্লুমরিশ তা আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর পরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে ব্লুমরিশ সাহেব বলেছেন, "পৃথিবী প্রদক্ষিণরত একটি মূল যানের সঙ্গে (ইজেকিয়েলদৃষ্ট মহাকাশযানটি) একযোগে ক্রিয়াশীল ছিল।" অর্থাৎ সদাপ্রভুর মহাকাশযানটি মূল রকেট নয়। চাঁদে যেমন আজকের বিজ্ঞানীরা চন্দ্রভেলা নামিয়েছেন, সে যানটিও ছিল তেমনি এক পৃথ্বী ভেলা। তা নিশ্চয় তাহলে মূল যানে প্রত্যাবর্তন করতে পারত।

ইন্দ্ররথও কি এ জাতীয় কোনো ভেলা ? তা কি অর্জুনকে মূল যানে নিয়ে গেছল ? অথবা কোনো ভাসমান উপগ্রহে ? এ প্রশ্নের মীমাংসা কোনো

রকেট বিজ্ঞানী করতে পারেন, তবে তারও সম্ভাবনা কম। কারণ বাইবেল যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, মহাভারতে তেমনটি নেই। মহাভারতের বর্ণনা কবির কাব্য এবং সে কাব্যেও খোদার ওপর খোদকারী আছে। আসল জিনিষের চেহারা তাই আর যথাযথ নেই। কিন্তু সেকথার আগে দুটি রথকে মিলিয়ে পড়া দরকার। আগে দুই রথের সাদৃশ্যটুকু বাছাই করে দেখা যাক।

মাতলির রথ নামে সগর্জনে মেঘপুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করে।

আর কোবর নদীতটে ইজেকিয়েল সদাপ্রভুর 'প্রতাপ' (মহাকাশযান) অবতরণ করতে দেখেন এইভাবে ঃ "উত্তর দিক (আকাশ) হইতে ঘূর্ণ্যবায়ু, বৃহৎ মেঘ (রকেট নিঃসৃত ধোঁয়ার কুণ্ডলী ?) ও জাজ্বল্যমান অগ্নি আসিল…।"

সে অগ্নি কেমন অগ্নি? যিহিস্কেল পুঁথির বর্ণনা ঃ "সেই অগ্নি তেজোময় এবং সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত।"

মাতলিও ইন্দ্ররথকে ওড়াবার সময় "রশ্মিদ্বারা অশ্বসকল সংযত" (বিদ্যুৎ সহযোগে ?) করেছিলেন। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ-প্রহারে অশ্ব নয়, ইঞ্জিনই চালু করা হয়। অগ্নি এবং ধোঁয়া অশ্ববাহিত রথে নির্গত হয় না। মাতলি-রথের অভ্যন্তর বর্ণনায়ও বিদ্যুৎ এবং বৈদ্যুতিক কয়েল লক্ষ্য করেছেন অর্জুন। উভয় ক্ষেত্রেই মেঘমালা ছিন্ন করে রথের সগর্জন অবতরণের কথা উল্লিখিত আছে।

যিহিস্কেল পুঁথি অবশ্য আরও বেশি বাস্তব বর্ণনায় সমৃদ্ধ। সেখানে মহাকাশ-যানের গর্জনকে সবিশেষ বর্ণনার চেষ্টা আছে। যেমন, সে গর্জনধ্বনি ছিল, "মহাজলরাশির কল্লোলের ন্যায়, সর্বশক্তিমানের রবের ন্যায়, সৈন্য সামন্তের ধ্বনির ন্যায় তুমুল ধ্বনি।" যানটির উড্ডয়নকালে ইজেকিয়েল শুনেছিলেন ভূমিকম্পের আওয়াজ (যিহিস্কেল, ভাববাদীর পুস্তক, ধর্মপুস্তক, বাইবেল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া)। সেই প্রচণ্ড ধ্বনি ও অদ্ভুত যান এবং তাতে আরূঢ় অপরিচিত নভশ্চর ইজেকিয়েলের মনে ত্রাস সঞ্চার করেছিল।

অর্জুনের কিন্তু তেমন কোনো দুর্ভাবনা হয় নি। তিনি বিমান দেখেছেন জন্মাবধি এবং ইন্দ্ররথের আগমন প্রতীক্ষা করেছেন। তাঁর একটা মানসিক প্রস্তুতি ছিল যার অভাব ছিল ইজেকিয়েলের মধ্যে। ইজেকিয়েল ভাবাপ্লুত হওয়ার সুযোগ পাননি। তিনি ছিলেন খুবই অনুসন্ধিৎসু এবং উত্তম রিপোর্টার। তাই তাঁর বর্ণনা পরীক্ষা করে ব্লুমরিশের পক্ষে একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে। পার্থ ছিলেন যোদ্ধা, ভাবালু, প্রেমিক এবং ভক্তিমান। তিনি শুধু মুগ্ধ হয়েছিলেন মাতলি-রথের ঐশ্বর্য, বিশালতা ও অনন্যসাধারণ আকৃতি দর্শনে। তাঁর দেখা এই

রথ অন্যান্য সাধারণ বিমান থেকে যে অনেক উচ্চমানের ছিল, মহাভারত পাঠে শুধুমাত্র সেকথাই জানা যায়। ইজেকিয়েল সদাপ্রভুর প্রতাপের কিছু যান্ত্রিক বর্ণনাও দিয়েছেন, যেমন, ভেলাটির সঙ্গে সংযুক্ত চাকা, হেলিকপ্টারের পাখা, একটি যান্ত্রিক লৌহহস্ত এবং বিভিন্ন অবস্থায় যন্ত্রভেলাটির চেহারা কেমন হয়েছে যথাসাধ্য তারও প্রতিবেদন উপহার দিয়েছেন আমাদের। [ব্লুমরিচের 'তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল', দ্রষ্টব্য]।

অর্জুন লক্ষ্য করেছেন ইন্দ্ররথের অভ্যন্তরস্থ কলকব্জা ও জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি, ইহুদি আদি পিতা এনকের দেখা মহাকাশযানের সঙ্গেই যার সাদৃশ্য সমধিক।

ইজেকিয়েল সদাপ্রভুর মহাকাশযানটিকে অবতরণ করতে দেখেন ছয়শ খৃঃ পূর্বাব্দে। এনক কিন্তু ঢের পূর্ববর্তী। মহাপ্লাবনযুগীয় নোয়ার তিনি পূর্বপুরুষ, ঠাকুর্দার বাবা, স্বয়ং আদমের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ যেরদের পুত্র। এই এনক তিনশ বছর ধরে "ঈশ্বরের সহিত গমনা-গমন" করেছেন। তিনশ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন। সুতরাং "পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।' (আদি-পুস্তক, ৫ অ, ২৪, ভারতের বাইবেল সোসাইটি মুদ্রিত 'ধর্মপুস্তক' বা বাইবেল) "And Enoch walked with God ; and he was not ; for God took him." [Gen. ch. 5. 24].

ঘটনাটি রুশ পদার্থবিদ আগরেস্টকে চিন্তিত করে। তিনি এই ঘটনাটিকে মহাকাশযানের সম্ভাব্য অবতরণ সম্পর্কিত তাঁর অনুমাননির্ভর রচনাটির অঙ্গীভূত করে নিয়ে লেখেন: In many ancient documents we find myths, legends and references to beings descending from the sky and people taken up to heaven. প্রসঙ্গতঃ আরও বলেন, পুরাকীর্তি ও পুরাণ-কথাই কালক্রমে বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা লাভ করে।

বস্তুত এনক, এজরা, অর্জুন, এতানা আর এঙ্কিডুরা স্বর্গে গেছলেন বলে যে পুরাশ্রুতি প্রচলিত, আজ তার ভিন্ন অর্থও অনুমান করার কারণ দেখা দিয়েছে। আজ বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত পিতামহবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে দূর নক্ষত্রলোক থেকে সমাগত কতিপয় মহাকাশচারীর দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হয়েছিলেন এবং তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মহাকাশ-স্বর্গে। আর এই বক্তব্যের সমর্থনে তাই আমাদের পরীক্ষা করতে হয় সেইসব স্বর্গীয় যানগুলিকে যেগুলি যুধিষ্ঠির প্রমুখকে তুলে নিয়ে যায় তথাকথিত স্বর্গধামে।

ইজিকিয়েলদৃষ্ট মহাকাশযানটির দুরন্ত গতি ও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে অর্জুনের দেখা

ইন্দ্রপ্রেরিত মাতলির মহাকাশ রথটির সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। এবার এনক অবলোকিত দেবযানটির খবর নিয়ে জানবার চেষ্টা করব, তিনটি দেবযানের মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যা রথগুলিকে দেবযানের মর্যাদা থেকে নামিয়ে মহাকাশযানের মর্ত্যমহিমা প্রদান করতে পারে। স্বর্গের সন্ধানে বার হয়েছি, স্বর্গীয় যানগুলির তথ্যতল্লাশ না নিয়ে সেখানে পৌঁছাই কি করে? তাই স্বর্গ কোথায়, এ প্রশ্নে আসার জন্যই স্বর্গীয় যানগুলি কী বস্তু তা জানা দরকার।

মাতলির রথের অভ্যন্তরে অর্জুন দেখেছিলেন, "অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি অস্ত্রসকল এবং মহাকায় জ্বলিতানন অতি ভীষণাকায় নাগগণকে"। দেখেছিলেন সেখানে, "ধবলোপলসমূহ (শ্বেত-প্রস্তর) দেদীপ্যমান রহিয়াছে।"

এনকের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে তাঁর দেখা মহাকাশযানেও একই জাতের বিস্ময়কর জিনিস তিনিও লক্ষ করেছিলেন। এনক দেখেন, "অগ্নিজিহ্বা বেষ্ঠিত স্ফটিক নির্মিত প্রাচীর।"

'অগ্নিজিহ্বার' সঙ্গে 'জ্বলিতানন ভীষণকায় নাগগণের' কি সাদৃশ্য ধরা পড়ে না? আর শ্বেত প্রস্তরের সঙ্গে স্ফটিক নির্মিত প্রাচীরের তফাৎ কতটুকু? ইজেকিয়েলদৃষ্ট মহাকাশযানের "মস্তকের উপরে এক বিতানের আকৃতি ছিল, তাহা স্ফটিকের আভার ন্যায় তাহাদের (নভশ্চরদের) মস্তকের উপরে বিস্তারিত ছিল।" অর্থাৎ স্ফটিকসদৃশ বস্তু তাঁরা তিন জনেই লক্ষ করেছিলেন বিভিন্ন কালের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। দানিকেন ঐ স্ফটিক নির্মিত বস্তুটিকে মহাকাশযানের স্বচ্ছ আবরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রাচীন প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলেই দেবযানে অগ্নি বিদ্যুৎ ও প্রজ্জ্বলন্ত বস্তু দেখেছেন। সেই অগ্নিময় উত্তপ্ত শিখা, প্রজ্জ্বলন্ত 'অঙ্গার সদৃশ' বস্তু এবং 'জ্বলিতানন নাগগণ' হেন বৈদ্যুতিক তার (?) গুলির ব্যাখ্যা রকেট বিজ্ঞানী ব্লুমরিশের বক্তব্যের মধ্যে খোঁজ করা যেতে পারে।

ইজেকিয়েলদৃষ্ট "প্রাণিগণের মধ্যস্থানে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারসদৃশ কী এক বস্তুকে" ব্যাখ্যা করে ব্লুমরিশ লিখেছেন: "শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের গনগনে বিকিরক এবং নিয়ন্ত্রক রকেটের ঝিলিক দেখেছেন তিনি। বিকিরকের উচ্চ তাপের কথা বিচার করলে, 'প্রজ্বলিত অঙ্গারের' সঙ্গে তুলনা নির্ভুল এবং যথাযথ।" [তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল]।

'নাগগণ' বলতে অর্জুন কি সর্পিল বৈদ্যুতিক কয়েলকেই বুঝিয়েছিলেন? মহাভারতে নাগ শব্দ সর্পাকার বস্তুকেও নির্দেশ করে। যেমন আগেই বলেছি, আশীবিষসদৃশ অস্ত্র বলতে সর্পাস্ত্র বোঝায় না। 'নাগপাশ'ও বৈদ্যুতিক পাশ কিনা

একথা আজ আমাদের ভাবাতে পারে। নাগপাশাবদ্ধ বন্দী সর্পাহত হন না, কেবল আটকে থাকেন।

ইন্দ্ররথের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুটা বৈজ্ঞানিক ধারণা গ্রহণের জন্যই এতো কথা। নচেৎ এসব কাজ বৈজ্ঞানিকের, আমার কর্তব্য তথ্যানুসরণ। প্রসঙ্গত আমরা বুঝতে পারি মাতলির রথ সাধারণ বিমান ছিল না। তাহলে অর্জুন এই রথ দেখে চমৎকৃত বোধ করতেন না। তিনি আশৈশব ঢের বিমান দেখেছেন। কিন্তু মাতলির রথ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, "এই অনুত্তমরথ শত শত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞেও দুর্লভ।" (বন, কালী)। সুতরাং তাঁর কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি, ইন্দ্রপ্রেরিত মাতালির রথ অসাধারণ উন্নতমানের মহাকাশযান। এ রথ অর্জুনকে যে উচ্চতম নক্ষত্রলোকে নিয়ে যায় তা সাধারণ বিমানের পক্ষে অনতিক্রমণীয়।[১]

"ইন্দ্র সারথি মাতলি......রথারোহণপূর্বক রশ্মিদ্বারা অশ্বসকল সংযত" করেন। ঘোড়ার পিঠে বিদ্যুতের চাবুক? না, নতুন পাঠ হবে, রশ্মিদ্বারা তিনি তাঁর যান্ত্রিক যানটির ইঞ্জিনগুলি চালু করলেন। ইঞ্জিনকেই যে অশ্ব বলা হয়েছে তা নিয়ে আর বিবাদ করা যায় না। তাই তো অগ্নি উদ্গীরণ হয় রথ থেকে। তাই সে রথ 'সূর্যসংকাশ দিব্যরথ।' সে যুগে যান মাত্রই রথ, সুতরাং ইঞ্জিনের পক্ষে 'অশ্ব' অভিধা লাভ করা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

মহাকাশে নিয়ে গিয়ে মাতলি কুরুনন্দনকে কী দেখালেন?

মহাভারতের প্রতিবেদন: "কুরুনন্দন সেই সূর্যসংকাশ দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্যলোকদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুতরূপ সহস্র সহস্র (অনেকানেক) বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।" সেই নক্ষত্র-লোকে "সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; লোকসকল কেবল স্ব-প্রভার দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন"। [বনপর্ব]

মহাকাশ বিজ্ঞানীরাই বলতে পারেন অর্জুন মহাকাশে কী জাতের উজ্জ্বল বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন। সেগুলি কি বিমান, না কি আর কিছু? উড্ডীন কিছু মহাকাশভেলা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও করে থাকতে পারে। বিমান ও মহাকাশ

(১) বর্তমান পৃথীপুত্ররা উড়োজাহাজ-সদৃশ ডানাওয়ালা মহাকাশযানের (কলম্বিয়ার) অধিকারী যা উড়োজাহাজের মতই অনায়াসে মহাকাশ পরিক্রমা করে পৃথিবীর মাটিতে এসে নামতে পারবে বিশেষ ভাবে তৈরী অবতরণ ক্ষেত্রে। সেকালের যান্ত্রিক কৌশল আরও হালকা যান তৈরী করে থাকতে পারে যা মহাকাশে বেড়িয়ে পার্বত্য উপত্যকায় এসেও হয়ত নামতে পারত। মাতালির রথ তো তাই করেছিল।

ভেলার গমনাগমন তখন স্বচ্ছন্দ নিত্য ঘটনা বলেই পুরা পুঁথিগুলি থেকে জানা যায়। ইন্দ্রলোকে গিয়ে অর্জুন কর্মব্যস্ত, বিমানক্ষেত্র দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, কিছু বিমান উড়ছে, কিছু নামছে, কিছু বা অবস্থানরত। হিমালয়ের পার্বত্য-ভূমিতে অবস্থিত ব্রহ্মলোকে গিয়ে মুনিরাও দেখে এসেছেন, সে প্রদেশ শত শত বিমানে পূর্ণ ঃ

"বিমান শত সংবাধাং গীতস্বন নিনাদিতাম্।" (সিদ্ধান্তবাগীশ)।

মহাকাশ ভ্রমণ ঃ তথ্য ও মন্ত্রগুপ্তি

মহাভারতে আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি একই রকম অদ্ভুত ঔদাসীন্য। সঠিক তথ্যানুসরণে তার আগ্রহ তেমন নয় যেমন বিদেশী পুরা-পুঁথিতে প্রাপ্তব্য। অর্জুনের নক্ষত্রলোক ভ্রমণের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ মহাভারতের কবির কাছে গৌণ। তিনি নক্ষত্রের প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, রাজচক্রবর্তী এবং দানধ্যানযজ্ঞশীল ব্যক্তিরাই স্বকৃত পুণ্যফলহেতু দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করে নক্ষত্র রূপে অবস্থান করছেন। এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, সেই প্রাগৈতিহাসিক মহাকাশ-চারণার যুগে কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বিভিন্ন রথযোগে অন্যতর নক্ষত্রে চলে গিয়েছিলেন তবে সেই 'যাওয়ার' বাস্তবতা কিছু থেকে থাকলে কবির দুর্বোধ্য বক্তব্যও অর্থময় হতে পারে। নচেৎ বুঝতে হয়, মানুষের মনে ভক্তি ও বিশ্বাস চিরস্থায়ী করার মানসেই কবি ঐ জাতীয় মনগড়া বক্তব্যকে মহাভারতের শ্লোকে শ্লোকান্তরে মালার মত গেঁথে রেখে গেছেন।

বিভিন্ন নক্ষত্রে যাতায়াত ও বসবাসের কথা বলাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে মাতলির বক্তব্য, বিভিন্ন নক্ষত্রে পুণ্যশীলেরা জ্যোতির্ময় রূপে বসবাস করেন, এমন কথায় কৌতূহলের সঙ্গে কান পাততে হয়। পুরাণে বলা হয়েছে, প্রহ্লাদের রাজত্ব ছিল শুকতারায়। প্রসঙ্গত একটি প্রাচীন মানচিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানচিত্রটির বয়স আনুমানিক তের হাজার বছর। পাওয়া গেছে হিমালয়ের পাদদেশে এক গুহায়। এই মানচিত্রে তের হাজার বছর আগেকার নক্ষত্রলোলোকের অবস্থান চিত্রিত আছে। মানচিত্রটি ছাপা হয় সোবিয়েত রাশিয়ার জাতীয় ভৌগোলিক ম্যাগাজিনে। ঐ মানচিত্রে শুকতারা ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য স্থান রেখাচিত্র দ্বারা যুক্ত করা আছে।

তার অর্থ কী ?

তখন পৃথিবী ও শুকতারার মধ্যে আন্তর্মহাজাগতিক সংযোগ ছিল ? মানচিত্রে পথরেখা তো ঐভাবেই থাকে। এই তথ্য কি পুরাণোক্ত প্রহ্লাদের গল্পটির উপর কিছু আলোকপাত করছে ? দূর নক্ষত্রলোকে জীবের অস্তিত্ব আছে ও ছিল বলে আজকের বৈজ্ঞানিকদেরও বিশ্বাস। আর সহস্রাধিক বছর আগে কোথায় জীবের বসবাস কেমন ছিল আমরা তা জানি না। জানবার প্রয়াস চলেছে, হয়ত একদিন তা জানাও যাবে।

কিন্তু সেইসব অনুমান নির্ভরতার ওপর মহাভারতের পুনশ্চ পাঠগ্রহণে আমি আগ্রহী নই। আমার বক্তব্যের ফেরে প্রসঙ্গটি এসে পড়ছে মাত্র। আমার ক্ষোভ,

অর্জুন নক্ষত্রলোকে গেলেন, কিন্তু মহাভারতকার সেই দুর্লভ ভ্রমণের ছিটেফোঁটা বিবরণও আমাদের জন্য রেখে গেলন না, অথচ অন্যত্র ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ব্যাবিলনীয় উপাখ্যানে বর্ণিত কীশের রাজা এতানা (Near Eastern Mythology— John Gray. Hamlyn Publishing, London ঈগলে চেপে (গরুড় রথ ?) মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন! এতানা কাব্যে তার বর্ণনা আছে। পুঁথিটি পাওয়া যায় আসিরীয় রাজা বানিপালের (খ্রীঃ পূঃ ৬৬১-৬২১) গ্রন্থাগার সংগৃহীত মৃৎফলক থেকে। দানিকেন এতানার মহাকাশ চারণার বিবরণটি থেকে বহুলাংশ উদ্ধার করে সেই আশ্চর্য ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন আমাদের। অজিত দত্তের অনুবাদ ('আমার পৃথিবী') এই রকম ঃ "কিছুক্ষণ উর্ধ্বে ওড়ার পর ঈগল এতানাকে বললেন, "দেখ, দেখ বন্ধু, মাটি কেমন বদলে গেছে। পৃথিবীর পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রকে দেখ।"

"মাটিকে মনে হচ্ছে পাহাড়ের মতন আর সমুদ্র যেন স্রোতবহা!"

তারপর আরো উঁচুতে উঠে ঈগল আবার বলেন, "দেখ, দেখ বন্ধু মাটি আরো কত বদলে গেছে।"

"মাটি এখন উপবন যেন।"

একসময় পৃথিবীর মাটিকে মনে হয় "একখানি ছোট্ট কুটীর আর সমুদ্র তার ক্ষুদ্র অঙ্গন।" তারপর "মাটি যেন একখানা পিঠে আর সাগর যেন পিঠের সরা।"

মহাকাশ থেকে তোলা বিশিষ্ট দু একটি চিত্রের দিকে তাকালে তাই তো মনে হয়।

আরো উঁচুতে পৌঁছলে পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেল। এতানা অবাক, "চেয়ে দেখি, সত্যিই পৃথিবী হারিয়ে গেল! বিশাল বারিধিও মুছে গেল চোখের ওপর। সভয়ে বললুম, "দাঁড়াও বন্ধু, চাই না তোমার স্বর্গে যেতে, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমার পৃথিবীতে।"

এতানার এই ভীতিই চিত্রটিকে সজীব ও বাস্তব করেছে। হায়, অর্জুন কেন অমন করে দেখলেন না! তাঁর কি কোনই কৌতূহল ছিল না! যুধিষ্ঠির হয়ত দেখতেন। তিনি অনেক বেশি প্রকৃতিপ্রেমিক। অর্জুন যুদ্ধবিদ্যার মত মোটা জিনিষের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর "মহাভারতের কথা" গ্রন্থে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অর্জুনের ওপর। খুঁজে পেয়েছেন তিনি যুধিষ্ঠিরের মধ্যে একজন বিচক্ষণ কবি দার্শনিককে। কিন্তু কি আর করা যাবে, যুধিষ্ঠির মহাকাশ রথে চড়ে কী দেখেছিলেন তা তো আমাদের জানার উপায় নেই। তিনি তো ফিরে আসেননি। তাঁর সহযাত্রীরাও প্রত্যাবর্তন করেননি কেউ।

এতানার মহাকাশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত উদ্ধার করে "In Search of Ancient Mysteries" গ্রন্থের লেখক Alan and Sally Landsburg লিখেছেন, মহাশূন্য থেকে এতানা যেমন দেখেছিলেন, এ যুগের নভশ্চর কার্পেণ্টার স্কটও দেখেন তেমনি একই রকম দৃশ্যাবলী। স্কট বলেন, সবকিছু মুছে গিয়ে থাকে শুধু নীল মহাশূন্য, কেননা stratosphere-এর উপরে উঠে গেলে পৃথিবী হারিয়ে যায় জলীয় বাষ্পের পেছনে। তাই চারিদিকে বিরাজ করে ধূ ধূ নীল। এতানার চোখে শেষ দিকে শুধুই সমুদ্র ধরা পড়েছে। স্কট কার্পেণ্টারও বলেছেন "One thing that struck one was the preponderance of ocean and blue." Mr. Alan এতানার ঈগলটিকে ত্রিস্তরীয় রকেটের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন, "The eagle infroms Etana that they will ascend to the place where they are going in a series of rises. I looked up, 'Sounds like the three stage rocket that puts a space craft into orbit." (ঐ)।

ওড়ার কথা এভাবেই ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাপুঁথিতে। বর্ণনাগুলি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্যভাবে মিল করিয়ে দিচ্ছে বর্তমান নভশ্চরদের দেখা আকাশ মাটির বর্ণনার সঙ্গে।

সুমেরীয় উরুকের অধিপতি গিলগামেশের বন্ধু এন্কিডুও ঈগলে চেপে আকাশ ভ্রমণে গেছলেন। তিনিও প্রায় একই রকম দৃশ্য দেখেন। ওপর থেকে মাটি ও সমুদ্রের রূপ দেখে মাটিকে পর্বত, সমুদ্রকে হ্রদ মনে হল। চার ঘণ্টা উচ্চতর পথে ভ্রমণের পর মাটিকে মনে হ'ল উদ্যান আর সমুদ্র উদ্যান পরিখা। তারপর আরও চার ঘণ্টা আরও উঁচুতে উঠে মনে হ'ল মাটি যেন একবাটি জাউ আর সমুদ্র জলকুণ্ড। ('দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?'—দানিকেন, অনুবাদ অজিত দত্ত)।

আবার সেই ত্রিস্তরীয় রকেট নাকি ? ধাপে ধাপে ওঠা ও উচ্চতর অবস্থান থেকে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন দেখা ? নভশ্চরের চোখে পৃথিবীর চেহারা অনেকটা এমনই দেখায় ! এই বিচিত্র দর্শন কল্পনার দ্বারা অসম্ভব। কার্পেণ্টার স্পষ্ট বলেছেন, পর্বত চূড়া থেকে সমতল ভূভাগ দেখা আর মহাকাশ থেকে দেখার মধ্যে ঢের তফাৎ। মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর যে সব ছবি আমাদের চোখের সামনে আজ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিই তো এসব বক্তব্যের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।

নভশ্চর দেবতাদের সঙ্গে মহাকাশে হারিয়ে যাবার আগে এনক ছেলেকে যে পুঁথি দিয়ে গেছলেন তাতে তাঁর আকাশ ভ্রমণের কথা আছে ; আছে মহাকাশ-যানের অধিনায়কের সঙ্গে আলাপের বিবরণ। বিচক্ষণ এনক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন মহাকাশে নীত হয়ে। গ্রহান্তর-বাসীদের উন্নত বিজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল সেই জ্ঞান ভাণ্ডার। এনক পুঁথিতে

আছে, তিনি চন্দ্রসূর্যের 'পরিক্রমণ পথ' সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি শিখলেন নক্ষত্রগুলির নামকরণ ও গুরুত্ব পরিমাপ করার বিদ্যা। জানলেন, "বজ্রের নিনাদের কয়েকটি স্থির সূত্র আছে। বজ্র এবং বিদ্যুৎ এক ও অভিন্ন। তাহারা কখনো পৃথক হয় না।" ["আমার পৃথিবী"] যেকালে বজ্র বিদ্যুৎকে মানুষ দেবরোষ হিসেবে ভাবছে, সে সময় এনক কোথায় পেলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ?

এনকের প্রতিবেদনে মহাকাশ-চারীদের নাম ও পদমর্যাদা এবং তাঁদের ওপর আরোপিত কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। এতো অদ্ভুত সব তথ্য কেবলমাত্র কারও কল্পনা-প্রসূত হতে পারে না। বরং মনে হয়, এই তথ্যসমৃদ্ধি ঘটেছে বস্তুত বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হয়েই।

মহাভারতেও এহেন তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন বিশেষ প্রাথিত ছিল। কিন্তু যেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটি বিশেষ ভাবমণ্ডলের মেঘে বাস্তবসূত্রগুলিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করা হয়েছে। অবশ্যই এ কাজ সম্ভব তখনই, যখন কথক বা লেখকের জ্ঞান সম্পূর্ণ, যখন তিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞার আসন থেকে জ্ঞানময় বস্তুগুলির ইচ্ছামত বিবাচন করতে সক্ষম। ফলত এটুকুই বুঝি, মহাভারতীয় যুগের ভারতবর্ষ জ্ঞানালোকে অনেক বেশি উদ্ভাসিত ছিল, তাই সম্ভব হয়েছে মন্ত্রগুপ্তি। তাই কৌতূহল ছিল কম, জ্ঞান হয়েছিল রহস্যাবৃত।

মহাভারতের বিশাল শ্লোকস্তরে অনুসন্ধান চালিয়ে গবেষকরা মহাকাব্যের যে বিষয় বিভাজন করেছেন, সেই নিরিখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কি ভাবে তথ্যের অবলুপ্তি ঘটেছে গূঢ় উদ্দেশ্যের মসিলেপনে। মূল কাহিনী ও তথ্যাবলী নিষ্পিষ্ট হয়েছে ভক্তিমূলক পুরাণকথা ও উপদেশাবলীর চাপে পড়ে। লক্ষ শ্লোকের মধ্যে মূল কাহিনীর জন্য বরাদ্দ আছে মাত্র দশ হাজার শ্লোক। যুদ্ধ বর্ণনায় ব্যয় হয়েছে শতকরা বিশ ভাগ। আর সিংহভাগ অর্থাৎ উপদেশাবলীর জন্য শতকরা তিরিশ এবং ভক্তিমূলক পুরাণ কথার জন্য জুটেছে শতকরা পাঁচিশ ভাগ ! [ডঃ পি, এল, বৈদ্য, অধ্যাপক সংস্কৃত ও পালি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত "Mahabharata : Its History and Character"; The Cultural Heritage of India, vol. II গ্রন্থ দ্রঃ]।

সুতরাং পঞ্চান্ন ভাগ উদ্দেশ্যমূলক রচনার জায়গা করে দিতে হলে যথাযথ তথ্যানুসরণের আর কতটুকুই বা সুযোগ থাকে ? এসব কারণে অর্জুনের মহাকাশ ভ্রমণ-বিষয়ক বর্ণনা মন্ত্রগুপ্তির পক্ষপুটে আবৃত হয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্য হই বরং তখন, যখন দেখি পাইলট মাতলি নক্ষত্রলোক সম্পর্কে যে মুহূর্তে মুখ খুলছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয় এবং নিপুণভাবে সেই ফাঁক পূরণ করা হয় বহু পুনরুক্তিদুষ্ট মহাভারতের একমাত্র উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য দিয়ে।

বক্তব্যটি হল, যাগযজ্ঞশীল ও যুদ্ধবাজ রাজা এবং ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন এমন দানশীল ব্যক্তিই একমাত্র পুণ্যফল লাভের অধিকারী। ব্রাহ্মণের জন্য একটি পরশ্রমভোগী কায়েমী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মানসে অত বড় মহাভারত। সেজন্যই মাতলি যখন শুরু করেন তারকাবলী সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা, তখন নিপুণ বিবাচনের ফলে সে বক্তৃতা আর বস্তুপিণ্ড তারকা সম্পর্কে মহাকাশচারী-প্রদত্ত জ্ঞানময় বাণী থাকে না, হয়ে ওঠে তা মহাভারতে বহুব্যবহৃত সেই ভাঙা রেকর্ডটির কম্পিত স্বর, যে স্বর বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বারবার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা শুনতে শুনতে শ্রদ্ধা অপেক্ষা বাস্তবিক পক্ষে মনে বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধারই উদ্রেক হয়।

মাতলির রথ মহাকাশের বিশেষ এক উচ্চমার্গে তখন উঠে এসেছে, তাই অর্জুনের দৃষ্টিপথ থেকে মর্ত্যলোক অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি দেখছেন, 'তথায় সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; লোকসকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যার্জিত প্রভাদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। যে সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক বৃহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্ট প্রযুক্ত (দূরত্ব নিবন্ধন) দীপের ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকারসম্পন্ন।' এ পর্যন্ত মহাকাশ জগতের একটি বর্ণনা চলছিল বলেই মনে হয়। মহাকাশবিজ্ঞানী কেউ অথবা এই পৃথিবীর নভশ্চর কারো কাছ থেকে হয়ত এই বর্ণনার যথার্থ ব্যাখ্যাও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে মহাভারতীয় উদ্দেশ্যের স্পষ্ট অনুপ্রবেশ সমস্ত চিত্রটির বাস্তবতা কয়েকটি কালির আঁচড়ে মলিন করে দেয়: আমরা পাঠ করি:

"যে সমস্ত মহাবীর সিদ্ধ রাজর্ষিগণ রণস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্জুন দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্যের ন্যায় তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব তপোবলে স্বর্গজয় করিয়া তথায় উপনীত হইয়াছেন।" এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মাতলিকে তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় মাতলি বললেন, "হে পার্থ? তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে সমস্ত তারকা পর্যবেক্ষণ করিয়াছ, সেই সকল পুণ্যশীলেরা (অর্থাৎ তপোবল-ধন্যরা) সুকৃতির ফলে এই তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।"

মহাভারতই বলুন আর স্বয়ং ভগবানই বলুন, মাতলির এই ব্যাখ্যা আজকের মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে অতিলৌকিক দৈব্য ঘটনা হিসেবেও আর মান্য নয়। তারকামণ্ডলী কী ও কেমন জিনিস এ সম্পর্কে স্কুলের কিশোরটিও অনেক জেনে ফেলেছে। মহাভারতীয় উদ্দেশ্য তাই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। তারকাপুঞ্জ মৃত রাজর্ষিবর্গের প্রভাদ্যুতি তো নয়ই, বস্তুপিণ্ড ছাড়া তার অপর কোনো ব্যাখ্যাও নেই। আপন চতুরালির ফাঁদে মহাভারতের কবি এখানে আপনি ধরা পড়ে গেছেন।

অতএব আমাদের সামনে একটিমাত্রই প্রশ্ন পড়ে থাকে. তা হ'ল, চতুর নভশ্চররা স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি বলে অর্জুনকে বস্তুত কোথায় নিয়ে গেলেন ? কোথায় সেই চতুর ইন্দ্রের অমরাবতী ?

আগেই বলেছি, স্বর্গ মানে দেবভূমি। দেব আবাসই স্বর্গ এবং এই অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করা হলে অনেক গোল মিটে যায়। দেখেছি আমরা, সেই পুরাযুগে ভিন্নগ্রহের কতিপয় বুদ্ধিমান নভশ্চর এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেবতা সেজে নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের আবাসগুলিই সুতরাং স্বর্গ। যখন তাঁরা পৃথিবীপৃষ্ঠে উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় ক্যাম্প ফেলেছেন, তখন মহাকাশ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে সেই অবস্থিতিই স্বর্গ। আবার যখন তাঁরা যুধিষ্ঠিরের মতো কাউকে নিয়ে চিরদিনের জন্য মর্ত্যলোক ত্যাগ করেছেন, তখন প্রতারিত মানুষ সেই অজ্ঞাত লোককেই প্রকৃত স্বর্গ বলে ধারণা করেছে। সেদিন প্রকৃত স্বর্গের ধারণা হয়েছে এমন এক লোক যা নীল মহাশূন্যের কোনো অজ্ঞাত অবস্থানে হারিয়ে গেছে। বহু 'তপোবলধন্য'ও আর কখনই তার হদিস পায়নি। পার্থিব স্বর্গ মিথ্যা হয়ে তখন থেকেই কি অসীম অনন্তে বিরাজমান এক কল্পিত স্বর্গের ধারণা ঋষিমন আলোড়িত করেছে ?

তাই কি পার্থই সর্বপ্রথম স্বর্গে গেলেও সব ব্যাপারটি গৌণ হয়ে গেছে আর প্রচারিত হয়েছে একমাত্র যুধিষ্ঠিরই সশরীরে স্বর্গলাভ করেছেন বলে ? পার্থব স্বর্গযাত্রা নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার পেছনে, আমার তো মনে হয়, এই যুক্তিই বস্তুত অর্থময়। এছাড়া আর যুক্তি কৈ ? এ ছাড়া আর কোন্ যুক্তিতে অর্জুনের প্রথম স্বর্গযাত্রাকে বাতিল করা যেতে পারে ? এটাই যুক্তি নাহলে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ দর্শনকে অমন কাঁচা কলমে কষ্টকল্পিত ভাবে কল্পনা করতে হয় কেন ? কেন কবি ধরা পড়ে যান ? কেন আমরা বুঝতে পারি, সে বর্ণনার মধ্যে ছিটে ফোঁটা সত্যও নেই। আছে কবি কল্পনার ব্যর্থ প্রয়াস ?

একথা আরো ভালো করে বোঝা যাবে অর্জুনের দেখা স্বর্গলোকটি ধীরে সুস্থে খুঁটিয়ে বিচার করলে !

মহাকাশে অর্জুন

মহাভারতের বিশেষ উদ্দেশ্যের ধোঁয়ার আড়ালে সব তথ্য হারিয়ে গেলেও মহাকাশচারী অর্জুনের দুটি বাক্য, 'তথায় সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই ;' এবং 'লোকসকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যার্জিত প্রভাদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন'—হয়ত কিছু গুপ্ত সত্য আবিষ্কারে সহায়তা করতে পারে।

আগেই বলেছি, নভশ্চর কার্পেণ্টার স্কট স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এর (সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মাইল) উপরে উঠে পৃথিবীকে সুনীল বরণে আচ্ছাদিত দেখেছিলেন, যে দৃশ্যের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এতানার মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠদর্শনের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্য আর এক স্তরে উঠলে আকাশের চেহারা যেভাবে বদলে গেল, মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের দেখা মহাকাশের রঙ ছিল ঠিক সেই রকম, কালো, চন্দ্রসূর্যের আলোকবিহীন। এ দৃশ্য দেখেছেন মার্কিন নভশ্চর জন গ্লেন। ফ্রেণ্ডশিপ-সাত-এ চড়ে পৃথিবী পরিক্রমার সময় জগৎবাসীকে শুনিয়ে তিনি মহাকাশ থেকে যে বার্তা প্রেরণ করেন, তারই সুবাদে আমরা জানতে পারি, The sky has been black throughout the day.' আকাশটা সারা দিনমান শুধু আঁধারে আবৃত ছিল। অর্থাৎ সেই অর্জুনের উক্তি ঃ 'তথায় সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই।' মহাশূন্য বস্তুতই রাত্রির মত কালো। [গ্লেনের উক্তিতে বিস্তারিত তথ্যের জন্য National Geographic, vol 121, No 6 দ্রঃ।]

'লোকসকল স্ব স্ব প্রভাদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন' বলতে অর্জুন কি উচ্চ মহাকাশে ভাসমান জ্বলন্ত বস্তুপিণ্ডের কথাই বলতে চেয়েছিলেন ? উচ্চ মহাকাশে তাদেরও তো সাক্ষাৎ মেলে।

অর্জুনের এই দুই উক্তিকে তাই বৈজ্ঞানিক বিচারের বিষয় বলে আমি উল্লেখ করব। এসব ব্যাপার আছে বলেই অর্জুনের মহাকাশচারণার ঘটনাটিকে আমরা কবিকল্পিত বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। এমনও হতে পারে, তাঁকে কোনো মহাকাশ ভেলায় তুলে উচ্চ মহাকাশে বেড়িয়ে আনা হয়েছিল। অথবা ডানা-ওয়ালা আধুনিক 'কলম্বিয়া'র মত মাতলি-চালিত ইন্দ্রের অত্যুত্তম রথটি ছিল একটি শক্তিশালী মহাকাশ খেয়া, যা অনায়াসে মহাকাশে ও পৃথিবীতে ওঠানামা করতে পারত ? অর্জুনের মনে অচলাভক্তি প্রোথিত করাই হয়ত তাঁদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে। অতঃপর অর্জুনকে নামানো হয়েছে হিমালয়েরই স্বতন্ত্র এক পার্বত্য এলাকায়, যেখানে ইন্দ্রের দলবল শিবির স্থাপন করেন।

হিমালয়ে ইন্দ্রপুরী

"মহাযশাঃ অর্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করিয়া সুরলোকে (দেবলোকে) উত্তীর্ণ হইয়া পরম রমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।" এ বর্ণনা অবশ্যই বুদ্ধিগ্রাহ্য। রাজলোক বলতে পার্থিব ভূমি যা নাকি তথাকথিত দেবতাদের দখলীভূত নয়, অর্জুন সেই ভূপৃষ্ঠ (ভূমি মাত্রেই তখন রাজার অধিকৃত) অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হলেন সুরলোকে যা দেবতাদের অধিকৃত অঞ্চল।

এই সুরলোকও যে নেহাৎই আর একটি পার্থিব অঞ্চল মহাভারতকার সে বিষয়েও আমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন দ্বন্দ্বের অবকাশ রাখেননি। কবি বলেছেন, সে রাজ্য পবিত্র তরুরাজি দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। 'তথায় সুগন্ধি কুসুম সংপৃক্ত - গন্ধবহ সর্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে"।

হিমালয়ের পথে পথে এই দেবভূমির বিস্তার। পুরাণ-পুঁথিতে ইন্দ্রপুরী বা অমরবতীর অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে সুমেরু পর্বতে।

আগেই বলেছি, সম্প্রতি কেদার-বদ্রী পথে পরিক্রমা করে সুমেরু পর্বতকে সরেজমিনে দেখে এলাম। কেদার নাথ মন্দিরের পেছনে তুষার শুভ্র সুউচ্চ সুমেরু। কেদার ও বদ্রীকাশ্রমের মধ্যবর্তী সুমেরু পৌরাণিক গরিমা লাভ করেছে দেবস্থান হিসেবে। সুমেরুকে মাঝে রেখে বদ্রীনাথ ও কেদারস্থানের প্রশস্ত পার্বত্য এলাকা জুড়ে দেবতারা সেদিন বসতি স্থাপন করেছিলেন হিমালয়ের পথে পথে। নেমে এসেছিলেন হরিদ্বার পর্যন্ত। পুরাণ-প্রখ্যাত দক্ষযজ্ঞ ঐ হরিদ্বারেরই কণ্‌খল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, এই সীমিত ভৌগোলিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ, এমন কথা মানতে পারি না। দেবভূমি সুমেরুর বিস্তৃতি হিমালয়ের ক্রোড়দেশকে ঠিক কতদূর অধিকার করে আছে এ নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেখেছি। তবে ইন্দ্রের আবাস যে বদ্রীনাথ চৌখাম্বা ও কেদারনাথের পথেই, বিভিন্ন মত একত্রিত করলে তেমনই ধারণা হয়। হিমালয় পথের ভক্তিমুগ্ধ পথিক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চকেদার' গ্রন্থে দেখি, হিমালয়ের স্থানীয় অধিবাসীরা বদ্রীনাথ-চৌখাম্বাকেই সুমেরু পর্বত বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। চৌখাম্বা ও সুমেরু উত্তরকাশী জেলার অন্তর্ভুক্ত। মানচিত্রে সুমেরু পর্বত কেদারনাথের উত্তরপূর্বে এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ দিকে চিহ্নিত। কেদারনাথের পূর্বে বদ্রীনাথ ও তারই সামান্য উত্তরপূর্বে নন্দন কানন! তীব্রস্রোতা অলকানন্দা অমরাবতীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

আবার কে. এস ফোনিয়া তাঁর 'Uttarakhand' গ্রন্থে বদ্রীনাথের নারায়ণ পর্বতকে সুমেরু বলে উল্লেখ করেছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এইভাবে সুমেরুকে সুবিস্তৃত অঞ্চলের তুষার প্রাচীর বলে মনে করেন। প্রশ্ন করায় স্থানীয় লোকরা সুমেরু হিসেবে কেদার মন্দিরের পশ্চাদ্বর্তী তুষার শৃঙ্গটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আগে কেদার ও বদ্রী অঞ্চল একই সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে মনে হয়।

স্বর্গ অথবা ইন্দ্রালয়ের খোঁজে অর্জুনবিরহে কাতর দ্রৌপদীসহ চার পাণ্ডব গেছলেন বদ্রীনাথের পথে। গেছেন তাঁরা তিব্বতে কৈলাসে মানস সরোবরের কোলে। কিন্তু স্বর্গারোহণের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাননি। সে পথে দেবরক্ষীরা সর্বদা দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ রচনা করে থাকতেন।

ব্যাপারটি সম্পর্কে কঠোর সামরিক গোপনীয়তা বজায় রাখার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই কি পাছে অর্জুন স্বর্গরূপে প্রচারিত সুমেরুর পার্বত্য অঞ্চলকে পার্থিব এলাকা হিসেবে বুঝতে পারেন, তাই সেখানে নামানোর আগে তাঁকে মহাকাশে ঘুরিয়ে আনা হয়েছিল? তাই কি তথাকথিত নভশ্চরশিবির বা দেবভূমি ওরফে স্বর্গে সবকটি গোপন গিরিপথ ছিল সংরক্ষিত? সেই পথমুখে পৌঁছানোর আগেই দেবানুচর মুনিরা এসে সাবধান করতেন, ফিরে যেতে বলতেন পুণ্যার্থীকে? সেজন্যই কি রাজা পাণ্ডু ব্রহ্মার সভায় যেতে চাইলে নানা অজুহাতে সেই সভার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রাকারী মুনিরা তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন? ভীমসেনকে রুখেছিলেন মহাকায় পবনপুত্র হনুমান? পাছে পাণ্ডবরা লোমশ মুনির মতই পার্বত্যপথে বেড়াতে বেড়াতে হিমালয়-স্বর্গে উপস্থিত হ'ন, দেবরাজ ইন্দ্র তাই কি স্বয়ং লোমশকেই পাঠিয়েছিলেন তাঁদের আগলে রাখার জন্য?

লোমশ ইন্দ্রালয় থেকে অর্জুনের কুশলবার্তাবহ হিসেবে পার্বত্যপথে ভ্রাম্যমাণ পাণ্ডবদের কাছে প্রেরিত হয়ে বলেন, 'আমি দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জুনের নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া আপনাদিগের সহিত পর্যটন করিব।'

জিজ্ঞাসুর কাছে প্রশ্ন, লোমশের এই আগমনের পিছনে বস্তুতই কি অন্য উদ্দেশ্য ছিল না? পথে লোমশ পাণ্ডবরক্ষকের ভূমিকায় কিন্তু কোনও বিভূতি প্রদর্শন করতে পারেননি। তিনি শুধু যুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসাবে পরিক্রমা করেছেন। কিন্তু কেন?

সন্দেহ হয়, লোমশকে প্রেরণ করার পেছনে ইন্দ্রের হয়ত ছিল স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হ'ল, লোমশের মাধ্যমে হিমালয়-স্বর্গাভিমুখে যাত্রাকারী পাণ্ডবদের খবরাখবর সংগ্রহ করা। পাণ্ডবসঙ্গী লোমশ হয়ত কোনো বার্তা প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পাণ্ডব পরিবারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ইন্দ্রলোককে সর্বদা অবহিত রাখছিলেন। তাঁর নিয়োগের নেপথ্য কারণ হয়ত সেটাই। সম্ভবত

লোমশের মাধ্যমে ইন্দ্রলোকে বসে পাণ্ডবগণের পরস্পরের কথোপকথন পর্যন্ত ধরতে পারতেন দেবগণ। তাই দেখি, যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যখন বলছেন যে অনেক পথ পর্যটন করে বহু নদী পর্বত অতিক্রম করে তাঁরা গন্ধমাদনে (ইন্দ্রকীল বা মন্দর, বদ্রীনারায়ণ অঞ্চলে এই পর্বতের আঞ্চলিক নাম, হাতী পর্বত) উপস্থিত হয়েছেন, এবার তাঁদের গন্তব্য বৈশ্রবণ (কুবের) আবাস কৈলাস (বন, ১৫৯), তখন সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী বা আকাশবাণী হয়, 'হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের আশ্রম হইতে সেই দুর্গম দেশে (স্বর্গে) গমন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই পথ অবলম্বন করিয়া পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতিগমন কর।' এই সতর্কীকরণই প্রমাণ, তথাকথিত দেবগণ খুবই সাবধানে কাজ করতেন। হয়ত পাণ্ডবদের বুঝে দেওয়া হয়েছিল নর পর্বতে অর্থাৎ অলকানন্দার অপর পারে, যা মর্ত্যলোক বলে স্থানীয় পাণ্ডাদের দ্বারা উল্লিখিত।

আমরা বারংবার লক্ষ্য করেছি, দেবতারা বার্তাবাহক মাধ্যমেই সংবাদ আদান প্রদান করেন, অন্য কোনো ঈশ্বরীয় পন্থা তাঁদের নেই। তাহলে ভীমকে রাজা যুধিষ্ঠির কী বলেছেন, সেই মুহূর্তে ইন্দ্রলোকে তা ট্রান্সমিট করছেন কে? পাণ্ডবদের আস্তানা থেকে একমাত্র লোমশই পারেন সে খবর পাঠাতে। দেব-সভায় তাঁরই যাতায়াত আছে। আর সেই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বেতারযোগে দেবতারাও পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে তাঁদের নির্দেশ প্রেরণ করতে পারেন উপযুক্ত গ্রাহকের কাছে। নিকটস্থ সেই লাউড স্পীকার যোগে বার্তাটি প্রচার করতে পারেন কোনো গোপন পার্বত্য সোপান থেকে। শুনে পাণ্ডবদের তা দৈববাণী বলেই মনে হবে। লক্ষণীয় এই, যখন দৈববাণী হচ্ছে তখন কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী লোমশ সেখানে অনুপস্থিত। দৈববাণীকে মান্য করার উপদেশ দান করেছেন পুরোহিত ধৌম্য। লোমশ হঠাৎ কোথায় গেলেন? অলক্ষ্য থেকে তিনিই কি বিস্ময়কর দৈববাণীটি শোনাচ্ছিলেন তখন? ইন্দ্রলোক থেকে আসার সময় বৈজ্ঞানিক দেবতারা তাঁকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে দেননি তো? এই লোমশমুনির সঙ্গে ব্যাসদেবেরও ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই সন্দেহ অমূলক নয়। দেবানুচর হিসেবে ব্যাসদেবের পরিচয় আমরা তো আগেই পেয়েছি।

রাজকীয় সংবর্ধনা

সেই ইন্দ্রলোকে যখন অর্জুন এসে নামলেন তখন আর্যাবর্তের রাজচ্যুত রাজকুমারকে যথোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গীতবাদ্যধ্বনি-সহযোগে আন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তিশিবির গার্ড অব অনার জানালেন পাণ্ডব রাজতনয় অর্জুনকে। প্রথমেই তাঁকে নন্দন কাননের মনোহর শোভা সৌন্দর্য ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল তারপর নভশ্চরেরা নিয়ে এলেন তাঁকে বিমানক্ষেত্রে। হিমালয়ের সুউচ্চ বিমানাবতরণ ক্ষেত্রে অর্জুন দেখলেন, 'সহস্র সহস্র (অনেকানেক) স্বেচ্ছাচারী বিমান···। তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতকগুলি আগত হইতেছে।' [বন, কালী ৪৮]। অর্থাৎ ইন্দ্রের অমরাবতীতে বৈমানিকরাই সবচেয়ে কর্মব্যস্ত।

অমরাবতী অলকানন্দার রুপোলী জলের ফিতেয় কটিবন্ধ বেঁধে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্দ্রের আধিপত্যকে চিহ্নিত করেছে। কেদারবদ্রী ও চৌখাম্বার অর্ধচন্দ্রাকৃতির কাছেই নন্দন কানন। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছবিটা। পার্থ সেই পার্বত্য কাননে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যে বিমোহিত। গাড়োয়াল হিমালয়ের মোহিনী মায়া তাঁর মনে অপার্থিব এক দিব্য আনন্দের সঞ্চার করেছে। এখনও হিমালয় পথের পথিক অত্যাশ্চার্য পার্বত্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। মন তাঁদের দিব্য অনুভূতিতে বিহ্বল হয়। অর্জুন শুধু সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ নন, দেবতা নামক নভশ্চরেরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক মায়াময় ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়ে তাঁকে ঢের বেশী চমৎকৃত করেছেন। আর সেই দেব আবাসভূমি লাভ করেছে স্বর্গীয় মহিমা।

ভিন্‌দেশী রাষ্ট্রনায়ক অথবা মিত্র শক্তির অধিনায়কের আগমনে আজও যেমন রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, সেদিনও তেমনিই হ'ত। শুধু যেখানের যেমন প্রথা। হিমালয়ের দেবশিবিরে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ অর্জুনের জয়গাথা, স্তবস্তুতি গেয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। অমরাবতীতে বেজে উঠল 'দিব্যবাদ্য-ধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভি'। সকল-বিশিষ্টজন-সমাবিষ্ট ইন্দ্রকে দর্শন করলেন পৃথাপুত্র।

আগেই চমৎকার প্রস্তুতি ছিল। তাই ইন্দ্রের পাশে উপবেশন করলে অর্জুনকে ঘিরে শুরু হ'ল হিমালয়ে অবস্থানরত নভশ্চর কন্যাদের নৃত্যানুষ্ঠান। যেন মেলা বসে গেল পার্বত্য শিবিরে। বিশিষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষদের ঘিরে এক এক দল নর্তকী আসর জমিয়ে তুললেন।

'ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্বচিত্তি, স্বয়মপ্রভা, উর্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেন, চিত্রলেখা ও সহা প্রভৃতি

কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্তকীগণ…তাঁহাদিগের সুললিত নিতম্বাভিনয় কম্পমান পয়োধর ও মনোহর হাবভাব-বিলাস এবং কটাক্ষ বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মন মোহিত হইল।' [বন, ৪৮]।

বুঝতে পারি সে যুগে দেবতারা হিমালয়ের ছাউনি শিবিরগুলিতে বহন করে এনেছিলেন এক অতি আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কলা ও কৌশল রীতি ও নীতি। নচেৎ কে একথা আজ মেনে নেবেন যে, স্বর্গ নামক এক ঈশ্বরীয় রাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র সামান্য এক মানবীপুত্রের মনোতুষ্টির জন্য নর্তকীর 'নিতম্বাভিনয় ও কম্পমান পয়োধর' প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন! কে স্বীকার করে নেবেন, পাণ্ডবপক্ষকে আপন শিবিরভুক্ত করার জন্য দেবতা নামক ঈশ্বরীয় দূতেরা পাণ্ডব প্রতিনিধি অর্জুনের কাছে গভীর রাত্রে প্রেরণ করবেন উর্বশী নাম্নী এক রূপসীকে?

প্রবাসী পার্থকে নারী সহবাসে তুষ্ট করার জন্য তাঁর পার্বত্য ছাউনীতে উর্বশী প্রেরিত হয়েছিলেন স্বয়ং ইন্দ্রের আদেশে। [বদ্রীনাথে অলকানন্দার যে তীরে মর্ত্যলোক সেখানেই নরপর্বতের সন্নিকটে উর্বশী পর্বত। সে পর্বতেই কি ছিল উর্বশীর শিবির?] ভক্তজনে বলবেন, এ-ও ভগবানেরই পরীক্ষা। নারীমুগ্ধ লম্পটের মনোশ্চাঞ্চল্য ঘটানই তাঁর উদ্দেশ্য। শ্রদ্ধেয় ভক্তগণের প্রতি আমার নিবেদন, মহাশয়! শ্রীভগবানের এমত দুর্মতির কারণ কী? কেনই বা পার্থের এই পরীক্ষা! তিনি তো ভগবৎ কৃপা লাভের জন্য ইন্দ্রকাল থেকে সেই পার্বত্য স্বর্গে সমাগত হননি। তাঁর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, একটিই মাত্র যন্ত্রণা। সে কথাও তো স্পষ্টভাবেই মহাভারতে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে, স্বর্গে গিয়ে 'তিনি সর্বদাই কেবল দুঃশাসন ও শকুনির বধচিন্তা করিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইতেন।' কাম ক্রোধ মোহে আচ্ছন্ন পার্থের একটিই মাত্র লক্ষ্য, দুর্যোধন গোষ্ঠীর উৎসাদন। এর মধ্যে ভগবদ্ভক্তির কোথাও কোনো ইঙ্গিতমাত্র নেই! সমস্ত ঘটনাই যুদ্ধকেন্দ্রিক এবং যুদ্ধটিও ছিল একটি বিশেষ পার্থিব অঞ্চল আর্যাবর্তে সীমাবদ্ধ। ভগবানের গন্ধ এই স্বর্গে পার্থিব কুসুমরাজি এবং সুবাসিতা হিমালয়বাসিনীর গাত্রসৌগন্ধে বেবাক হারিয়ে গেছে। কুসংস্কার ছাড়া এ-বাসে স্বর্গবাস কে আর খুঁজে বেড়াবেন।

'পার্থের মন উর্বশীতে আসক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র চিত্রসেনকে নির্জনে আহ্বান' করে বলেছিলেন, উর্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন ফাল্গুনীর (পার্থের) মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে।' [বন, ৪৯]। একে ইন্দ্র অর্জুনের পিতা, তায় দেবরাজ। তিনি প্রবাসী রাজপুত্রের চিত্তবিনোদনের জন্য নেপথ্যে বসে কামকলানিপুণা এক সুন্দরীকে পাণ্ডুতনয়-শিবিরে প্রেরণ করার আদেশ দিচ্ছেন, এমন প্রথা ভোগ-সর্বস্ব মালিক

শ্রেণীর ঘরেই প্রচলিত। মহাভারত পাঠে জানা যায়, তৎকালীন মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণদেরও ভোগাকাঙ্ক্ষা কী প্রবল ভয়ঙ্কর এবং পাত্রাপাত্রজ্ঞান-বিবর্জিত ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা পরশ্রম-ভোগী সমাজেব চরিত্রই নির্বাধ ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারা সর্বদা বিকৃত। ভোগতন্ত্রী সমাজের ধারাবাহিকতা (ট্রাডিশন) আজও সমানে চলেছে। তাই ঘটনাটি আদৌ কবি-কল্পিত নয়। অত্যন্ত বাস্তব। এমনটিই সম্ভব। মহাভারতীয় যুগের শীর্ষ-সমাজে যৌন ব্যাপারে নারীর ভূমিকাও অপ্রধান ছিল না। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের উক্তিও ছিল অবাধ। কামাবেশ প্রকাশে তাঁরা লজ্জার বালাই রাখতেন না ; আর উর্বশী তো স্বৈরিণী। সুতরাং তিনি স্পষ্টই বলতে পারেন, 'আমি লোকমুখে অর্জুনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিষম কামশরে ব্যথিত হইয়াছি।'

ভিন্‌গ্রহ থেকে আগত প্রাণীরা সেকালে পৃথিবীর স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে যথেষ্ট যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন। কোথাও তা শুধুমাত্র যৌনতার প্রয়োজনে, কোথাও বা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে, যেমন কুন্তীর সঙ্গে ইন্দ্রাদি পুরুষগণের যৌনমিলন। মহাকাশ থেকে নেমে আসা রমণীগণও যেমন পার্থিব পুরুষের আসঙ্গ লাভে লুব্ধ হয়েছেন, তেমনিই নভশ্চরেরা সুযোগ মতো ভোগ করে গেছেন পৃথ্বীনারীকে।

অর্জুন বহিরাগত দেবতা নন, যদিও দেবপুত্র। উর্বশীকে গভীর রাত্রে তাঁর শিবিরে প্রবেশ করতে দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। উর্বশীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি দেবতাদের কৃপাপ্রার্থী, দেব-নারীকে ভোগ করার সাহস কোথেকে পাবেন ? তাই রাজি হতে পারেননি। উর্বশীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন কম্পিতবক্ষে বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেব-বারাঙ্গনা। দেবতারা কামকলা নিপুণ। উর্বশীও তাই। তিনি কোনো অলৌকিক চরিত্র নন। প্রত্যাখ্যাতা রমণীর মত তিনি অর্জুনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ক্রুদ্ধ রূপটিই উর্বশী চরিত্রের বাস্তবতাকে প্রমাণ করেছে। উর্বশীর সেই ক্ষুব্ধ উত্তেজিত রূপের সঙ্গে অতঃপর একটু পরিচিত হওয়া যাক।

"আমরা সামান্যা নারী"

স্বর্বেশ্যা হিসেবে যতই কেননা বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকুন, উর্বশী নিজেই স্বীকার করেন, তিনি সামান্যা নারী। আর বস্তুত তিনি তাই-ই। তাঁর মধ্যে এমন কোনো বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই যা তাঁকে কোনও ভাবে কোনো রকম অলোক-সামান্য স্বর্গীয় মহিমা দান করতে পারে।

"মন্মথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া" "পৃথুনিতম্বিনী" উর্বশী "স্বীয় নিবাস [উর্বশী-পর্বত ?] হইতে বহির্গত হইয়া পার্থভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।" "সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী দিব্য চন্দন চর্চিত বিলোল হারাবলিললিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলী দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা ! তাহার গিরিবরবিস্তীর্ণ রজতরশনারঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাস-স্থান ; সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনিন্দ্যনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে :···একে তো সেই সুর-সুন্দরী সহজেই মদোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত···" [বন, ৫০]।

বর্ণনাটি যে কোনো উত্তরদেশীয়া সুন্দরী মদালসারই হতে পারে। মহাভারতে 'নিতম্বে'র প্রশংসা নারীর প্রতি তৎকালীন ও তদ্দেশীয় কমপ্লিমেণ্ট। বলা বাহুল্য, কবি স্বর্বেশ্যার ক্ষেত্রেও সমান প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বর্গীয় চরিত্র হিসেবে উর্বশীর ক্ষেত্রে অন্যতর কোনো বিশেষণ প্রযুক্ত হয়নি।

কিন্তু তাও বড় কথা নয়। লক্ষণীয় এই যে, সাধারণ কামার্তা রমণীর মতো মিত-সুরাপানের পর তিনি পৃথাপুত্র অর্জুনের পার্বত্যশিবিরে চলেছেন আসঙ্গ সুখ লালসায় সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে। ঘটনাটির মধ্যে অলৌকিকতার স্পর্শমাত্র নেই। সাধারণ রক্তমাংসের নারীরূপেই ধরা দেন উর্বশী। তাঁকে স্বর্বেশ্যা হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে আর দেখা যায় না। স্বর্গ ও মর্ত্য একাকারে মিশে যায়। আমরা বুঝি, এক্ষেত্রেও আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক পথেই চলেছে। ভিন্‌গ্রহের বুদ্ধিমান জীবগণ আমাদের মতই মনুষ্য শরীরধারী। তাঁদের সঙ্গে আগত নারীরাও পার্থিব নারীর সকল গুণসম্পন্না। তাই, যেমন দেবতা নামক নভশ্চর পার্থিব নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে সেকালে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তেমনিই মহাকাশচারিণী রমণীও ছিলেন এই গোলকের পুরুষগণের অঙ্কশায়িনী হওয়ার জন্য উন্মুখ।

প্রাচীন পুঁথিপত্রে দেব মানব যৌনমিলনের কথা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে ! পুরাকালে মানুষের কোনো কোনো বংশ দেব-ঔরসে সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করে

প্রায় সকল প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীগুলি। সর্বত্র প্রাপ্ত একই তথ্যাদি বিশেষ প্রশ্নভাবনার কারণ। সেই সব বিবরণকে নেহাৎ গাল-গল্প বলে আজ খুব সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

উর্বশী ছিলেন মহাকাশচারিণী স্বর্বেশ্যা। আন্তর্নাক্ষত্রিক শিবিরের এক প্রভু ইন্দ্র তাঁকে নিয়োগ করলেন মিত্রপক্ষীয় পাণ্ডব পক্ষের রাজপ্রতিনিধি পার্থকে পরিতুষ্ট করার জন্য। মানবপুত্রের সঙ্গে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য উর্বশীও হলেন উদ্‌গ্রীব।

তৎকালীন মহাকাশচারিণীরা যে মানবপুত্র অপছন্দ করতেন না এ সম্পর্কে আর একটি কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লিখিত গিলগামেশ পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে, সুমেরীয় উরুকপতি গিলগামেশের প্রতি মুগ্ধ হয়ে দেবী ইশতার (যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী) গিলগামেশকে বিবাহ-বন্ধনে (যৌন মিলনে) আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন ; উর্বশীও অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছেন। গঙ্গা রাজা শান্তনুর অঙ্কশায়িনী হয়ে বেশ কিছুকাল তাঁর ভোগবাসনা পূর্ণ করে গেছেন। বিবাহ বা পতিরূপে আহ্বান যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষাকেই ইঙ্গিত করে। এঁরা কেউ সংসার করার মানসে এই পতিত্ব কামনা করেননি। উবশী তাঁর আকর্ষণীয় দেহ-বিভঙ্গ দেখিয়েছিলেন, আর দেবী ইশতার গিলগামেশকে প্রলুব্ধ করেছিলেন উপঢৌকোন প্রদানের লোভ দেখিয়ে। পুঁথির বর্ণনা এই রকম :

Come, Gilgamesh, be thou my lover !
Do but grant me of thy fruit,
Thou shall be my husband,
and I will be thy wife.

এই আহ্বানের সঙ্গে ইশতার এক লম্বা তালিকা হাজির করেছেন উপঢৌকনের, যা তৎকালে বস্তুত লোভনীয় সম্পদ। [Near Eastern Mythology দ্রঃ]।

বাইবেলের আদি পুস্তকে ঈশ্বরপুত্র বা 'সন্স অব দি গড্' এর সঙ্গে পৃথ্বিনারীদের যৌনসন্ধির কথা বিবৃত আছে সদাপ্রভুর মুখঃনিসৃত বাণীতে।

সদাপ্রভুর রক্ষীরা এই গোলকে যথেচ্ছ যৌনক্রীড়া করে গেছেন। বাইবেলের বয়ানে ঈশ্বরপুত্রদের ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হয়েছে এইভাবে, "...যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক অনেক কন্যা জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।...তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল এবং তৎপরেও

ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের কাছে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই সেকালের প্রসিদ্ধ বীর।" [আদি পুস্তক, বাইবেল, ৬/১-৫]।

এ শুধু বাইবেলীয় বাণীই নয়, মহাভারতীয় কাহিনীও বটে। দেবপুত্র বলেই তৎকালে পাণ্ডবরা বীর, তাঁরা বিজ্ঞানে অগ্রসর গ্রহান্তরবাসী দেবতাদের কাছে পেয়েছিলেন অপরাজেয় রথ ও অস্ত্র মহাবীর হিসাবে সম্মান লাভ করেছিলেন ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ।

কোথায় স্বর্গ

পার্থকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মহাকাশচারীদের গুপ্ত ঘাঁটিতে, ভাববাদী প্রাচীনরা প্রাথমিক ভাবে যার নাম দিয়েছিলেন, স্বর্গ।

বড় গোলমেলে ব্যাপার এই মহাভারতের স্বর্গ। এ স্বর্গে যাওয়া যায় কখনো পর্বতের ধাপ ভেঙে, কখনো যান্ত্রিক বিমানে চেপে সশরীরে। আবার ফিরেও আসা যায়। যেমন ফিরে আসতেন গূঢ়তত্ত্বের কারবারী মুনিরা ; যেমন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অর্জুন। আবার ঐ হিমগিরি শীর্ষ থেকেই মহাকাশচারীরা চিরদিনের জন্য তুলে নিয়ে গেছলেন যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের মহাকাশযানে চাপিয়ে। পৃথিবীর ছেলে আর ফিরে আসেনি পৃথিমায়ের বুকে। সে-ও আর এক স্বর্গ-যাত্রা !

কিন্তু কোনোটাই সেই স্বর্গ নয়, দেবতাদের ভাববাদী বুদ্ধিজীবীরা যে স্বর্গের কল্পিত ছবি এঁকেছেন মহাভারতের শেষ পর্বে, স্বর্গারোহণ পর্বে। সেখানে কল্পনার তুলিতে স্বর্গ ও নরক আঁকা হয়েছে, যদিও সেই কল্পিত স্বর্গে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও যাননি। তাঁকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়ের পর মহাকাশযানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অজ্ঞাত কোনো গ্রহে। হয়ত তিনি এখনো যাচ্ছেন। এখনো ভাসছেন মহাকাশে। মহাকাশচারী দেবগণ হয়ত আজও তাঁদের আপন গ্রহে পেঁছতেই পারেননি। এমনিভাবে হিব্রু পুঁথির জন্মদাতা এনক-ও হয়ত আজও মহাকাশচারণায় রত। যাচ্ছেন পৃথিবীর বাছাই করা আরো অনেক অনেক মানুষ। পার্থিব বুদ্ধিমান প্রাণীর নমুনা হিসেবে যাঁদের কারো কারোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আজ থেকে তিন হাজার বছরেরও আগে। অন্তত বৈজ্ঞানিকরা আজ এভাবেই ভাবছেন।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত রুশী পদার্থবিদ্ ম্যাটেস্ট আগরেস্ট পৃথিবীতে গ্রহান্তর-বাসীর সম্ভাব্য আগমন সম্পর্কিত তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা Astronauts of Yore-এ একটি হিসেব দাখিল করে বলেছেন, মোটা হিসেব থেকে মনে হয়, যদি তাঁরা এসে থাকেন, তাহলে প্রথম আগমন থেকে দ্বিতীয় আগমনের ব্যবধান হবে আনুমানিক দশ হাজার বছর। যদি ধরে নেওয়া হয়, এই গোলকে তাঁদের আগমন ঘটেছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগে, তবে আমরা আশা করতে পারি, এখন থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর পরে তাঁরা আবার ফিরে আসতে পারেন, কেননা, পৃথিবীর বয়স হাজার হাজার বছর বেড়ে গেলেও মহাকাশ-চারণারত শূন্যচারীর বয়স সে তুলনায় কিছুই বাড়ে না।

আগরেস্ট লিখেছেন, 'Another possibility is that the celestial vistors came from some very distant world and are still on their way home. Remember that in a moving spaceship time passes much slower than on our 'stationary' earth and the astronauts and the 'son of man' they took with them may not be much older than they were when they departed. Depending on their speed, only a few decades or even years may have passed according to their clock. On earth thousands of terrestrial years will have to pass before the astronauts or their countrymen come back for a second time.'

জিজ্ঞাসুরা প্রশ্ন করবেন, যুধিষ্ঠির যদি এখনো গ্রহান্তর পথে মহাশূন্যেই উড়ে চলেছেন, তাহলে স্বর্গে গিয়ে তিনি যে একরাশ নিহত রাজা-রাজড়া এবং তাঁর মৃত ভাই ও দ্রৌপদীকে দেখলেন, সেইসব পবিত্র কথা কি মিথ্যে ?

না মিথ্যে নয় সেগুলি বঙ্কিম-কথিত 'গর্দভের রচনা'য় সৃষ্ট গল্প কথা। কিন্তু সেকথা থাক। প্রশ্ন আমারও আছে। আমার প্রশ্ন ঃ

স্বর্গে গিয়ে কেবলমাত্র কতকগুলো রাজা উজিরকেই বা দেখলেন কেন যুধিষ্ঠির ? তাঁরা তো জমির লড়াই লড়ে উলুখাগড়াদের শ্মশান বানিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে। বহেছিল রক্তের নদী। সাধারণ হাজার হাজার সৈনিকের দেহ পচে হাড়মাস মাটি হয়ে গেছল সেই প্রান্তরে। তা সাধারণের মধ্যে কি এমন কোনো পুণ্যাত্মা ছিলেন না যিনি রাজাদের মত একই সঙ্গে স্বর্গ লাভ করেন ? নাকি আর্যদের স্বর্গটাও তৈরী হয়েছিল শুধু আর্যাবর্তের রাজপরিবারভুক্ত রাজন্যবর্গের জন্যই ? এই মিথ্যা স্বর্গ কি রাজার জাতের কলমে বানানো নয় ? স্বর্গে একজনও সাধারণ মানুষ নেই কেন ? সেই বানানো স্বর্গে দুর্যোধন গোষ্ঠীকেও আনিয়ে যুদ্ধ পরবর্তী একটা সমঝোতাই কি করা হয়নি ? আর ইতিহাস নানাভাবেই প্রমাণ রেখেছে যে সুচতুর রাজনৈতিক সমঝোতায় পারদর্শী আর্যরা ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কূটকৌশলী। তাই তাঁরা মহাভারতে চমৎকার সব রাজনৈতিক উপদেশ দিয়ে গেছেন। সমঝোতার রাজনীতি এমন ভয়ানক ভালোভাবে আর কোথাও কেউ সাজিয়ে দিতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

রাজা ও ব্রাহ্মণদের জন্য তৎকালের বুদ্ধিমান পুরোহিততন্ত্রই স্বর্গ বানিয়েছেন রসিয়ে রসিয়ে। যুধিষ্ঠির মহাকাশযানে চেপে মহাজাগতিক পথে হারিয়ে গেলে সেই মনগড়া স্বর্গের একটি কাহিনী চুপচাপ মহাভারত গ্রন্থের 'ডিউ পার্ট' হিসেবে একেবারে লেজের দিকে জুড়ে দেওয়া হ'ল ঃ এই কাজটি সুচারুভাবে

সম্পন্ন হওয়ার পর চতুর মহাপ্রভুদের হয়ত খেয়াল হয়েছিল যে, গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে।

'গলদ' কি ? অবশ্যই সেটা ঘটে গেছে আদি ও বনপর্বে।

আদিপর্বে অমৃতমন্থনের মন্ত্রণায় দেবগণ একত্রিত হয়েছিলেন সুমেরু নামক পরম রমণীয় মহীধরে। সেখানে, মনে হয়, দেবস্থান সুমেরুই স্বর্গ।

আবার ব্রহ্মলোক নির্দিষ্ট হয়েছে হিমগিরি শীর্ষে। মনে হতে পারে, ব্রহ্মলোকই স্বর্গ।

বনপর্বে বলা হ'য়েছে, মহাদেব ও ইন্দ্রের আমন্ত্রণে মাতলির রথ এসে অর্জুনকে নিয়ে গেল স্বর্গে। বুঝতে হ'ল, পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনই প্রথম সশরীরে স্বর্গবাসী হলেন। আর সেই স্বর্গের বেশ বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাও আছে। পড়লেই বোঝা যায়, সে দেশ অলৌকিক অবিশ্বাস্য কোনো দিব্যলোক নয়। তা ছিল একটি প্রশস্ত পার্থিব এলাকা। কিন্তু যেহেতু সেখানেই অধিকতর বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী মহাকাশ-চারীরা (দেবগণ) বসবাস করেন তাই মহাভারতকার তাকে স্বর্গলোক বলেছেন।

স্বর্গের আভিধানিক (চলন্তিকা) অর্থঃ দেবলোক। ত্রিদিব। পরবর্তী অর্থ, পুণ্যবান যেখানে মৃত্যুর পর সুখভোগ করে। প্রথম অর্থে যে দেবলোক, অর্জুন বস্তুত সেখানেই গেছলেন। সুতরাং বনপর্বে সত্যের অপলাপ নেই।

আসলে মহাপ্রস্থানিক পর্বেই যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাত স্বর্গলোক যাত্রার শুরু ও শেষ। এর পর স্বর্গারোহণপর্বটি মুনি কল্পিত একটি রূপকথা।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীসহ চার পাণ্ডব যখন একে একে পতিত হলেন, তখন বিশাল নির্জন হিমালয়ে একাকী যুধিষ্ঠির যমনিযুক্ত সারমেয় প্রহরীর সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে সেই পার্বত্যলোকে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আকাশ আচ্ছন্ন করে জনহীন প্রস্তর প্রান্তরের ওপর ধেয়ে এলো ইন্দ্রের সগর্জন উড়ন্ত রশ্মিরথ। চতুর্দিক আকাশযানের সুগম্ভীর আওয়াজে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। কালীপ্রসন্ন-অনুবাদে বর্ণনাটি এইরকম ঃ

"বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মনন্দন এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূখণ্ড ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ,—তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" [মহাপ্রস্থানিক পর্ব]।

আমরা তো বটেই, সম্ভবত যুধিষ্ঠির নিজেও এমন প্রস্তাবে হতবুদ্ধি হয়েছেন। এতোকাল তিনি জানতেন, দেবভূমি হিমালয়ই স্বর্গ। দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ তাঁরা তো সেখানেই উপস্থিত। অতঃপর দেবতাদের রথে চেপে আর কোন্ স্বর্গে যাবেন ধর্মপুত্র ? না, অন্য কোনো স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই।

কাতর কণ্ঠে দেবতাদের তিনি বললেন, "সুররাজ !···উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই ;" [ঐ]।

কিন্তু দেবতারাও নাছোড়, যুধিষ্ঠিরের মত একটি মর্ত্যমানবের নমুনা তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যাবেনই। এই মানবপুত্র দেবতাদের রাজনীতির খেলায় বিচারবোধহীন খেলনার মত নিজেকে এবং তাঁর আত্মীয় পরিজনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলেন। রাজ্যলাভ-বসনায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দেবষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকস্বরূপ কুরুক্ষেত্রে কাতারে কাতারে স্বজনহত্যা করিয়েছেন তিনি অম্লানবদনে। ভ্রাতৃপুত্র অভিমন্যু বধেও তাঁর সক্রিয়ভূমিকা ছিল। ভীষ্ম দ্রোণ শল্য বধের ষড়যন্ত্রে তিনি নিজে ছিলেন অন্যতম মন্ত্রী। ['কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' দ্রঃ]। এমন একটি উৎকৃষ্ট স্পেসিমেনকে দেবতারা তাই সযত্নে লালন করেছেন। এখন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে দেবতাদের সঙ্গে আকাশযানে চাপতে অস্বীকার করলেও কি তাঁর মুক্তি আছে ? দেবতারা পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকেও বশংবদ পৃথ্বীপুরুষদের তুলে নিয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির বর্তমানে তাঁদেরই কব্জায়। এখন কোনো অনুনয়েও আর ফল নেই।

সুতরাং দেবতাদের আকাশযানে যুধিষ্ঠিরকে তোলা হল তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঃ

"···ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষি সমুদয় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমানসমূহে সমারূঢ় হইলেন।"

বোঝা গেল, কেবলমাত্র ইন্দ্ররথ নয়, আরও দু একটি দেববিমান সেই পার্বত্য উপত্যকায় অবতরণ করেছিল। সম্ভবত সেগুলি ছিল হেলিকপ্‌টার জাতীয় ছোট বিমান।

অগত্যা ধর্মরাজকে "সেই দিব্যরথে আরোহণপূর্বক তেজোদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন" করতে হ'ল। [মহাপ্রস্থানিক পর্ব / কালীপ্রসন্ন]।

যুধিষ্ঠিরের কাহিনীতে এখানেই যবনিকাপাত হওয়া উচিত ছিল। কেননা, তিনি তখন তথাকথিত ভৌমস্বর্গ হিমালয়ের সুউচ্চ তুষার শৃঙ্গগুলিকে অতিক্রম করে তেজোদ্বারা অর্থাৎ শক্তি পরিচালিত বিমানে চেপে চলে গেলেন অজ্ঞাত কোনো দেবলোকে যেখানে 'সশরীরে' ইতিপূর্বে আর কোনও মানুষ (ভারতবর্ষ থেকে) পৌঁছাতে সক্ষম হননি।

পরবর্তী নারদ বচনে সে সত্যই উক্ত হয়েছে ঃ "যে সমুদয় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজ মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশঃ ও তেজোদ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্তি আচ্ছাদন পূর্বক সশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্বে আর কোন ব্যক্তিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

যুধিষ্ঠিরের এই সৌভাগ্য প্রমাণ করছে তিনি অবশ্যই অন্যতর কোনো দেবলোকে নীত হয়েছিলেন, যেখানে আর কেউ যাননি। এবং যেখানে পৌঁছে, স্বজনহীন সেই দিব্যলোকে প্রথম পাণ্ডব বিমর্ষ প্রবাস-বেদনা অনুভব করেছেন। করুণ কণ্ঠে বলেছেন : তাঁর আত্মীয় পরিজন যেখানে বাস করেন "সেই স্থানেই গমন করিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।"

ব্যাস, মহাপ্রস্থানিক পর্বের এখানেই ইতি।

স্বর্গারোহণ পর্বে জ্যান্ত মানুষ নেই। কতকগুলি ভৌতিক কণ্ঠস্বর মুনিতে বানানো সংলাপ উচ্চারণ করেছে। তারা স্পষ্টত দৃশ্যমানও নয়! বলা হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে যে স্বর্গ নরকের চিত্র প্রদর্শিত হল তা দেবরাজ ইন্দ্র "মায়াবলে ......সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

অসম্ভব কি একটি চলচ্চিত্র অথবা কিছু স্থির চিত্র এবং টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে এই মায়া সৃষ্টি করা? কিন্তু সে কথাও যদি অত্যুক্তি মনে হয় তবে স্বর্গারোহণ পর্বের সৃষ্টিই একটি মায়া অর্থাৎ ফাঁকি বলে বুঝতে হবে, যা হিমালয়ের ভৌম স্বর্গ ত্যাগ করার আগে কয়েক পাতার পুঁথির আকারে হয়ত দেবানুচর বেদ-ব্যাসের হাতে গচ্ছিত করে গেছলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বহু অবিশ্বাস্য কাহিনীর মতো স্বর্গারোহণ পর্বেও রূপকথার চূড়ান্ত হয়েছে। এই পর্বে নতুন করে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের ভাবমূর্তি সৃষ্টির চেষ্টাই মুখ্য। তাঁরা কে কোন্ দেবতার অঙ্গে লীন হয়ে গেলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করে বৈশম্পায়ন তাঁর ভারত ইতিহাস কথা শেষ করলেন। রাজা জনমেজয় সেই "ভারত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।"

নৈমিষারণ্যে মুনিগণের কাছে এই সমগ্র ইতিহাস কথকথা করে শোনান সৌতি। বলেন "মহর্ষিগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ব্যাসের আজ্ঞায় বৈশম্পায়ন কর্তৃক কীর্তিত পবিত্র ভারতোপাখ্যান সবিস্তার কীর্তন করিলাম। ইহার তুল্য পবিত্র ইতিহাস আর কিছুই নাই।"

এবং সর্বশেষ সংবাদ হিসেবে মহাভারতের সেই জরুরী সার কথাটিও পুনশ্চ উচ্চারণ করতে ভুল হলনা সৌতির, "ব্রাহ্মণগণ প্রভূত দক্ষিণা ও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।" অর্থাৎ, বলা হল, ব্রাহ্মণকে প্রভূত দক্ষিণা দানেই স্বর্গ লাভ।

বললেন, "ইহাতে ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্তিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত।......এই জয়াখ্য পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।" কেননা, "ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই।"

সুতরাং যা ভারতের পুরা ইতিহাস তার মধ্যে পরলোকে প্রেতাত্মাদর্শন পর্বটি অপ্রাসঙ্গিক তো বটেই, তা যে একটি প্রক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যমূলক রূপকথা তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই ।

এই সর্গ রচনার যা মূল লক্ষ্য, সর্গের শেষে সেই অনুশাসনটি স্পষ্টাকারেই সৌতির মুখে উক্ত হয়েছে । তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণরা শত অপরাধেও নিরপরাধ, তাঁদের পরিচর্যাতেই অপর তিন শ্রেণীর মোক্ষ ।

বলা হয়েছে ঃ "ব্রাহ্মণ দিবসে মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিবিধ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সায়ংসন্ধ্যাসময়ে ভক্তিপূর্বক ইহার অল্পাংশমাত্র পাঠ করিলে অনায়াসে দিনকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ; আর তিনি রাত্রিযোগে স্ত্রীসংসর্গ-নিবন্ধন যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাতঃ সন্ধ্যাসময়ে ইহার কিয়দংশমাত্র পাঠ করিলে তাঁহার সেই রাত্রিকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ।"

ব্রাহ্মণদের যথেচ্ছাচারের এমন ছাড়পত্র মহাভারতের পবিত্র কথাকে সর্বাংশে ধ্বংস করেছে । প্রমাণ করেছে, এই ভারত-ইতিহাসে আপন শ্রেণীর অনুকূলে সব রকম কুকার্যের সমর্থন পাওনা করে ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা ইচ্ছেমত কাহিনী সৃষ্টি করে তা ঐ ইতিহাসের গর্ভে চালান করে দিয়েছেন ।

ব্রাহ্মণদের এই বানানো গল্পটি তাই বোধহয় পাঠকের আর স্মরণ থাকে না । আমরা মহাপ্রস্থানকেই স্বর্গারোহণ পর্ব বলে মনে রাখি ।

মহাভারতে মহাপ্রস্থানের পার্বত্য পথ বর্ণিত নেই, সে পথের হদিস পাওয়া যায় হিমালয়ের লোকশ্রুতিতে ।

বদ্রীনাথ বা বদরিকাশ্রম ছাড়িয়ে মানা গ্রাম । মহাভারতের স্মৃতি বুকে ধরে আজও স্বর্গারোহিণীর পথের ধারে যক্ষরাজ মণিভদ্রের উত্তর পুরুষরা তীর্থ পথিকদের কাছে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান পর্বের স্মৃতিকথা বলেন । ঐ মণিভদ্র-পুরম্-এর [মানা] একটি নিরিবিলি গুহায় বসেই নাকি বেদব্যাস রচনা করেন তাঁর মহাভারত আর সেই মহাগ্রন্থের লেখকরূপে কথিত গণেশও নাকি থাকতেন পার্শ্ববর্তী অপর একটি গুহায় । কাছাকাছি দুটি গুহার নাম আজও পাল্টায়নি । একটি ব্যাসগুহা, অপরটি গণেশ গুহা ।

গ্রাম ছাড়িয়ে সরস্বতী নদী । বেগবতীর বুকের ওপর প্রকাণ্ড এক পাথরের সেতু । প্রবাদ, মহাপ্রস্থানের পথে নদী পারাপারের উদ্দেশ্যে ভীমসেন এই প্রস্তর সেতুটি স্থাপন করেন । ঐ পথই স্বর্গারোহণের পথ । ও পথেই ছড়ানো আছে অজস্র পুরাণ কথা ।

বদ্রীনাথ থেকে তিন কিলোমিটার আর লক্ষ্মীবন থেকে দুই কিলোমিটার

দূরে অলকাপুরী গ্লেসিয়ার, মণিভদ্রপুরের মার্চা জাতির পূর্বপুরুষ যক্ষরাজ কুবেরের আলয়।

লক্ষ্মীবন থেকে নয় কি. মি. দূরে অপূর্ব বৃত্তাকার উপত্যকা চক্রতীর্থ। চক্রতীর্থ নর ও নারায়ণ পর্বতের সানুদেশস্থ সঙ্গমস্থল। [নারায়ণ পর্বত আবার সুমেরু নামেও অভিহিত]।[১] এই চক্রতীর্থের হিমশীতল জলে স্নান করে এখানে দাঁড়িয়েই অর্জুন নাকি গ্রহণ করেন পাশুপত অস্ত্র। যাই হোক, চক্রতীর্থ থেকে স্বর্গারোহিণী পর্বতশৃঙ্গ সুস্পষ্ট দেখা যায়। সাতটি বরফের স্তরে ঢাকা স্বর্গা-রোহিণী। লোকশ্রুতি, ঐ পথেই যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করেছেন।

হিমালয়ের এক একটি গিরিশৃঙ্গের পদতলে সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা ও সমভূমি বর্তমান। হয়ত এমনই এক উপত্যকা থেকে দেবতাদের আকাশরথ তুলে নিয়ে যায় যুধিষ্ঠিরকে। তিনি আর ফিরে আসেননি, কেননা দেবতারা তাঁকে নক্ষত্রলোকের অজ্ঞাত পথে তুলে নিয়ে যান।

যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পরে কাজে কাজেই বিস্মিত মুনিরা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের স্বর্গের ধারণা পাল্টে ফেলতে। বুঝেছিলেন, হিমালয় স্বর্গ নয়, স্বর্গ বা দেবলোক মহাকাশের কোনো অজানা স্থানে। দেবতাদের নেতৃস্থানীয় কয়েক-জন যুদ্ধ শেষে প্রথম পাণ্ডবকে নিয়ে সেই দেবলোকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেটাই তাঁদের মহা প্রস্থান। তাই পরবর্তী পুরাণে হিমালয় ভৌম স্বর্গ বলে চিহ্নিত হল এবং আমাদের ভুলে যেতে বলা হল, যুধিষ্ঠিরের আগেও যাঁরা স্বর্গে গেছেন বলে মহাভারতে অজস্র কাহিনী বিস্তারিত হয়েছে ; সে সব কথা।

তারও পরে দেবতাদের স্বরূপ নিয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি। দেবপ্রধানদের নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতে দেব-প্রাধান্য কমে এলে দেবতাদের ঈশ্বরত্ব নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হল। মানুষের ধারণায় আবার ফিরে এলো পরমেশ্বরের অচিন্তনীয় রূপের কথা। দেবতা মানেন না এমন নাস্তিকরা (?) পরমেশ্বর এবং তাঁর স্বর্গলোককে চিন্তার অতীত বলে গণ্য করলেন। ক্রমশ দেবতা ও পরমেশ্বরের স্বরূপ ও পার্থক্য ফুটে উঠতে লাগল স্বর্গের পরিবর্তিত ধারণার মতো।

১। সুমেরু পর্বত বলতে মন্দাকিনী বিধৌত কেদারমন্দিরের পশ্চাদ্বর্তী তুষার প্রাচীরটিকেও নির্দেশ করা হয়। কেদার ও বদ্রীনাথ উপত্যকাদুটি অনেক কাল আগে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। সুমেরু অঞ্চল বলতে তাই চৌখাম্বা চত্বরসহ এই দুই অঞ্চল-কেও বোঝায়। গন্ধমাদন বলতে যেমন দেবতাদের অধিকৃত বিস্তীর্ণ পর্বতাঞ্চলকেই বুঝতে হয়।

দেবতা ও পরমেশ্বর

দেবতা ও পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আজ নতুন করে উত্থাপিত হয়নি, বেদ বেদান্তের মতই তা সুপ্রাচীন। ভারতীয় ঋষি ও দার্শনিকরা বৈদিক, পরবৈদিক, এমন কি পৌরাণিক যুগেও দেবতার প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক করেছেন, পোষণ করেছেন পরস্পর বিরোধী মতামত। তাই দেখা যায়, বৈদিক ঋষির ক্ষেত্রে প্রতিমা পূজা যখন নিষিদ্ধ, বৈদিক শ্লোকে তখন ইন্দ্রাদি দেবতার স্তুতি করা হচ্ছে : দেবতারা আহূত হচ্ছেন শত্রুবিনাশক মহাশক্তি রূপে সভা সমিতি বা যাগযজ্ঞে। আবার তিন ও তেত্রিশ দেবতার জয়গাথার পাশাপাশি বেদে উপনিষদে কীর্তিত হয়েছে পরমেশ্বরের স্বরূপ, যা বলে ঃ ঈশ্বর এক, বিপ্রগণই তাঁকে বিখণ্ডিত করে বহু বানিয়েছেন, একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তিঃ। বৈদিক সাহিত্যে দেবতার কাছে গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদাত্ত প্রার্থনা যেমন আছে, তেমনিই আছে সকলের জন্য আন্তরিক মঙ্গল কামনা : আছে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে ঐকান্তিক প্রযত্ন।

অথর্ব বেদের একটি সূক্ত বলছে ঃ

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিশংবিশধ্বন্ ॥

[অ/৬-৭-২]।

অর্থাৎ, "তোমাদের কার্যাকার্য-পর্যালোচনাত্মক মন্ত্রণা একরূপ হোক, সেরূপ কার্যের প্রবৃত্তি একরূপ হোক, কর্মও একরূপ হোক এবং তোমাদের অন্তঃকরণ একরূপ হোক। সেজন্য তোমাদের সাধারণ হবির দ্বারা যাগ করছি, তোমাদের চিত্ত একরূপ হোক ॥"

[অনু/হরফ প্রকাশন সং]।

এমন সাম্যবাদী বৈদিক চিন্তা এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী ঋষিদের মহৎ আকাঙ্ক্ষারই ফলশ্রুতি। যাঁরা বিশ্বাস করেন পরমেশ্বর এক ও অভিন্ন, সর্বজীবে সমদর্শন তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। বর্ণবিভাগকারী ব্রাহ্মণদের সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের সমকালে এভাবেই ভারতীয় দর্শনের আর একটি শাখা পারমার্থিক চিন্তায় স্নাত ঔপনিষদীয় মহৎ ভাবনার প্রবাহপথ উন্মুক্ত রেখেছিল।

দেবতাকে পরমেশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত যখন তুঙ্গে, শ্বেতাশ্বতরঃ

শ্রুতি তখন সতর্ক করে বলেছেন ঃ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি,"—জেনে রাখো, দেবতার মতো পরমেশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বচনেও উচ্চারিত হয়েছে অনুরূপ সতর্কীকরণ। বলছেন, "গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দেবতানি চ।" অর্থাৎ, সমুদ্র, পৃথিবী ও দেবতা সবই নশ্বর, পরমেশ্বরের মত অবিনাশী ও শাশ্বত নয় তারা। অতএব ভুল কোরো না।

দেবতারা মানুষের মতই মরণশীল। একথা যেমন মহাভারতে পাই তেমনিই অন্যান্য তন্ত্রে মন্ত্রেও পাওয়া যায়। কুলার্ণব তন্ত্রের শ্লোক বলে ঃ

"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূত জাতয়ঃ।
সর্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥"

বৈদিক পরবৈদিক যুগ তো বটেই, পৌরাণিক যুগেও গীতার বাণী দেবতার দাবিকে নস্যাৎ করে বলেছে ঃ

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকং ॥" [৯/২৩]।

"ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।" [অনু, বঙ্কিমচন্দ্র/প্রচার, ২য় বর্ষ]।

প্রতিমা পূজার ভ্রান্তি প্রদর্শিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। ঈশ্বরের বাণী সেখানে ঋষি এইভাবে সাজিয়েছেন ঃ

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনং ॥"

অর্থাৎ, আমিই সর্বভূতের আত্মা। আমার স্বরূপ উপলব্ধি না করে লোকে প্রতিমা পূজার বিড়ম্বনা করে।

ভারতীয় ধর্মদর্শনের এই ইতিহাসের দিকে তাকালে স্বতঃই মনে হয়, বৈদিক আমলেই ঈশ্বরের আসনটি জবর দখল করার জন্য এক জাতের দেহধারী মনুষ্যোপম অদ্ভুতকর্মা পুরুষের আবির্ভাব শুরু হয়ে গেছল। মানুষের ধর্মীয় চিন্তায় তাঁরা গায়ের জোরে দখলদারি কায়েম করছিলেন বলেই তাঁদের চিহ্নিত ও সনাক্ত করার জন্য একটা ব্যস্ততা ও প্রয়াস সর্বত্র লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেই পরস্পর-বিরোধী চিন্তাস্রোত তদবধি জাহ্নবী যমুনার মত ভারতবর্ষ প্লাবিত করে দুটি সমান্তরাল ধারায় যুগ যুগান্তকাল বহে চলেছে।

দেবতাদের শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট এবং দেববুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত পুরোহিত-সমাজ বিরোধী-বক্তব্যগুলিকে অপূর্ব কূটকৌশলের দ্বারা সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিলেন। একদিকে তাঁরা বিবুদ্ধবাদীদের কৌশলে স্বদলভুক্ত করে নিয়েছেন, অন্যদিকে সেই বিবুদ্ধ বক্তব্যগুলিকে সাধারণের আয়ত্তের বহির্ভূত পাণ্ডিতী আলোচনার বিষয় করে

নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির আনুকূল্যকারী অলৌকিক আষাঢ়ে গল্পগাছা-পূর্ণ পুরাণ মহাভারতাদির প্রচার করেছেন। মানুষের মনে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি ভীতি মিশ্রিত অহৈতুকী ভক্তির সৃষ্টি করেছেন মানুষকে হাজার রকমের কুসংস্কারের ফাঁদে ফেলে।

কেবলমাত্র ঈশ্বরের আসনটির দখলদারি নয়, পরমেশ্বর-পূজারী এবং এমনকি দেবতা ও পরমেশ্বর, এই দুই শক্তিকেই যাঁরা অস্বীকার করেন, ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদেরও দেবাবতার বানিয়ে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিলেন। পুরাণভোজী সাধারণ মানুষের চোখে বিরুদ্ধবাদী দার্শনিকদের এইভাবে দেবানুরাগী ঋষি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে একটি অনৃত প্রতীতি খাড়া করা হ'ল। অভীষ্ট পূরণ হ'ল সুবিধাভোগী পুরোহিততন্ত্রের।

কপিল মুনির 'সাংখ্য', জৈমিনির 'মীমাংসা', গৌতম ঋষির 'ন্যায়' ও কণাদের 'বৈশেষিক' দর্শন মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক গ্রন্থ। সেখানে দেবমহিমা স্বীকৃত নয়। গৌতম ব্যতীত অপর তিন ঋষির বক্তব্য প্রকারান্তরে নিরীশ্বরবাদী। তবু হিন্দুর ষড় দর্শনের মধ্যে ঐ চারটি দার্শনিক গ্রন্থও সসম্মানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কপিল বস্তুবাদী। তাঁর 'সাংখ্য' দর্শনে দেবতা বা ব্রাহ্মণদের অলৌকিক ক্ষমতা সর্বাংশে অস্বীকৃত। কপিল-মতে প্রকৃতি এবং তৎসম্পর্কিত সম্যক জ্ঞানই প্রধান। প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। তবু কপিলকে নিয়ে ভাগবতে প্রলম্ব স্তুতি ঋষির ওপর দৈবীভাব আরোপ করেছে। কপিলকে বানানো হয়েছে বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার[১]। ঐতিহাসিক পুরুষ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে দেবদাপট ও ব্রাহ্মণ্য প্রতাপকে পরাস্ত করলে চতুর ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁকেও অবতার বানিয়ে গোলমাল এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধকে বানানো হ'ল বিষ্ণুর নবম অবতার। তত্রাচ তাঁর প্রতি ক্রোধবর্ষণের সাক্ষ্যও সমান বর্তমান।[২]

১। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে কপিল-স্তুতির সঙ্গে অন্যান্য দেবাবতারদের পৌরাণিক স্তুতি মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, সকল স্তুতির চেহারা একই রকম। অনার্যদের গালি গালাজ করার জন্য যেমন একই ধরণের ফর্ম বা আদর্শ ব্যবহৃত হয়েছে, দেবাবতারের স্তুতি বন্দনাও তেমনি একটি বিশিষ্ট ফর্ম বা আদর্শে রচিত। মনে হয়, এইসব স্তুতি ও নিন্দার জন্য চাতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠাকারী বুদ্ধিজীবীরা একটি বিশিষ্ট ছাঁচ তৈরী করে নিয়েছিলেন, প্রাচীন বা অর্বাচীন যে কোনো পুরাণে স্তুতি ও নিন্দাবাদ সেই ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা হয়েছে।

২। বুদ্ধদেবকে চার্বাকের মতই আক্রান্ত হতে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক

ভারতে আর্যীকরণের সময় সর্বমতের সুষম সমন্বয় সাধিত হয়েছে ব'লে পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণ্য-চাতুরীকে মহিমান্বিত করেছেন। আসলে কিন্তু এই সমন্বয় সাধন ও সমঝোতার পেছনে কাজ করেছে সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দূরদর্শী কূটনীতি, যাকে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিজয়াভিযান বলাই যুক্তিযুক্ত। কেবল ক্ষমতার দ্বারা অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়, বুদ্ধির দ্বারা ভাবের জগতে বিরোধীমতকে গ্রাস করার এই অভিনব চতুর পন্থা ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত উন্নত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন দেবতাদের কাছেই শিক্ষা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাকে নিরঙ্কুশ করতে হলে ভাবজগতে এমনভাবেই আধিপত্য বিস্তার করতে হয় যাতে বিরোধী জ্ঞানবিজ্ঞান বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। পুরাণ মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার সেই দেব-উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ ভাবে সফল করেছিল। তারই ফলে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের নিগড়-বন্ধনে আজও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তারই জন্য আবহমানের কুসংস্কারগুলি ভারতবাসীর জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক বিচারগুলি চাতুর্বর্ণীয় সমাজের স্বার্থের আনুকূল্য নাকরায় তাদের বাকসবন্দী করেছেন ব্রাহ্মণরা। সেগুলির যথোচিত প্রচার হয়নি। ভারতীয় ঋষিদের বিজ্ঞানী বক্তব্য পরবর্তীকালে য়ুরোপে পাচার হয়ে গেছে এবং যে বিজ্ঞানের জনয়িত্রী ভারতবর্ষ, সেই পরমাণু বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতির প্রচার হয়েছে পশ্চিম গোলার্ধ থেকে! 'বৈশেষিক' দর্শন-প্রণেতা কণাদ পরমাণু বিজ্ঞানের জনক। কিন্তু কণাদের সেই পরমাণুতত্ত্ব ভারতে চাপা পড়েছে। ন্যায় শাস্ত্রের জন্ম দিলেন ঋষি গৌতম আর বিশ্বে নৈয়ায়িক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন আরিস্টটল। পরের শ্রমার্জিত সম্পদভোগের অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িক বাসনা এইভাবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজে নিঃসঙ্কোচে উৎসাহিত হয়েছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য জাতির সম্মান প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধমনীতে সেই ক্ষুদ্রস্বার্থপ্রীতি আবহমানের সংস্কারে লালিত হয়ে আজও সমানে প্রবাহিত হচ্ছে।

আধুনিক ভারতবর্ষে পুরাণ ও পাঁচালী-নির্ভর সাধারণ্যের সামনে যিনি প্রথম পরমেশ্বরের সঙ্গে দেবতার স্বর্গমর্ত্য প্রভেদটি সুস্পষ্ট করে ভাবের জগতে মোহমুক্ত

পুরোহিততন্ত্রীদের দ্বারা। ভাগবতে বলা হয়েছে, সুরবিরোধীদের মনে মোহ সৃষ্টির জন্য বুদ্ধনামক অঞ্জনপুত্র (বুদ্ধনামাঞ্জন-সুতঃ) কীকট দেশে অবতীর্ণ হবেন। কপিলবাস্তু কীকট দেশের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ প্রশমিত না হাওয়ার মুখ্য কারণ, তিনি ব্রাহ্মণসৃষ্ট জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, যার অর্থ ব্রাহ্মণ্য শোষণের বিরুদ্ধাচরণ করা।

এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন, ভারতবর্ষ তাঁকে জাতির পিতা ও শিক্ষাগুরু রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্মরণ করে। উনিশ শতকের গোড়ায় রাজা রামমোহনের আবির্ভাব জাতির ভাবজগতে একটি সার্থক পালা বদলের সূচনা করেছিল। রামমোহন উপলব্ধি করেন, ভাবের জগতে অন্ধকার যথাযথ থাকলে কর্মের জগতে সঠিক পদক্ষেপ সম্ভব হয় না। ভারতে তাই সাংস্কৃতিক ভাবান্দোলনের প্রয়োজনই সর্বাধিক। যে ধর্মীয় সংস্কারের বোঝা মানুষকে দৈবীনির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ হরণ করে আসছে, যে অজ্ঞানের অন্ধকার সামাজিক শোষণের কারণস্বরূপ, তা দূরীকৃত নাহলে ভারতের মুক্তি নেই। সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রথম শর্ত তাই চিন্তার জগতে মুক্তি।

আবহমানের কুসংস্কার ভেদ করার মানসে রামমোহন হাজির করলেন তাঁর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। বাঙলা অক্ষরে উপনিষদের মূল শ্লোক ও বাঙলা ভাষায় তার ব্যাখ্যা রামমোহনের কাছেই আমরা প্রথম পেলাম। শিক্ষিত বাঙালীর চোখের সামনে খুলে গেল সত্য মিথ্যার বদ্ধ দুয়ার। উনিশ শতকের ভাবোন্মেষের যুগে বাঙলার বুদ্ধি ও বিচিন্তা রামমোহনের সুযোগ্য নেতৃত্বে সংগঠিত সংস্কৃত ও সুপুষ্ট হয়েছে। দেবতার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ায় দৈবী নির্ভরতায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেযুগের শীর্ষস্থানীয় চিন্তানায়করা জাতির মানসমুক্তির আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেছেন, সমবেত হয়েছেন রামমোহনের জ্ঞানীজন-সভায়।

প্রচণ্ড সৎসাহস বুকে নিয়ে বহু প্রতিকূলতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রামমোহন সেদিন পৌরাণিক দেবতাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, "পুরাণাদিতে দেবতাদের সম্বন্ধে যে সকল নীতিবিরুদ্ধ আচরণের বর্ণনা আছে, ব্রহ্মের [পরমেশ্বরের] শুদ্ধ স্বরূপের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ঈশ্বরের রূপ সকল কি পাপাচরণ করিতে পারে? তারা কি মানুষের ন্যায় আহার পান করে, চলে ফিরে বা নিদ্রা যায়? অতএব বাস্তবিক দেবতারা ঈশ্বরের স্বরূপ নন।"

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন না। ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তবু দেবতাদের প্রতি কুসংস্কারহীন যুক্তিবাদী সন্দেহ প্রকাশে তিনিও ইতস্তত করেননি। পুরাণ মহাভারতের ব্রাহ্মণসৃষ্ট অলৌকিক ও আজগুবি কাহিনীগুলিকে 'গর্দভের রচনা' বলে চিহ্নিত করে নির্দ্বিধায় বর্জন করার দুঃসাহস প্রকাশ করেন তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে'।[৩]

(৩) পুরাণ মহাভারতের উদ্দেশ্যমূলক অলৌকিক কাহিনীগুলির মোড়ক ছাড়ালে বেরিয়ে আসে আমাদের হারানো ইতিহাস। পূর্বাপর ঘটনাক্রমে সে ইতিহাস যে কত স্পষ্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে তা লক্ষ্য করেছি আমার পরবর্তী দুটি বই 'কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির' ও 'যদুবংশ ধ্বংসকথা'-য়।

পৃথিবীর পুরাণে বর্ণিত সকল জাতির দেহবান দেবতাদের তুলনামূলক আলোচনা করে, দেবতাদের জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরে এবং হিন্দুর শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে বঙ্কিমও প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, দেবতারা ঈশ্বরসৃষ্ট মনুষ্যোপম জীব বৈ আর কিছুই নন।

বঙ্কিমের বিচারে এটাও স্পষ্ট যে, দেবতাদের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল বৈদিক আমলে। পৌরাণিক যুগে দেবদাপট ক্ষমতা-গর্বে অনাচারী হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম লিখেছেন, "দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, একথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেননা সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণের স্তোত্র ; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট।" [দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম]। তিনি ঐতরেয়োপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃত করে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে আর একটু বলি ঃ

ভারততাত্ত্বিকদের বিচাররীতির অনুসরণে বঙ্কিম যদিও দেবতাদের প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর রূপকমাত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তবু সেটুকুতেই তাঁর যুক্তিবাদী বিচারক মন পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। প্রাচীন পুরাকথায় যে দেবতারা মানবেতিহাসের সঙ্গে সর্বত্র ওতপ্রোত মিশে আছেন, ম্যাকডোনেল সাহেবের মত তাঁদের কেবলমাত্র, 'পার্সনিফিকেশন অব ন্যাচারাল ফেনোমেনা' বললেই যে সব জিজ্ঞাসার ইতি হয় না, বঙ্কিম মনে সে সন্দেহও জাগ্রত হয়েছিল। দেহধারী দেবতাদের বাস্তব চরিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাই তিনি আরও বলেছেন, "পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদের সহিত রাজর্ষিরা ও মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ গুরুতল্পগামী কেহ চোর, কেহ......ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া নন্দন কাননে উর্বশী-মেনকা-রম্ভা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী—সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্বল, কখন অসুর কর্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্তৃক দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্তৃক পরাজিত, কখন দুর্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের অভিশাপে বিপদগ্রস্ত, সর্বদা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই কি দেবচরিত্র ? ইহার সঙ্গে ও নিকৃষ্ট মনুষ্য চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি ? এই সকল দেবতার উপসনায় মহাপাপ ও চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।" (ঐ)।

জাতির শিক্ষাগুরু রামমোহন-বঙ্কিমরা আমাদের দৃষ্টি একটি মহৎ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বুঝিয়ে গেছেন যে, প্রাগিতিহাসের ঋষিরা ঈশ্বর ভিন্ন দেবতার উপাসনাকে লক্ষ শ্লোকে নাকচ করতেই চেয়েছিলেন। বিভিন্ন উপনিষদে পরমেশ্বরবাদী শ্লোকের প্রাচুর্যই তাঁদের পিতৃপিতামহের সংস্কারের বিরুদ্ধে এইভাবে সোচ্চার হওয়ার সৎসাহস যোগান দিয়েছে। এ শক্তি

হিন্দুধর্মের মূল কথার মধ্যেই নিহিত আছে। দেবতা-বিশ্লেষণী বক্তব্য কোনো অংশেই হিন্দুত্ব-বিরোধী বিধর্মীয় নাস্তিকতা নয়।

সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্কল্পসাধক আচাররীতিতে বার বার প্রত্যাবর্তনের অর্থনৈতিক কারণও রামমোহন বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লেখেন, "সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে ; সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি।" তাঁর এই বিচার যে কত সত্য, বারোয়ারী তলার মহোৎসবের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পথেঘাটে দেবতার পট সাজিয়ে বিনাশ্রমে অর্থোপার্জনের ঘটনা তারই প্রমাণ। মানুষ যত বেশি দৈবীনির্ভর হয় তাকে শাসন ও শোষণের উপায়ও ততই বহুমুখী এবং সহজ হয়ে আসে।

দেবতাদের কর্মকাণ্ড, সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিবর্তনের পুরাণেতিহাস সন্ধান করে ঐতিহাসিকরা উদ্ধার করেছেন চমকপ্রদ বিবরণ। বিভিন্ন তথ্যে প্রকাশ, একটা যুগে ভূখণ্ডের মালিকানা নিয়ে দেবতারা লড়াই করেছেন নিজেদের মধ্যে। দেবতার হাত থেকেই মানুষ রাজারা পেয়েছেন তাঁদের রাজদণ্ড। পুরাণেতিহাস বলে, পুরাযুগের রাজারা সবাই দেবসন্তান। চীন, জাপান, মিশরের শাসকবর্গের উৎপত্তি সূর্য দেবতার বংশে। ভারতে সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন।[৪]

ভারতে পুরোহিততন্ত্রের সম্প্রসারণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছেন, "গঙ্গাতটের জীবনযাত্রা তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ থাকিলেও সাধারণ সম্প্রদায়ের তাহাতে বড় লাভ ছিল না। রাজ্যের সকল ঐশ্বর্য তখন পার্থিব শাসক ক্ষত্রিয় ও দৈবিক শাসক ব্রাহ্মণ—এই দুই সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়া পড়িত।" [মানব সমাজ]।

তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের এতো পরিশ্রম ও হাজার হাজার পাতার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও পুরাণ পাঁচালীর প্রভাব থেকে আমাদের পরিপূর্ণ মানসমুক্তি যে সম্ভব হয়নি তার কারণ হয়ত এই যে, তাত্ত্বিকরা দেবতাদের পার্থিব কীর্তিকলাপ বিচার করলেও নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে মনে মনে নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন না। দেবতাকে মানবেতিহাসের, অন্তত পুরাকথার বিবরণে ও ঐতিহাসিক নথিপত্রে ধরা গেলেও তাত্ত্বিকরাই আবার দেবচরিত্রগুলি সম্পর্কে রূপক তত্ত্বের বিশ্লেষণে বসে দেবতার বাস্তব অস্তিত্বকে রূপকথার বিষয় করে তুলেছেন। দেবতার ভূমিকা ইতিহাসে নজর করলেও সাহসে ভর করে বলতে পারেননি, দেবতাদের কীর্তি কাহিনীর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের অবলুপ্ত পুরা-ইতিহাস। দেবতারা যে এক ধরণের

(৪) "সুমেরের ধনসম্পত্তি ও জমিজমার মালিক ছিলেন এক একজন নগর দেবতা। দেবপূজক পুরোহিতরাই দেবতার প্রতিনিধিরূপে ভোগদখল করতেন বিপুল সম্পত্তি। অনুন্নত সাধারণের জন্য তাঁরা পরকালের আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই দিতেন না। সে যুগের নথিপত্রে পাওয়া যায় দেব প্রতিনিধি পুরোহিতেরা প্রজা সাধারণের ওপর খুশিমত শাসন ও অত্যাচার চালাতে পারতেন। মিশরেও ছিল অনুরূপ অবস্থা। সাধারণের শ্রম ও রক্তমাংস দিয়ে তৈরী হয়েছিল শুধু দেবতার মন্দির, পুরোহিত ও ভূস্বামীদের বিলাসাগার এবং মৃতের সঙ্গে মাটিচাপা ধনসম্পদ ও জীবন্ত মানুষের স্তূপ, পিরামিড। ইংল্যাণ্ডের এক তৃতীয়াংশ জমি ভোগ করতেন পাদ্রীরা।" [পৃথিবীর ইতিহাস/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়]

উড়ন্ত যান ব্যবহার করতেন পুরাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল বটে : তবু দেবযানের ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের আগে তো নয়ই, আজকের মহাকাশচারণার যুগে দাঁড়িয়েও তাঁরা দানিকেনের সঙ্গে একমত হয়ে দেবযান রহস্য ভেদের সার্থকতা উপলব্ধি করেন না। এক অদ্ভুত 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি' গোছের পাণ্ডিতী আলাপ-বিলাপের বিষয় হিসাবে দেবতত্ত্বকে জিইয়ে রেখেই তাঁরা সন্তুষ্ট। তাই দেখি, দেবযান রহস্য বিষয়ে খোঁজখবর করতে ভারতে ছুটে এসেছেন দানিকেন, কিন্তু ভরদ্বাজ পুঁথিটির উল্লেখ করে ভারতীয় পণ্ডিতের মতামত যখন তিনি জানতে চাইলেন, তখন ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিতের কাছ থেকে পেয়েছেন শুধু অসহায় হতাশাব্যঞ্জক উক্তি।[৫]

পণ্ডিতী বিচার দেবতাদের আলোচনার ক্ষেত্রে আজও একই বৃত্তের গোলকধাঁধায় চক্রাবর্তন করে চলেছে, ফলে দেবতা সম্পর্কে পণ্ডিতরা কেউই আমাদের নতুন কোনো আলো দেখাতে পারেননি। এই যখন অবস্থা, দানিকেন তখন তথ্য নজীর আলোকচিত্র এবং অজস্র পুঁথিপ্রমাণ সহযোগে দেবতাদের রূপকথার রাজ্য থেকে পুরা ইতিহাসের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে টেনে এনেছেন। দেবতারা আজ আমাদের পরিচিত পরিজন। তাঁদের দিকে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে তাকালে চোখের সামনে আমরা আমাদের হারানো পুরা ইতিহাসকে খুঁজে পাই। উপলব্ধি করতে পারি, ধর্মাধর্ম, স্বর্গমর্ত্য এবং দেবতা ও পরমেশ্বরের স্বরূপ। দেবতাকে সামনে রেখে সুবিধাভোগী সাম্প্রদায়িক ফায়দা তোলার ক্ষেত্রে দানিকেনী বিচারপদ্ধতি এখন শক্তিশালী প্রতিবাদের প্রাচীর নির্মাণ করেছে। অনেকে তা সহ্য করতে না পেরে উত্তেজিত বোধ করছেন। কিন্তু উপায় নেই। আত্মসন্তুষ্ট পথে চক্রাবর্তন অপেক্ষা সত্যানুসন্ধানের ঋজু পথে সাহসে ভর করে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। সমাজ তাতে গতি পায়।

উনিশ শতকের মনীষীরা একথা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে দৈবীনির্ভরতাই সামন্ততান্ত্রিক প্রথা মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে সমাজের মানসমুক্তির পরিপন্থী ভাব-ভাবনাকে জিইয়ে রাখে। সে জঞ্জাল অপসারণ করা ছাড়া সমাজ বিপ্লব সম্ভবপর নয়। তাই তাঁরা প্রথমেই যেটা যেখান থেকে দরকার ছিল, সেটা সেখান থেকে শুরু করেছিলেন। শুরু করেছিলেন সাংস্কৃতিক ভাববিপ্লব। এই ভাববিপ্লব আমাদের সমাজে ব্যক্তি চেতনার যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনিই রামমোহন-বঙ্কিমের একেশ্বরবাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের সর্বধর্ম সমন্বয়-প্রচেষ্টা উনিশ শতকের ভাবান্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী মানসিকতায় গোঁড়ামিহীন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধেরও উদ্বোধন করে গেছে। তারই উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্বকবির কাব্যদর্শনে ঔপনিষদিক বিশ্বচেতনা। মানুষের ইতিহাস তলে তলে গতি পেয়েছে সামন্ত-তান্ত্রিক-দৈবী-নির্ভরতার অচলায়তন ভেঙে বিশ্ব-সমাজ-চেতনার মুক্তাঙ্গনের দিকে। তাঁরা জানতেন, পেছনের অন্ধকারকে যথাযথ রেখে সামনের পথকে অপ্রতিবন্ধক করা যায় না। তা যদি হত, তাহলে অত্যাধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বকে অত বড় করে দেখত না।

(৫) শ্রীঅজিত দত্ত অনূদিত দানিকেনের 'প্রাগিতিহাসের ঋষি' গ্রন্থে সংযুক্ত এই লেখকের 'বাঙলায় দানিকেন চর্চার দশ বছর' নিবন্ধে আলোচনাটি বিস্তারিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন হবে,—কিন্তু উনিশ শতকের ভাবান্দোলনের ফলে কি হিন্দু তার দেবদেবী বিসর্জন দিয়ে সারিবদ্ধভাবে ব্রাহ্ম বা বৌদ্ধ অথবা আর কিছু হয়ে নিজেকে সংস্কৃত করতে যত্নবান হয়েছিল ?

এমন প্রশ্ন সমগ্র বিষয়টিকে সম্যকভাবে অনুধাবন করার ব্যর্থতা থেকেই শুধুমাত্র উত্থাপিত হতে পারে। রামমোহন সাকার উপাসনা ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্কিম তো তা হননি। তাঁদের কেউই নাস্তিক ছিলেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন ভাব ও ভক্তিবাদী এবং মূর্তি পূজক। কিন্তু তাঁর শিক্ষাও দৈবী-নির্ভর কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো অন্ধকারের দিকে তো মানুষকে ঠেলে দেয় নি। পরমহংসের বিরাট সত্তা ও সংস্কৃত মানসিকতার পূর্ণজ্ঞান 'শিবজ্ঞানে জীব-পূজাকে'ই ধর্মীয় আচরণ হিসেবে নির্দেশ করেছে। আবির্ভূত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণের শিক্ষা মূর্তির মধ্যে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে একেশ্বরের সাধনা করারই শিক্ষা। সে শিক্ষা যিনি কালী তিনি কৃষ্ণের উপলব্ধিতে সার্থক। সেটাই মূলত হিন্দুর ধর্ম। একেশ্বরের সাধনা।

উনিশ শতকের ভাবান্দোলন আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে যা যে কোনো দেবমূর্তির মধ্যে পরমেশ্বরকেই দর্শন ও পূজা করে; কোনো সাম্প্রদায়িক অথবা গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা তা অভিভূত হয় না। দেবমূর্তি যেমনই হোক, দেবতা যিনিই হোন-না-কেন, আমরা যখন যেখানে মাথা নত করি, তখন সেই মূর্তিতেই পরমেশ্বরের একক শাশ্বত সত্তাকে প্রণাম জানাই। কেদারে, বদ্রীনাথে অথবা পুরাণেতিহাসের রাজপুরুষ রামচন্দ্র কিম্বা দ্বারকার বাসুদেব কৃষ্ণ, যাঁর কাছেই যাই, তাঁকে পরমেশ্বর মেনেই অর্চনা করি, বন্দনার সময় কোনো ইতিহাসের কথা মনে রাখিনা। চৈতন্যের এই প্রসারতা শিক্ষার দ্বারা পরিশীলিত হলে কুসংস্কারের পাতা ফাঁদ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারে। উনিশ শতকের ভাবান্দোলন এক নবচেতনার সৃষ্টি করে প্রকৃত শিক্ষিতজনকে পাঁচালী পুরাণের স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করেছিল। তৎপূর্ববর্তীকালীন কট্টর জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, ব্রাহ্মণে পুরুতে গুরুতে কন্যাদান প্রভৃতি কুসংস্কার থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছি। পুরোহিতসেবী সামন্ততান্ত্রিক যুগের অনাচার থেকে নিজেদের আজ মুক্ত করে এনেছি। তাতে দেবতা ক্ষুব্ধ হননি, কোনো দেবতার রোষে আমরা ভীত হইনি। পরমেশ্বরকে স্থানচ্যুত করে দেবতাকে সেই আসনে বসিয়ে মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসকে যাঁরা এতোকাল নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে এক্সপ্লয়েট করে এসেছেন, ভয় ও ভাবনার সময় উপস্থিত হয়েছে বরং তাঁদের ক্ষেত্রেই।

দেবতাকে যত ঘনিষ্ঠ ভাবে মানুষ জানতে পারবে, ততই নিকট করে পাবে তারা তাদের পরমেশ্বরকে। পরমেশ্বরকে জানলে ভেদাভেদ ও শোষণ পীড়নের আয়োজনে অন্ধের মত আর কেউ শরিক সামিল হতে ছুটবে না। মহামানবের সাগরতীরে একই পরমেশ্বরের সন্তান হিসেবে ভ্রাতৃভাবে তখন সম্মিলিত হবেন জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাদা কালো সকল মানুষ।

সেদিন কবে আসবে জানি না। স্বপ্ন দেখতে বাধা নেই। কিন্তু সত্যিই যদি তেমন আলোকিত ভবিষ্যৎ বস্তুতই রচিত হয় কোনদিন, তবে সফল হবে দেবতার ইতিহাস নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের সকল পরিশ্রম।